শ্রীসাগরময় ঘোষ

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ইলিশমারির চর

বাংলার চালচিত্র

মাটির কাছাকাছি

বিদ্রোহী বাসিন্দা

নিবেদন ইতি

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশকালে 'মুখের মেলা'র যেসব রচনার ন্যাজা-মুড়ো ছাঁটকাট্টু কর' হয়েছিল তা আবার মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে লেখা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

'বাংলার চালচিত্র' গ্রন্থের তথ্যবহুল জীবনচিত্রের তথ্যকে বর্জন করে 'মুখের মেলা'য় জীবন বা মানুষকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে মানুষরা দুঃখে-দুর্দশায়, রোগে-শোকে, ঘামে-কান্নায়, প্রেম-পরকীয়ায় চিরকাল দেখেও-না-দেখা অবহেলিত গ্রাম জনপদের অন্ধকারে পড়ে আছে। কল্পলোকের জীব এরা নয়—ক্লান্ত মাটি-মাখা মানুষ। যারা আমার চারপাশে প্রতিদিন ভিড় করে আছে। তাদের মেলায় নিজের মুখও উন্মুখ হয়ে আছে তাদের আত্মীয় উত্তরাধিকারীর মতোই। হাড়ে-মাসে জড়িত রক্ত-নাড়ীর সম্পর্ক আছে এদের সঙ্গে আমার।

গ্রন্থের আকার বৃদ্ধির ভয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুখের মেলা'র সব লেখাগুলির ঠাই করা গেল না এই গ্রন্থে। বাকি লেখাগুলির সাক্ষাৎলাভ ঘটবে অন্যত্র।

পঁচিশ বছর বয়েসে আমার যে চারটি গল্প নিয়ে ১৯৫৫ সালে 'বুভূক্ষা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় তার থেকে 'বদলিওয়ালা' এবং 'বুভূক্ষা' 'বাংলার চালচিত্রে'র মধ্যে গ্রহণ করেছি—'আড়বাঁশি' গল্পটি 'রাঙা ডালিম ফুল' নামে 'মুখের মেলা'য় সঙ্কলিত হল। 'কণ্টিকারী' গল্পটি বাদ গেল, কেন না তার বিষয়বস্তু প্রায় সবটাই গ্রাস করেছে 'চালচিত্রে'র 'গরুহাটা'—যদিও দুটির প্রকাশভঙ্গি আলাদা ধরনের। 'বুভূক্ষা' গ্রন্থের চারটি গল্প আমার প্রায় ২০।২২ বছর বয়সের লেখা। এখন তাদের গায়ে সামান্য সামান্য আদরের হাত বুলোনো হয়েছে মাত্র। গ্রন্থটির সমস্ত অর্থাদি খরচ করে প্রকাশ করার জন্যে শ্রদ্ধাস্পদ কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের কাছে আমি চিরকাল ঋণে বন্দী হয়ে আছি।

'মুখের মেলা'র আলোচনা-সমালোচনা করেছিলেন যাঁরা তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুখের মেলা'র লেখাগুলি বই আকারে প্রকাশ করবার অনুমতি দান করার জন্যে সম্পাদকক ও প্রকাশক মহোদয়কে ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাংস্কৃতিক জগতের অনেক সাগরের উৎস শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষ মহাশয়কে 'মুখের মেলা'র মতো একটি সামান্য গ্রন্থ উৎসর্গ করে তাঁর অসামান্য স্নেহপ্রীতির কণামাত্র ঋণশোধ করবার চেষ্টা করলাম।

পরিশেষে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশক মহোদয়দের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই—তাঁরা আমার রচনার সমাদর করে বই বার করে দিলেন।

শব্দকোষ বহির্ভূত গ্রাম্য কথ্য অপরিচিত বহু শব্দের প্রয়োগ থাকাতে—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যার জন্ম—প্রুফরীডারের পক্ষে হয়তো কিছু কষ্টসাধ্য কাজ হয়েছে এবং কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়নি বলে পাঠকদের কাছে আমরা দুঃখিত। তাঁরা নিজগুণে আমাদের ক্ষমা করবেন।

নিবেদন ইতি।

আবদুল জব্বার

মোমিন কুঁজোর সংসার

'লাঙলের একটা 'মুড়ো' খুঁজে খুঁজে শালা হয়রান! এগার বিঘের ভেড়িতে চাল্লিশটা বাবলাগাছ আছে, একটারও ডাল বা গোড়া মুড়ো হবার মতন পেলুম না। শেষকালে কাল 'ঝুজ্‌কো'-(ভোর) বেলা মাঠে গরু বাঁধতে যেয়ে হঠাৎ দেখি পাঁচু দর্জিদের একটা বাবলাগাছের গোড়া ঠিক এইরকম—মোমিন চাচার পিঠের মতন একেবারে—ধনুকবাঁকা—ঠিক লাঙল-মুড়ো হবে…'

পেটের ওপরে একটা হাত-দেড়েক কঞ্চি-বাড়ি রেখে তার মাথায় 'ছাকনি' জালের বুনতে-থাকা চুড়োটা বেঁধে 'কেঁড়ে' ধরে 'নালি' দিয়ে টকাটক জাল বুনতে থাকে মোমিন কুঁজো। পিঠটা তার প্রথম বন্ধনীর মতন বাঁকা। তাতে হাত বুলিয়ে লাঙল-মুড়ো বলাতে রেগে যায় সে। কোনো কোনো মাদী বকৃরির মুখে যেমন এক ছটাক করে দাড়ি থাকে আর জাবর কাটার সময় তালে তালে তা দোল খায়, তেমনি খেজুর-আঁটি চিবিয়ে খাবার সময় দোল খায় মোমিনের দাড়ি-সমেত মুখটা। দোল খাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কপালের চামড়ার ভাঁজগুলো একবার মেঘের কোলে চকিত বিদ্যুৎ চমকের মতন চারিয়ে গেল। ট্যারা চোখের তারা দুটো যেন পট করে উল্টে গিয়ে পাক খেল একবার। দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। বললে, 'স্মুন্দির পো, আমার পিঠটা 'লাঙল-মুড়ো' করতে চাস? কেন লম্বা 'ঈশ'টার দরকার নেই? তোর শাউড়ী বিধবা, বে-আবাদী দেড় কাঠা জা'গা তার পড়ে আছে, ঘাস আগাছা জন্মাচ্ছে, মুড়ো তো পেলি, এই 'ঈশ'টা লিয়ে যা!'

ধীরেন মাল ভয়ানক অপ্রস্তুত। চা-দোকানের সবাই মোমিনের কথায় খুশী। তার ছেলে এরপানেরও পিঠটা একটু বাঁকা। দোকানের টাটে বসে সে কাঁচি চালিয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে দ্রুতহাতে বিড়ির পাতা কাটছিল। নটবর বোষ্টম এলো-গায়ে পৈতে-শোভিত হয়ে কুলো কোলে বিড়ি পাকাচ্ছিল দুলে দুলে।

মোমিনের ছেলে চা-দোকানী। চটকলে বছর-ষোল কাজ করার পর তাঁতের মাকু দিয়ে জুতোর-ঠোক্কর-মারা ম্যানেজার সাহেবের কপাল ফাটিয়ে দিয়ে অফিসের ভেতর হরদম লাথি কিল চড় প্যাদানি খেয়ে পাশবই হাতে নিয়ে চাকরির মাথায় বাজ ফেলে চলে আসে। অনেক কষ্টে তবে 'ফণ্ডে'র (প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের) টাকাটা তুলতে পারে সেই মূল টাকা থেকে থোকা একশো টাকা ঘুষ দিয়ে লাইনবাবুকে। মাগছেলে খাবি খাচ্ছিল একমাস কাজ ছুটে যেতে। মোমিন কুঁজো শ্যাম-

গঞ্জের চটকলে 'পাঁজচাপা'য় কাজ করত। বদলি কাজ। সরদারকে চেকারা দিতে হত। ধেনো খাওয়াতে হত। গাঁজার পয়সা দিতে হত। দশটা টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলে তার 'ইস্তিরি' মানে মেয়েমানুষ তা ছিনিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে নারকোলপাতা পোড়ানো ছাইয়ের সঙ্গে মতিহার তামাকপাত' গুঁড়ো মেশানো গুল মুখে দিয়ে একটা ধামা কাঁখে নিয়ে ফরফর করে চলে যেত হাটের দিকে। মোটা গাবদানা চাল, আধ-পচা আলু, পিঁয়াজ, রসুন আর সের-ছুই 'ঘ্যাঙা' ট্যাংরা কিনে নিয়ে ফিরে এলে এরপানের বউ কাদু বিবি পেটে ময়লা-ভরা মাছগুলো বেছে-কুটে ফেলে, ভাল করে বাটা হলুদ মাখিয়ে রগড়ে ধুয়ে এনে ঝাল-চচ্চড়ি করত। দুপুরে এক ঝাঁপা তাড়ি নিয়ে বসত বাপ-বেটায়। ঝাল-কটকটে মাছ অথবা গরুর সস্তা হড়মাসার মাংস কিংবা 'উজড়ি' রান্না মাটিব মালসা থেকে চেখে চেখে খেত—ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে তাদের ঘাম ঝরত। এরপান চটকলের ফাণ্ডের টাকা পেলে বারোশো। সেই দিয়ে দোকান করেছে। এখন নাকি তার সাতশো টাকা 'বিলেত' বাকি। দোকানে খদ্দের কমে গেছে। কাঠুরের দল, খড়ের গাড়ি-অলা গাড়োয়ান খদ্দেররা—যারা দূর দূর থানা এলাকা থেকে আসত—প্রথম প্রথম নগদ খেত—তারপর ধার—শহর থেকে ফেরার পথে তারা অন্যদিক দিয়ে পালাত—চটকলের হাঁটুরে খদ্দের—গাঁয়ের কিছু মদ-মাতালে লোকরা—বাকি ফেলে ফেলে এরপানের দোকান ডকে তুলে দিল।

মোমিন কুঁজোরও হাঁপানীর ব্যামো ধরল। কাজ গেল। তবু সে ধানবন থেকে 'পাতি'-ঘাস কেটে এনে এনে সেসব শুকিয়ে ঝেড়ে নিয়ে 'ঝাৎলা' বুনত দড়ি-বাঁধা মাটির 'গুলো' তোলা-পাড়া করে। তার বাচাল মেয়েমানুষটা খুব ছোঁচা পরপুরুষপ্রিয় ছিল বটে কিন্তু (সোয়ামী কোনোদিন চিৎ হয়ে শুতে না পারলেও) ঘর ছেড়ে 'বিন্দাবনে' পালায় নি। শিকার করে যেখানে যা পেয়েছে 'ডোঙ্গা' পিঁপড়ের মতন নিজের গর্তে অর্থাৎ ঘরেই এনেছে। জলা-জাঙাল ঘুরে লোকের খেজুর গাছের পাতা কেটে এনে দিয়েছে লগিতে কাস্তে বেঁধে ধেনে টেনে। বউট. তার মজবুত। গাছে উঠে কাঠ-কুটো ভাঙতে পারে। বেরদ্দ পেট নিয়ে একবার হেলানো গাছে উঠে সোজনে ডাঁটা পাড়তে গিয়ে মড়কা ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে বাচ্চা বিইয়ে ফেললো! আর সে বাচ্চাটাও বেঁচে আছে এখনো! শাউড়ী-বউয়ে সমান। যখন ঝগড়া লাগে যেন মোরগের লড়াই চলে। কাপড় খুলে পড়ে যায় দুজনেরই। গাঁজা ভাঙে মুখ থেকে সারাবেলা।

মোমিন এসে জাল-বাড়ি দিয়ে ঘা-কতক ধরিয়ে দেয় তার ইস্তিরি ফুলী

বিবিকে। বিবি তখন বুড়োকে 'পাথর-কোলা' করে তুলে নিয়ে গিয়ে পানাপুকুরে দেয় ফেলে! আঁচড়া-কামড়া করে পরনের লুঙ্গি ঘাটে ফেলে রেখে মোমিন কুঁজো বাকুলে ছুটে এলে বউমা মা-কালীর মতন এতখানি জিব বার করে লজ্জা কেটে ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। ঝগড়া থেমে যায়।

বুড়ী খিলখিল করে হাসতে থাকে। বুড়ো মারতে থাকলেও সে গ্রাহ্য না করে জোর করে গামছা পরিয়ে দেয়। বলে, 'ওলাউঠো মিনসে ভোম্বল দাস হয়েছে।'···পাড়ার ছেলেরা হেসে কূল পায় না।

সেই মোমিন কুঁজো একদিন মারা গেল। হাঁপানীর অসুখে সে কাহিল হয়ে পড়েছিল। কোনো চিকিৎসা করতে পারে নি। হরদম তামুক খেত বলে নাকি ঐ হাঁপানী ব্যামো ধরেছিল, পাড়ার 'হোমোপ্যাথি' ডাক্তার বলেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন দম ছুটে গেল। এমন কপাল তার যে ভারতের মতন এমন একটা পুরানো সভ্য দেশে প্রায় ছাপ্পানো বছর বেঁচে থেকেও জীবনে নাকি কক্ষনো একটা ডালিম কিংবা বেদানা কি জিনিস খেয়ে দেখে যেতে পারে নি!

মোমিন লোক খারাপ ছিল না। একটু তাড়ি, একটু তামাক পেলেই খুশী হত। শুধু সে রাগত তার পিঠের কুঁজটা সম্বন্ধে কেউ যদি কিছু তামাশা করত। আর 'মোমিন মল্লিক' না 'মোমিন সেখ' শুধোলে। সে বলত, 'মোমিন স্যাক'।

'স্যাকের ইয়েতে ম্যাক!'

'মল্লিকের ইয়েতে তালগাছ!'

'মিলল কই?'

'মিলুক আর নাই মিলুক—ইয়ে তো ফাটল!'

এইভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কির মাথায় কখনো হয়তো বা ধীরেন মালের কোলের ওপরে পা তুলে দিত মোমিন কুঁজো। ধীরেন তাকে কোলে করে তুলে এনে দোকানের খোলার চালের ওপরে তুলে ছেড়ে দিত। মোমিন বসে বসে দাড়ি নেড়ে নেড়ে খেজুর-আঁটি চিবত। আর হাসত। বলত, 'লাবিয়ে দে বাবা, কুঁজো মানুষ, লাফ দিয়ে পড়লে তালগোল 'পেকৃকে' যাব!'

এরপানও খাটো লোক। বাপকে উদ্ধার করতে গেলে এককড়া মই চাই। অগত্যা মিনি-মাগনা এক কাপ চা খাওয়াতেই হয় মালকে। তখন সে যাবার সময় বলত, 'আয় বেটা হনুমান, নেবে আয় আমার কাঁধের ওপর।'

মোমিন তখন ঘেমে নেয়ে গেছে রোদ্দুরে। রাগে মুখটা থমথম করছে।

তবু কিছু বলত না। বললে ধীরেন আবার কোথায় তাকে পাখির মতন ঠ্যাং ধরে ঝোলাবে!

দিনে একপোয়া খেজুর-আঁটি চিবিয়ে খাওয়া, ভাল ঝাৎলা-জাল-বুনতে পারা মোমিন কুঁজো মারা যাবার পর এরপানের দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যেই। খানিকটা পানবরোজ করেছিল এরপান, তাও জ্বলে গেল মেয়েরা বাসি গায়ে নোংরা কাপড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে ঢোকাঢুকি করে চুরি করে নাকি পান ভাঙবার 'অত্যেচারে'।

এরপান বলে, 'মাসের অসুখ হলে মেয়েরা যদি পানবরোজের ধারে-কাছে যায়, পানগাছ সব জ্বলে যাবে। ওদের গায়ে তখন একরকম ক্ষার গন্ধ থাকে। গাছ সইতে পারে না। পানদোক্তাখাকী আমার বউটা আমার বরোজটাকে দিলে।'

এরপান এরপর অন্য দোকানে বিড়ি বাঁধতে যেত। দেড় টাকা হাজার। সারাদিনেও সে হাজার বিড়ি বাঁধতে পারত না। সংসার অচল হয়ে গেল। পাঁচটা ছেলেমেয়ে। যুক্তফ্রণ্টের প্রথম রাজত্বকাল এল। চালের দাম তিন টাকার উপরে উঠে গেল প্রতি কেজিতে। বেসম খেয়ে খেয়ে দুটো ছেলে মরে গেল রক্ত-আমাশা ধরে। ফুলী বুড়ী কয়লা কুড়োতে গেল। এরপানের যৌবন-ফোটা মেয়েটাও গেল দাদির সঙ্গে ঝোড়া কাঁখে নিয়ে চটকল অঞ্চলে।

এরপানের বউ কাদু বিবি পাড়ার একটু অবস্থাপন্ন চাষী-বাসির বাড়ি যেত বাটনা পিষে আর জল তুলে দিতে। কারো বা ধান ভানত ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে, কারো শশাক্ষেতে জল দিত ডোঙার মুখে পা চেপে, জলভরা ডোঙাবাঁশের কপিকল টেনে তুলে তুলে।

ঘরের উলুর ছাওয়া ছাউনি গলে গেল। বর্ষাকালে সারারাত তারা কুঁকড়ি হয়ে জলে ভিজত। বিদ্যুৎ চমকালে, বাজ পড়তে থাকলে, 'আল্লা আল্লা' বলে ডাকত। ভিজে ছাগলটাও ব্যা-ব্যা করত।

হঠাৎ তিন-চারদিন পেটে দানাপানি না পড়াতে একদিন ভিটেমাটিটুকু মাত্র দুশো টাকায় বন্ধক দিয়ে ফেললে এরপান। এক বছরের কড়ারী বন্ধক। আগামী বৈশাখ পর্যন্ত। কিন্তু মূর্খ এরপান জানত না যে সাফ-কোবালা বন্ধকের নামে বিক্রি দলিল করেছে পাড়ার অনেক জমি আর টাকার মালিক সাবাহার মণ্ডল। ভিটে বন্ধকের আগেই আম, কাঁঠাল, বেল, সবেদা—বড় বড় গাছগুলো পেটের দায়ে 'আধা-কড়ে' দরে বিক্রি করে ফেলেছিল এরপান।

যখন এরপানের বাড়ির পশ্চিম পাশে বিরাট মাঠ জুড়ে আমন ধান পেকেছে,

চাষীদের তেমন দিনেও না খেতে পেয়ে পেয়ে সাতদিন পরে মারা গেল সে। মাঠের ধান সে ছিঁড়ে আনতে পারত, রগড়ে মেড়ে চাল বার করে খেতে পারত, তা করে নি সে। একজন নেতা এলেন খবর পেয়ে কদিন পরে। দশটা টাকা দিয়ে গেলেন কাদু বিবির হাতে। বললেন, 'না খেতে পেয়ে মরে গেছে এই বিপোর্ট দেবে সবকারী তদন্ত এলে।' খবরটা খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। তদন্ত হল। রিপোর্ট গেল, 'অনাহারে মরে নি। হার্টফেল করেছিল।'

সত্যিই মরবার সময় সব মানুষই নাকি হার্টফেল করে। দেশের সবার উঁচু নেতা থেকে এরপান আলিব পর্যন্ত এখানে গণতান্ত্রিক সমান অধিকার।

ফুলী বুড়ী ডাগব-হয়ে-ওঠা নাতনীকে নিয়ে একদা মেটিয়াব্রুজে চলে গেল। সেখানে নাকি কোন হিন্দুস্থানী মুসলমান কসাইযেব সঙ্গে নাতনীর সাদি দিয়েছে। সেখানে ফুলীও থাকে। মাঝে মাঝে ছাপা শাড়ি পবে কালো বোরখা ঢাকা দিয়ে দাদি-নাতনীতে আসে। এসে ভিটেয বসে, অনেকক্ষণ কাঁদে। তারা এলে কাদু বিবি ঝোলে-ঝালে রান্না করে, তাদেব আনা মাছ-গোস্ত চাল-ডাল নিয়ে। দু-একদিন থেকেই তাবা চলে যায। এবপানের মেয়ে নাকি অসামান্য সুন্দরী হয়ে উঠেছে মোড়লেব চোখে। সাবাহার মোড়ল ছিপ ফেলতে, বাগান দেখতে এসে সারাদিন কাটিয়ে যায। এবপানের মেয়ে লাযলা ঘাটে এলে বলে, 'কি লো বুন, ভাতার-বাড়ি থেকে যে আব আসতেই চাস নি লো?'

লাযলা হাসে। বলে, 'এসে কি কবব? ভিটেমাটি তো তোমার হাতে বন্ধক।'

'তুই থাক্, ফিরিয়ে দোব।'

'দুশো টাকা দোব, ফেরত দাও।'

'সে সময কেটে গেছে।'

'কেন, বোশেখ মাস পযন্ত তো?'

কাছে আসে সাবাহাব। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। ফাইন গেঞ্জি আর ধুতি পবে লোকটা। হাতেব বাজুতে মিনে-কবা তাজমহল আঁকা সোনার 'পদো' বাঁধা। পুকুরের ওপাব থেকে ঘাটে এলে জলে নেমে পড়ে লাযলা। ঘাট চেপে বসে সাবাহার। লায়লাব বুকে জল ছেঁচে দেয়। তার পুরন্ত যৌবন প্রকট হয়ে ওঠে ভিজে কাপড়ে। লায়লা বলে, 'কি হচ্ছে দাদা, ছি-ছি, সবো, আমি উঠে যাই।'

'বোরখা পিঁদিস, মেটেবোরোজে যেযে খুব সতী-সাবিত্রী হইচিস না?'

উঠে পালাতে গেলে হঠাৎ লাযলাব হাত ধরে সাবাহাব মোড়ল।

লায়লা আঁতকে ওঠে।

'ছি! তোমার ই-কি কীর্তি! কি চাও—ওমা!…'

কিন্তু মা বা দাদি কেউ তখন বাড়িতে ছিল না। তারা কনণ্ট্রোলের মাল তুলতে গিয়েছিল। লায়লা তা জানত। বোধ হয় মোড়লও।

তাই মোড়ল তাকে ছাড়লে না। পাড়ার একান্তে নির্জন মাঠের ধারে বাড়ি। মোড়লের হাতে কামড়ে দিলে লায়লা। কেঁদে গেল। তবুও নিজেকে বাঁচাতে পারলে না। ক্ষুধার্ত সিংহ যেন হরিণীকে ধরে দলতে পিষতে লাগল।

শেষে ছেড়ে দিতে লায়লা ছুটে গেল মায়ের ঘরের মধ্যে একটা বঁটি কিংবা কাটারি খুঁজতে। তাও পেলে না। তখন গাল দিতে শুরু করলে, 'হারামির বাচ্চা, তোর মা-বুন নেই…'

'আচ্ছা, আচ্ছা, মজা দেখাব, ভাগো হারামির বাচ্চারা, আজ রাত্রেই ঘর পুড়িয়ে তেড়ে দোব।'

'তোর নামে বিচার ডাকব রে খানকির বেটা।'

সাবাহার বললে, 'কোনো শালা আসবে না। আমাকে সবাই চেনে। আমার টাকা আছে। দিন-দুপুরে কত শালার মুণ্ডু 'উইড়ে' দিই মুই। ভাল চাস তো চুপ কর্, বাপের ভিটে বাঁচাতে চাস তো থেকে যা। আর…'

'আর তোর সঙ্গে থাকি!'

'হাঁ।'

স্তম্ভিত লায়লা। আর বাক্য সরল না। লোকটা ছিপ হাতে নিয়ে মাঠের পথ দিয়ে তার তেতলা পাকা বাড়িটার দিকে চলে গেল।

লায়লার গা ঘিন-ঘিন করছিল। পুকুর থেকে চান করে এল। মা আর দাদি আসতেই বললে, 'এক্ষুনি আমি চলে যাব মা! দাদি, চল এক্ষুনি!'

'কেন, এক্ষুনি যাবি কেন? কাল যাবি বললি তো?' কাহু বিবি অবাক হয়।

লায়লা বললে, 'ঘরে তোর একটা বঁটিও নেই? সব প্যাটে দিতে হয়?'

'কি হল কি?'

খুব অশ্লীল একটা কথা উচ্চারণ করলে লায়লা। কাপড়-চোপড় পরে নিলে। দাদিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। আগুনের মতন যেন তার মুখখানা জ্বলছে তখন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে আর ভরসা পেলে না কাহু বিবি।

লায়লা এসব ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করে না। মা হলেও একথা ফাঁস হতে পারে। তাহলে আর তার স্বামী নেবে না।

তবু কাহু বিবি আন্দাজে বুঝতে পারে।

পরদিন মোড়ল সাবাহার তার 'বাকুলে' এসে বলে, 'এরপানের বউ, এবার তো তোমাকে রাস্তা দেখতে হয়। বন্ধকী 'ডিউ' কেটে গেছে।'

'কোথা যাব বাবা ?'

'তা আমি কি জানি !'

'মেয়েটা দুশো টাকা ফেরত দিতে চায়, নিয়ে জায়গাটা ফেরত দাও বাবা, বন্ধক ছিল তো, এখনো বোশেখ মাস আসে নে।'

'বিক্রি দলিল ছিল দেড় হাজার টাকার।'

'দেড় বিঘে জায়গা দুশো টাকার মিথ্যে দলিলে তুমি দেড় হাজার টাকায় বিক্রি লিখে নিলে ? এই কি তোমার ইমান হল বাবা ?'

'আমি তো আর ইমানদার মওলানা-মৌলবী নয় কাদু বিবি। কাল থেকে সরে পড়ো। যোয়ানী মেয়ের কাছে যাও—ভাড় সেধে খাওয়াবে সে।'

মোড়ল চলে গেল।

কাদু বিবি কাঁদছিল পাড়ার এক বাড়িতে বসে লঙ্কা-হলুদ গুঁড়ো করে দেবার সময়। হামানদিস্তে ঠুকে ঠুকে সে লোহায় লোহায় লাগা কর্কশ শব্দ তুলছিল আর কথা বলছিল।

কাদু বিবি মোটাসোটা খাটো মেয়ে। রঙ মেটে, নাক ভোঁতা। চোখ দুটো গোল গোল। ছোট কোলের ছেলেটা একটা স্তন বগলের ভেতর দিয়ে বার করে এনে পিঠে চড়ে চুষছিল।

কাদু বিবি বললে, 'চলে যাব মা, ভিখ মাগব। কি-ই বা আছে ? ভাতারের শূন্য ভিটে আগলে আর কি হবে ! শুধু একটা বক্‌রি-ছানা আছে। দুটো ছানা হল ধাড়িটার। একটা শ্যালে নিলে। ধাড়িটাও ধান খেতে যেতে সাবাহার মোড়লের ছেলেটা ধরে চুবিয়ে দিলে। হাঁ গা মা, ছাগলকে চুবোলে কি বাঁচে ? কানে পানি ঢুকে গেল ! ক'দিন বাদে মাথা ঘুরে ঘুরে মরে গেল। কচি বাচ্চাটা 'আসাম' (ফেন)-পানি খেয়ে আর কদ্দিন বাঁচবে ? তাই মুই লিজের বিছানায় লিয়ে শুই। মোর এই ছাওয়ালটা একটা মাই খায়, বক্‌রি ছানাটা আর একটা মাই খায় !'

পাড়ার বউরা তাজ্জব। বলে কি এরপানের বউ !

কাদু বলে, 'আমি মা, বাচ্ছাটা না খেয়ে মরবে, দেখতে পারি কি ? বিছানায় মুতে দেয়, কি গন্ধ মা ! তবু কি করব ?' একটু হাসে কাদু।

আবার বলে, 'তা চুপ করে দুধ টানবি তো, না থেকে থেকে এমনি করে খালি ঢু মারে, ঢু মারে!'

ছাগল-বাচ্চা তার মায়ের পেটের তলায় মাথা গলিয়ে দুধ না পেলে যেমন করে ঢু মারে পিছনের পায়ে ভর রেখে, অবিকল সেই রকম ভঙ্গি করে দেখায় কাদু বিবি। মেয়ে বউরা তার কথা শুনে আর ভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সেই কাদুর ঘর পুড়ে গেল একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা। কাদু বাড়িতে ছিল না। সন্ধ্যায় ফিরে সে খুব কাঁদলে। তারপর তারা মোমিন কুঁজোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না। হয়তো তারা পথে পথে ভিক্ষে করছে। হয়তো লায়লার কাছে যেতে তার হিন্দুস্থানী স্বামী শাউড়ীর নিকের ব্যবস্থা করতে চাইলে, লজ্জার মাথা খেয়ে পালিয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু কাদু বিবি! পালাবে আর কোথায়? এই সংসার-নেকড়ের কাছে তুমি তো মাত্র একটা ছাগলধাড়ি!...

মোমিন কুঁজো বলত, 'শালা গরিবলোকের জীবনটাই হল আমার ধনুক-বাঁকা পিঠের মতন। হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, কক্ষনো আর চিৎ হতে পারে না।'

রাঙা ডালিম ফুল

গোটা শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবু কেন যেন বুকের বাঁশিতে গুম্‌রে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম-কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

চাল ধুয়ে রান্না বসালে। কে আর বাট্‌না বাটে! ডাল ক'টা একটুকরো কানিতে বেঁধে ছেড়ে দিলে হাঁড়িতে। চালের বাতা থেকে আড়বাঁশিটা পেড়ে নিয়ে সারাদিনের পর বসল সে ছিটে-বেড়ার দেওয়াল হেলান দিয়ে। মাঝে মাঝে উনোনের জ্বলন্ত কাঠকুটোগুলো ঠেলে দেয়। কত কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

নৌকোর লগি ঠেলে এসে সারাদিনটা আজ নির্দানাপানি অবস্থায় কাটল সুন্দরের। সারা গায়ে পরিশ্রান্তির ব্যথাটা চারিয়ে বেড়াচ্ছে। জ্বর-জ্বর ভাব। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। একমুঠো রান্না না করলেও নয়।

আজ যদি তার মা কিংবা বোনটা থাকত, তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

মা—বাবা—বোন!···

কোথায় যে গেল তারা!

শঙ্খচূড়ের গর্জনে ক্ষুধার সমুদ্র তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

বিরাট একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বাঁসুলী গাঁয়েও। কাঙ্গলের হাহাকারে আকাশ আর মাটির ইতিহাস ভরে গেল কালো কলঙ্ক রেখায়।

পঞ্চাশ লক্ষ জীবনের কৈফিয়তহীন রোমহর্ষক একটা কালো রেখা। তারই গভীর অতলে হারিয়ে গেল সুন্দরের নওজোয়ান বাবা, তার মা, আর যুবতী বোনটা।

ভোরের আঁধার চিরে পুবের আকাশ আলো করে সূর্য উঠতে তখনো ঢের দেরি। স্পষ্ট মনে পড়ে সুন্দরের, কানাভাঙা মাটির সানকি নিয়ে সুন্দর যাবে না বলে মেরে-পিটে ফেলে রেখে সেই যে তিনটে বুভুক্ষ প্রাণী চলে গেল কোথায়—কোন্ লঙ্গরখানার উদ্দেশে, কে জানে! তারা আর ফিরে এল না।

সুন্দর বুকে হাত বেঁধে কেদে কেঁদে অনেক খুঁজেছে। মা, বাবা আর বোনটার কোনো সন্ধানই পায় নি সে।

নিকষ কালো—পোড়া কাঠকয়লা চেহারা—ক্ষুধার আগুনে ধকধক করে জ্বলছে দুটো ঘোলাটে চোখ। পরনে জড়ানো ফালিখানেক নোংরা ন্যাকড়া, বয়স তখন আন্দাজ দশ কি বারো।

শহরতলীর নোংরা গলির একটা অতি জঘন্য 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র সামনে দাঁড়িয়েছিল সুন্দর।

পেটভাতায় থেকেও যদি একটা কাজ পায়—সে বাসন মাজাই হোক আর জল তোলাই হোক!

হোটেলের মালিক একজন অবাঙালী ভদ্রলোক। হাতে-পায়ে ধরে একটু কাকুতি-মিনতি করতেই হয়ে গেল। পেটভাতায়। পরনের কাপড়-চোপড় বা পূজো-পার্বণ দেখবার মতো দু'চার আনা পয়সাও না।

বিপদে পড়িয়া সাধু···তাই সই।

কিন্তু বাসী পচা তরি-তরকারি খেয়ে খেয়ে দু'বেলাই শুধু চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে লাগল সুন্দরের। তারপর ঘুষঘুষে জ্বর। মাঝে মাঝে কেবলই তার মনে হতো পালিয়ে যাবে সেই শয়তানের আড্ডাখানা থেকে ছুটে একেবারে বাঁসুলীর মাটিতে।

ঘরখানা পড়ে আছে।···হয়তো ফিরে এসেছে তার মা-বাবা-বোন। না, আর নয়—কালই চম্পট দেবে সে।

হাড়ের মজ্জাগুলো বুঝি কুরে কুরে খাচ্ছে জ্বরের পোকাগুলো। ছামাড়-ঘেরা পাশের খোপটার মধ্যে মালিক রামহরি যেন কার সঙ্গে মিঠে মিঠে বাত বলছে! রোজই তো বলে! দুটি ভাত দেবার লোভ দেখিয়ে রোজই ও যোগাড় করবে এক-একটা মেয়েমানুষ!

পরের দিন কিন্তু বেতাল জ্বর। হুঁশপবন নেই সুন্দরের। গলির সেই মিতে ছেলেটা এসে মাথা টিপে দিয়ে গেল, দিয়ে গেল তার সুন্দর নকশা-কাটা আড়-বাঁশিখানা—মিতে যদি একটু শান্তি-সোয়াস্তি পায়।

কিন্তু রামহরি যে এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল তা বুঝি শুনতে পায় নি সুন্দর? মিতে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'সুন্দরের জ্বর!'

'জ্বর হওয়া বার করছি। শালা বদমাসের ধাড়ি। বেরো শালা।'

ছুটে এসে একটা লাথি সাঁটলে রামহরি, সুন্দরের ঠিক পাঁজরে। জ্বরের ঘোরে শুধু একবার খানিকটা এঁকে-বেঁকে উঠে আর্তনাদ করে উঠলো সুন্দর: 'মাগো!'

পরের দিন মাঝরাতটায় হঠাৎ যেন জ্বর-টর সব ছেড়ে গেল সুন্দরের।

দারুণ পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাশের ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। ছামাড়ের ফুটকিতে মুখ গলালে সুন্দর।

একটা মেয়ে যেন চাপাস্বরে আর্তনাদ করছে। অবিকল তার বোনের গলার স্বর যেন।

অস্বচ্ছ আলোয় মুখটা বিকৃত। পাশেই রামহরি।

ঝট্ করে হাতটা বাড়িয়ে কি একটা বস্তুকে টেনে তুলে নেয় সুন্দর। কেরো-সিনের বোতল। মারবে সে রামহরির মাথায়। কাঁকুড়-ফাটা করে দেবে তার বেলের মতো চকচকে টাকঅলা মাথাটা। কিন্তু···না, তার বোন নয়।

কোণের ঘুলঘুলি দিয়ে হুমড়ি খেয়ে গলে বেরিয়ে এল সুন্দর। বাইরে এসে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। স্নিগ্ধ এক ঝলক হাওয়া এসে জুড়িয়ে দিয়ে গেল সারা দেহটা।

মাথার ওপরে হীরকখচিত বুটিদার নীল কাপড়ের সীমাহীন সামিয়ানা পাতা। এগিয়ে চলল সুন্দর শহরতলী ফেলে রেখে সবুজ ঘাসে-মোড়া গভীর রাত্রির কালো আস্তরণ জড়ানো পল্লীর পথে।

ভাতটা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

ফ্যান ঝাড়তে হবে।

দুঃস্বপ্ন রাত্রির এলোমেলো স্বপ্নের মতো কালো ছায়াগুলো সন্তর্পিত পদে ঘোরাফেরা করে।

আটটা বছর কেটে যায় 'কোমেন' দিয়ে।

শুধু রামহরির বেঁটেখাটো শরীরটা আজও যেন একটা হিংস্র হায়েনার মতো জ্বলজ্বল করে তার স্মৃতির আঁধার আকাশপটে। তারপর অবিনশ্বর, অচঞ্চল, অবিস্মরণীয় তিনটে নক্ষত্র কোলাহল-মুখর দিনের আলোতেও ভাস্বর থাকে। তার মা-বাবা-বোন···

নদীতে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে সুন্দর। তিনদিন জন খাটে তো চারদিন বসে থাকে। একদিন রান্না করে, দুদিন ধরে খায়। যাত্রা শোনে। মিটিং শোনে। শুয়ে পড়ে থাকে। কত কথা ভাবে।

কালো মিশমিশে পাথর-কোঁদা চেহারা। গড়নটা বেশ সুন্দর। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। 'কাঁকুই' দিয়ে ছোট আয়নাটা ধরে কত করেই না আঁচড়ায়। সাজি-মাটি দিয়ে সপ্তায় একবার করে কাচা ফরসা কাপড় পরে বাঁশিতে সুর ভাঁজে। বেহুলা-লখিন্দরের পালা গান। ভাইয়ের গান। যাত্রার গান।

গোবিন্দ আসে। বেচারী তোতলা। তবু সে এক অব্যক্ত সুরের লহরায় মশগুল হয়ে টেনে টেনে গেয়ে যায়। তাল মিলিয়ে বাজায় সুন্দর; সেদিন হয়তো আর রান্নাই করলে না। ও শালার এক ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া চালও বাড়ন্ত। তার থেকে সারাটা রাত সে ওই চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে গভীরে তান ধরবে আড়-বাঁশিতে। সামনের হলদি নদীর চরের ওই শিরীষ শাখার অন্তরালে হঠাৎ ডেকে উঠবে দুরন্ত-স্বর একটা কোকিল। উদ্দাম রক্তের প্রতিটি কণায় কণায় শিহরণ জাগবে সুন্দরের। অনেক দূর থেকে বয়ে-এনে-বসানো কামিনী ফুলের চারাটার মাথায় থোকা থোকা ফুলের গুচ্ছ। সৌরভে চারদিকটা মাতিয়ে তুলেছে। আর রক্তরাঙা ফুলে ভরে গেছে ডালিম গাছটার ডালপালা। সুন্দরের মনে হয়, একদিন-না-একদিন খুব রূপবতী একটা পরী সুরের মোহে পড়ে নেমে আসবে তার বাড়ির উঠোনে। রূপে চারদিক 'উজ্জ্বাল' হয়ে যাবে। তারপরে তার হাতখানা ধরে মিষ্টি সুরে বলবে: আর বাঁশি বাজায়ো না ওহে ঘনশ্যাম!···

হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে সুন্দর। যাত্রাদলের মেয়ে সেজে তো ও-পাড়ার নিখিল ডাক্তার বলে অমন করে!

আজ আর গোবিন্দটা এল না। তালগাছ ধরেছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে,

তিন টাইম ছ'টা গাছ বাইতে হয়। এখন বুঝি গুড় জ্বাল দিতে বসেছে। পাটালী করে নিয়ে যাবে কাল গঞ্জের হাটে। ওদের অবস্থাটা তবু আছে একটু। ঘরের ধানের ভাত খেতে পায় পাঁচ-ছটা মাস।

ঘর কুড়ি দুলে, দলুই, গরু ব্যাপারী আর ঢুলীদের নিয়ে সুন্দরদের পাড়াটা, বাঁস্থলীর দলুইপাড়া বলে হাঁকডাক। সরু শীর্ণ নদী হলদির ওপারে বামুন কায়েত আর জমিদারদের গ্রাম রায়চক। সেখানে স্কুল, কাছারী, পোস্টাপিস, বাজার, ধানের আড়ত, খটি সব কিছুই আছে। সেখানের মধ্যবিত্ত চাষাভুষোদের জনধন খেটে 'করে-কম্মে' খায় দলুইপাড়ার মানুষগুলো।

নিম্নবিত্ত হাড়-হাভাতের ঘরে জন্ম সুন্দরের। পাড়ার পাঁচজন সুন্দরকে বলে, 'ছেলেটা কুড়ের 'যোমরা'! না হলে কেউ কি আর ভরসা করে একটা ছুঁড়ি দেয় নে?'

সুন্দর হাসে। পরের উপদেশ বা গালমন্দ তাকে গভীরে স্পর্শ করে না। তার অন্তরে যেন একটা নিরীহ মানুষ বাস করে। লোকটা উদাসীন—আডমাতালে।

গোবিন্দ শুনে গালের ভেতরে দুটো আঙুল পুরে দিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে পড়ে গোটা দুই সিটি মারলে। তারপর ঝাঁকি মেরে কাঁধ দুটো তুলে মুখটা লম্বা করে বাড়িয়ে দেয় সুন্দরের দিকে। আনন্দে ডগমগ হয়ে বলে, 'হলদি লদী টইটম্বুর ওগো নলিতে—বলব কেন বাঁশি বাজাও? ডালির পীরিতে!'

তোতলা হলে কি হয়, গোবিন্দ মুখে মুখে বেশ গান বাঁধতে পারে।

মাথায় হাত দিয়ে তিন সত্যি গালতে তবে না বলেছে সুন্দর!

ব্যাপারটা একটু জটিল।

হলদির ওপরে লগি মেরে খড় বোঝাই নৌকো নিয়ে গেছিল সে হরিশপুরে। মুখ-আঁধারী অন্ধকার নেমে এসেছে ফিরতি বেলায়, রায়চকের বামুনপাড়ার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। অস্পষ্ট, চেনা যায় না। সুন্দরের নাম ধরে ডাক দেয়:

'সোন্দর, ও সোন্দর—আমাদের নিয়ে যা বাবা।'

'সুন্দরদা'—ডালিমের কণ্ঠস্বর না?

লগি মেরে মেরে চরে ভেড়ালে সুন্দর তার নৌকোখানাকে! ডালিম আর তার বুড়ো মা, অবলা। সিধু বৈদ্যদের ধান ভানতে গেছিল নাকি তারা।

ডালিম তার মুখের দিকে চেয়ে খালি খামখাই হাসলে এক ঝলক। মলিন ঠোঁট দুটোয় এক চমক বিদ্যুৎ যেন। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে রইল ওদিকে করে।

হলদির জলে তখন জোয়ার লেগেছে। উজান পাড়ি মেরে যেতে হবে বাঁস্থলীতে। জলের স্রোতে কলকল ছলছল শব্দ।

বুড়ী অবলা বলে, 'সোন্দর! ও সোন্দর! বলি, এই ন-চ্যাংড়া বয়েসে তুই কানের মাথাটা খেলি নাকি র‍্যা ছোঁড়া?'

'কি বলছ মাসী?' লঁগি তুলে শুধোয় সুন্দর।

'বলি কত্‌কে মাছ কটা কিনলি র‍্যা বাবা?'

'উ আর কত্‌কে মাসী! ছ' আনা। কেন, লেবে তুমরা? লও না।'

'না, না। উ তোর আশায়ের চিজ। তুই নিয়ে যা। এঁদে-বেড়ে খাবি হোন।'

'না গা মাসী, উ-শালার এক ঝঞ্ঝাট! তুমি লিয়ে যাও। বাচতে-কুটতে পারবু নি আমি।'

অবলা খুশী হল অন্তরে, ছেলেটার সরলতা দেখে। চোখ উল্টে বললে, 'আর বাবা সি একদিন গ্যাছে! তোর বাপের মতন কি দুটো মনিষ্যি ই গেরাম অঞ্চলে ছ্যালো? যেতটুকুনই মাছ-মাংস নেস্থক, তোর ই মাসীকে দিতে-ধুতে কি ভুলত? সারাদিনটা তো পড়ে থাকত আমাদের বাড়িতে। তোর ঠাগ্‌-মা 'আত্তিরে' কত কথা বলত যেয়ে আমাকে। বলে, হাঁ লা বৌ, তুই কি মোর ছাওয়ালটাকে যাদু কল্লি নাকি লা!'

খিলখিল করে হেসে ওঠে ডালিম। পলিমাখা পা দুখানা নামিয়ে দিয়েছে সে হলদির উদ্দাম জলরাশির বুকে। জল পাক খেয়ে খেয়ে ছোট ছোট আবর্ত এঁকে দূরে সরে যাচ্ছে। তেলাকুচোর ফুলের মতো নরম আর উজ্জ্বল-রঙ যৌবন-প্রস্ফুট বছর ষোল বয়সের চেহারা ডালিমের।

বাঁস্থলীর চরে ওদের নামিয়ে দিলে সুন্দর। শালপাতার মাছ ক'টা হাতে তুলে দিতে গিয়ে সুন্দরের মুখখানা মুখের কাছাকাছি হয়ে গেল ডালিমের মুখের। চোখে তার কেমনতর যেন এক মাতাল-করা চাউনি। ফিরে হাঁটতে শুরু করলে ডালিম। পিঠের দিকের আঁচলে বাঁধা গোটাকতক চাল। দুটি মানুষের সারা দিনের উপার্জন! বেলাচরের কাদা-মাটি মাড়িয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডালিমরা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার পাড়ি জমালে সুন্দর। নদীর মাঝ-বরাবর যেতেই পুব আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠল থালার মতন। শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবুও কেন যেন বুকের

বাঁশিতে গুমরে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম-কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

আজ যদি তার মা কিংবা বোনটা থাকত তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছে, এমন সময় কামিনী গাছটার আড়াল থেকে কে যেন অনুচ্চ স্বরে ডাক দেয়ঃ

'সুন্দর-দা!'

'কে, গোবিন্দ? আয় না শালা।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সুন্দর। চাঁদের আলোয় কামিনী গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডালিম।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে।

'কে ডালিম?'

'খাওয়া হয়ে গেল নাকি তুমার?'

'না। ই কি! তুই ফিরে তরকারি আনতে গেলি কেন ডালিম?'

অ্যালুমিনিয়ামের তরকারি-ভরা বাটিটা সুন্দরের পাতের পাশে নীরবে বসিয়ে দেয় ডালিম। কোনো কথা বলে না।

বাঁ-হাতে খপ করে তার একখানা হাত ধরে বসে সুন্দর।

'কি!' চমকে উঠে হরিণীর মতন বড় বড় বোকা চোখ মেলে তাকালে ডালিম।

'কেন তরকারি আনলে!'

'জানি না, যাও। ছাড়ো না সুন্দর-দা!'

'না, খেতে হবে একগাল।'

'যা দুষ্টু! হি-হি! মা এক্ষুণি ডাকবে। এই—ছাড়ো!'

'না, খেতে হবে।' অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুন্দরের।

'যাও!' ডালিম লজ্জায় পড়ে যৌবন-মদয়িত দেহটাকে কাত করে একটা মোচড় মেরে ছাড়াতে চায়।

'আচ্ছা খাবে না তো?'

'আর একদিন।'

'না, আজ।'

'হুঁঃ!' ফোঁস করে উঠল ডালিম।

ভাতের থাবাটা ওর গালের মধ্যে গুঁজে দিলে সুন্দর।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক পড়ল ডালিমের।

'ডালিম—ও ডালি—ওলো ও কমবক্তি—আভাগী বাপখাকী!...'

ডালিম একরকম পড়ি-তো-মরি করে দৌড় দিলে বনতুলসী আর গুলোল-তুলসী, চাক-চাকন্দ ঝোপভরা সিঁথির মতো সরু পথটা ধরে।

এক মিনিট।

ভাত কোলে করে বসে রইল সুন্দর। কি যেন কি হয়ে গেল!

এর নাম কী? অন্তরে ঢেউয়ের মাতামাতি। বুকের আড়বাঁশিতে গুমরে ওঠে সুরের কলগুঞ্জন।

ডালিম! অদ্ভুত!

উঠে পড়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল সে। লম্ফের আলোয় তার কালো ছায়াটাও নাচতে লাগল দেওয়ালে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কালো ছায়াটাকে সে পদাঘাত করলে। তারপর হাসতে লাগল হা-হা করে।

কোনো রকমে খেয়ে ফেললে শেষ-মেষ। খেয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাল করে ভাববে। বাঁশির সুরে সুরে পাগল হয়ে যাবে। পাগল করে দেবে ডালিমকে।

গোবিন্দর কাছে একবার যেতেই হলো।

দিন কেটে যায়, দিন আসে। বাঁশির সুরে সুরে কি মধুর ইন্দ্রজাল বুনে যায় সুন্দর!

এক রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে ডালিম। ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে এসে দাঁড়ায় সুন্দরের বাড়ির উঠোনে। সামনে ফুল-ভরা কামিনী গাছটার আড়াল। ধীরে ধীরে ফিরে যায় ডালিম। রাত্রির অভিসারিকার চরণে চরণে বিহ্বল নূপুর-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ঝিঁঝিদের ডাকে ডাকে—সুরে সুরে।

গোবিন্দর যুক্তিমতো সুন্দর তার মনের কথাটা আমতা আমতা করে পেড়েই বসল বুড়ী অবলার কাছে। বুড়ী তার বকের পালকের মতো সাদা ধবধবে মাথাটা নেড়ে নেড়ে বলে, 'তোর কি আছে র‍্যা ব্যাটা! তোকে আমার সোনার চাঁদ মেয়ে দোব? খাটবি নি খুটবি নি, সাত-সাঁঝেও তোর উন্নে হাঁড়ি চড়ে নে।'

'না মাসী, এবার থিঙে আমি খাটব। এখন অ্যাগলা বলে, হল হল, নেই নেই। না খাটলে চলে? কেস্তন ডালিমকে আমার ঘরে বউরাণী করে লিয়ে যেয়ে কি শুকিয়ে 'আখতে' পারি? সি ফিরে অ্যাগটা কথার মতো কথা হলো মাসী?'

ডালিম দোরের আগড়ের পাশটাতে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে হাত নেড়ে কি যেন ইশারা করলে। পায়ে ধরতে বলছে নাকি বুড়ীর? তা—তা ক্ষতি কি!

হাতটা বাড়িয়ে পা-দুটো যেই না 'পশ্যো' করা অমনি আষাঢ়ে-বর্ষণে-গলা ঢেলাটার মতো গলে জল হয়ে গেল বুড়ী অবলা।

'তবে হাঁ, তুই ছাড়া আর কাকেই বা দোব বাবা ছুঁড়িটাকে! তবে কি জানিস! আমাকে দু-কুড়ি টাকা দিতে হবে। চাঁদের পানা মেয়ে। পণের টাকা নিয়ে কত 'লোগ' 'খোশামোদ' করতেছে।'

ডালিম মাথা হেঁট করে কি যেন চিন্তা করে। গোবিন্দ কালিঝুলি ভরা মাথাটা 'কুলুঙ্গি' (ঘুলঘুলি ছোট্ট, জানালা) দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে চাপা গলায় শুধোয় ডালিমকে, 'কি বললে বুড়ী?'

'চুপ!' ডালিম আঙুল তুলে ইশারা করে গোবিন্দকে।

'আচ্ছা মাসী, 'আম্মো' দোব দু-কুড়ি টাকা।'

'কোথা পাবি?'

'রোজগার করে দোব। কেন, আমি কি মদ্দ-ব্যাটাছেলে লয় মাসী? তবে —তবে এট্টুন দেরি করতে হবে।'

বুড়ী রাজী হলো।

গোবিন্দ ছুটে এসে লাফ মেরে কাঁধে উঠল সুন্দরের। তাকে কথামতো এখন সেই শিরীষতলা অব্দি বয়ে নিয়ে যেতে হবে কাঁধে করে।

ডালিম হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ল একান্তে।

তারপর থেকে সারাদিনের মধ্যেও একবার সুন্দরের টিকির নাগাল পেত না গাঁয়ের কেউ। ভোরে উঠে কাজে চলে যেত আর আসত সেই রাত্রে। সপ্তার ভেতরে হয়তো একটিবার মাত্র দেখা হতো তার ডালিমের সঙ্গে।

বলত, 'টাকা যোগাড় করছি।'

ডালিম ম্লান হেসে বলত, 'কত বাকি?'

'আর এক কুড়ি।'

মৃত্যু যদি এসে দাঁড়ায় এখন সুন্দরের সামনে? না, কিছুতেই পারবে না সে মরতে। যুদ্ধ করবে তার লাঙল-কোদাল কাস্তে-কাটারি, আর লগিবাড়ি দিয়ে। প্রাণপণ। ডালিমকে তার চাই-ই চাই। সে তার হৃৎপিণ্ড!

চারটে মাস। যেন কালের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পাড়ি।

বাঁশের 'চোঙা' থেকে টাকা-পয়সাগুলো মেঝেয় ঢেলে দশবার করে গুনেছে।

দু-কুড়ি! চাল্লিশ!

আনন্দে বুকটা তোলপাড় করে ওঠে। না-খাওয়া না-দাওয়া—চার-চারটে মাস। এক টাকা দু-আনা করে জনের দাম। চুষে নিয়েছে তাকে রায়েরা। নিক।

যাবে নাকি সে এক্ষুণি বুড়ীর কাছে! গড়-গড় করে ঢেলে দেবে টাকাগুলো! চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে বুড়ীর। হঁা, বাপের বেটা বটে সোন্দর!—

না, কাল সকালেই যাবে সুন্দর।

আজ রাতভর বাঁশি বাজাবে। একটা রাঙা ডালিম ফুল ছিঁড়ে এনে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে সে। ফুলটা নিয়ে চুপি চুপি গেল সে ডালিমদের বাড়িতে। অবলা বুড়ী সামনের দিকে মুখ করে খেজুরপাতা দিয়ে চাটাই বুনছে মাথা হেঁট করে। পিছন ফিরে বসে ডালিম চাল বাচছে কুলোয়। সুন্দর রক্তরাঙা আধফোটা ডালিম ফুলটা নিয়ে টুক করে ডালিমের খোঁপায় গুঁজে দিয়ে মারলে এক দৌড়।

ডালিম সন্ত্রস্ত হয়ে খোঁপায় হাত দিয়ে ফুলটা দেখে হাসতে লাগল হি-হি করে। তার হাসির কারণ সুন্দর দৌড়তে গিয়ে পায়ের গলুইয়ে ঢল-কলমীর লতা জড়িয়ে পড়ে গেছে। একেবারে চিৎপাত!

বুড়ী চিল্লে ওঠে, 'হাসি কিসের লা? হাসি কিসের হঠাক্?' ভূতে ধরেছে?

ফুলটা তখন দেখায় ডালিম তার মাকে।

বুড়ীর গাল হাঁ হয়ে যায়। উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে, সুন্দর তখন হাওয়া।

বুড়ী গজ-গজ করে: 'ভালবাসা। ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল! সেই কথায় বলে, 'প্যাটে ভাত নেই ইয়েতে সিঁদুর!'

জীবনের যত গান আজ সারারাত ধরে গাইবে সুন্দর। একটা পিলে-মুরগী চুরি করে আনার কথা আছে গোবিন্দর। তার দিদি যদি গাল দেয় তো নাকের ডগায় ধরে দেবে দেড়টা টাকা। কিন্তু মুরগী নয়, আস্ত রক্তঝরা জ্যান্ত একটা খরগোস

শিকার করে এনেছে গোবিন্দ। ঝিঙে ক্ষেতের মধ্যে মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসেছিল নাকি, আর পাকা ঢেলার বাড়ি দিয়েছে কষে এক ঘা। ছুটল সারা মাঠে খানিক-ক্ষণ। তারপর আর এক ঘা দিতেই ঠ্যাং ভেঙে বাছাধন ড্যাড্যাং ড্যাং!

তোফা মাংস আর ভাত!

সুন্দরের কাকা নিতাই দলুই বলে গেল, 'একটু দিস্ রে সোন্দর। তাড়ি দিয়ে 'পকাবোহোন' মজাসে!'

খেতে বসে গোবিন্দর যেন মনমরা ভাব। সুন্দর ভাবে, একটু তরকারি দিয়ে এলে কেমন হতো ডালিমদের? বলতেই গোবিন্দ ছুটে গেল কলাপাতায় মুড়ে নিয়ে খানিকটা মাংস আলু দিয়ে আসতে।

কুয়াশা-নিথর ভোরের আকাশে তখন পাণ্ডুর চাঁদটা ডোবে-ডোবে। গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ হল। এগিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি।

চমকে উঠল সুন্দর। ডালিম এসেছে তার কাছে। উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে বুকের মাঝখানে চেপে ধরলে ডালিমকে। কতক্ষণ।

ঘুম ভেঙে গেছে গোবিন্দর। সুন্দর উঠে যাবার সময় বাঁশির গোঁজা লেগে গিয়েছিল তার পাঁজরে। উঠে বসল। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটা সরলরেখা। ঢুস্ করে আবার শুয়ে পড়ে গোবিন্দ। ডালিম আসবে সে তা জানত। বন্ধু ব্যথা পাবার ভয়ে সে সাহস পায় নি বলবার। ডালিম নিজে বলুক যদি পারে তো।

'সুন্দর!' কান্নাতে ভেজা কণ্ঠস্বর ডালিমের।

'কি ডালিম!'

'পরশু যে আমার বে!' কেঁদেই ফেললে বেচারী। কাঁপা-কাঁপা হাতে সুন্দরের সারা মুখে হাত বুলোতে লাগল সে।

'পরশু!' বাঁধন ছিঁড়ে যায়। একটি সরলরেখা ভেঙে দুটো হয়ে যায়। গোবিন্দ দেখে। তারও চোখে জল।

'হাঁ পরশু। ভৈরবীতলার নিতাই সরদার মাকে বলেছে চার-কুড়ি টাকা দেবে সে। মা তাতেই রাজী হয়েছে।'

'চার-কুড়ি!'

মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে সুন্দরের।

চার-কুড়ি টাকা!

পরশু দিন!

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও ডালিম। তুমি যাও…'

ধপ্ করে বসে পড়ল সুন্দর। তাহলে তার আর পাওয়া হল না ডালিমকে। ডালিমের পায়ের ওপরে চোখের জল ফেলে মাথা কুটে কুটে কাঁদতে লাগল সুন্দর। ডালিম তার মাথার চুলগুলো কেবল মুঠো করে চেপে ধরতে লাগল আর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। শেষে সে সইতে না পেরে সুন্দরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—পাগলের মতন হাউ হাউ করে বুক-ভাঙা কান্নায় ফেটে পড়ে ছুটে পালিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে—অন্ধকারে।

হলদির জলে অস্তমান চাঁদের সোনাগলা হলুদ বর্ণের আলো তখনো ঝিলমিল করছে। একটু পরেই সব নিখাদ আঁধারে ডুবে যাবে।

গোবিন্দ উঠে বসে পায়ের ওপরে হাত বুলোতে লাগল সুন্দরের। ধরা গলায় ডাকলে, 'সুন্দর! সুন্দর-দা!'

সাড়া দেয় না সুন্দর। অনড় অসাড়। মারা গেছে বুঝি সে।

বার বার ডাকায় বিরক্ত হয় সুন্দর। লাথি মারে গোবিন্দকে: 'যা শালা বেরো! ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ মারাস নি এখন।'

আরো খানিকক্ষণ তবুও বসে থাকে গোবিন্দ। তার কি দোষ! অভিমানে বুকটা ভারি হয়ে ওঠে তার। উঠে চলে যায় সে ধীরে ধীরে।

সকালে রায়েদের কাজে যাবার কথা। চার-পাঁচজন রাজমিস্ত্রি লেগেছে—যোগাড় দিতে হবে। সেকথা মনেও হল না সুন্দরের। লোক এল। যাবে না, জ্বর। পাঁচ সিকে, দেড় টাকা রোজ দেবে, কিন্তু যাবে না বলছে সুন্দর। বসে বসে দুপুর হল—দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধ্যে। না, কিছুই কূল-কিনারা খুঁজে পায় না সুন্দর।

টাকা! টাকা দিয়ে বেচতে চায় অবলা তার মেয়েকে। নিতাই সরদার বুড়ো। টাক পড়া, দাঁত ভাঙা—অবিকল সেই হোটেলঅলা বেঁটে রামহরির মতন। শুধু বুড়ো বর নয়, সতীনের সংসার। তবে আর নেয় না নাকি নিতাই তার আগের স্ত্রীকে। দশ বিঘে জলজমি, গোয়ালে গরু, পুকুরভরা মাছ; খেতে-পরতে কোনো কষ্ট পাবে না ডালিম। মরার আগে অবলা যে কটা টাকা কামিয়ে নিতে পারে ডালিমের বিয়েতে, সেইটাই হবে তার বাকি জীবনের আয়ু।

অবলার কোনো দোষ নেই। দোষ নেই ডালিমের—নিতাই সরদারেরও। টাকার জয় হয় সংসারে। দোষ তার নিজেরই। অন্ধ ভালবাসার। কাকা শুনে বলে, 'দুনিয়াটা বড্ড ফ্যাচাংয়ের জায়গা রে বাবা! কি আর করবি, ছাই মেখে সাধু হয়ে যা!'

সুন্দর শেষে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেললে মনে মনে। পরদিন বাঁশের 'চোঙা' থেকে সব ক'টি টাকা ঢেলে নিয়ে চলে গেল শহরে। সেখান থেকে ফিরতে বিকেল। বেশ হাসি-হাসি মুখটা। ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে ড্যাং-কোড়ে খেললে খানিকটা। খেটে খেটে 'নাক্‌সে দম'। ডালিম ওদিকের জাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাঁকে যেন গ্রাহ্যই করে না সুন্দর। তাকায় না একবারো ভাল করে ফিরে। সেখান থেকে নিতাই দলুইয়ের বাড়িতে তাড়ির আড্ডায়। কাকা বলে, 'তাড়ি খাবি নি, মদ খাবি নি তো কি খাবি র্যা ছোঁড়া! ক'দিন বাঁচবি বল্? ভাল ভাল ভদ্দরনোকেও আজকাল তাড়ি-মদ খাচ্ছে।'

তা তো বটেই। গেলাস পাঁচ-ছয় টানলে সুন্দর। গাঁজা ফোটা দু'দুদিনের কড়া মাল। পেটে পড়তেই বিক্রম শুরু করে দিলে। কাকা-কাকীকে গড় করে উঠোনে গোটাচারেক ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল সে।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

নেশায় চুর!

'পা টলে টলে খানায় পড়ে
এতো বড় মজা,
এক পয়সার দারু কিনে
চাট করেছি তাজা!...'

কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে সুন্দর টলে টলে ডালিমদের বাড়ির পিছন দিয়ে ফিরে এল। বাড়িতে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়ে রইল ধুলোয়। সেখান থেকে উঠে আবার নদীর ধারে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ।

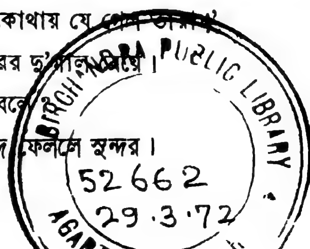
আর একটা রাত। আজ আসবে নাকি ডালিম!

গোবিন্দও আর দেখা করলে না। কেন, কেন সে মারতে গেল তাকে? এই ছন্নছাড়া জীবনকে সোনার তারে গাঁথবার কল্পনা সে নিজে যদি না করে তো কে আর করে দেবে তাকে! আজ যদি তার বাপ থাকত? মা থাকত?—'বাপ-মা আর সোনার পাখী বোনটা! কোথায় যে গেল তারা!'

দরদর অশ্রুধারা গড়ায় সুন্দরের দু'গাল বেয়ে।

গোবিন্দও কি তাকে পর ভাবলে?

'গোবিন্দ!' ফক করে কেঁদে ফেললে সুন্দর।



'সুন্দর-দা !'

'গোবিন্দ !' বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে সুন্দর গোবিন্দকে।

পাড়ার লোকে আর আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়ে অবলার বাড়ি-ঘর মুখরিত। বিয়ে হয়ে গেল ডালিমের, নিতাই সরদারের সঙ্গে। নগদ দু'খান সোনার গয়না। চার-কুড়ি টাকা। ঢলঢলে আগুন রঙের পেটো শাড়িটা ডালিমের দেহের ঢেউয়ের বাঁকে বাঁকে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে লেপ্‌টে রয়েছে। আহা! চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে যায় ডালিমের পানে তাকালে।

আর ওই নাকি বরের ছিরি! সামনের দাঁত ভাঙা। টোপর হড়কে পড়ে যেতে মাথার ওল বেরিয়ে পড়ল। মেয়েদের খিল খিল হাসি। 'বরের বাবা বর! গালে মাংস নেই। খাঁড়-পাঁজুরে চেহারা।···না-হয় দুটো টাকাই আছে। ডালিমের ডালিম ফুলের মতন যৌবন নিয়ে কি করবে ও বুড়ো?' কিন্তু সুন্দর বিয়ে-বাড়িতে গেল। গেল আর ফিরে এল তার দেবার জিনিস ক'টা দিয়ে।

শাড়ি, ব্লাউজ, রুপোর ছ'গাছা চুড়ি, সাবান, বাস-তেল, সিঁদুর। এমনি করে চল্লিশ টাকার মালপত্র। সব দিয়ে এল ডালিমকে।

কাঁদতে লাগল ডালিম উভরায়।

অবলা একসময় কাজের ফাঁকে বললে, 'আহা, অমন 'ছাওয়াল' আর' হয় নে গো! কোথা গেল সে? দেখ্‌ লো তোরা কেউ!'

ফিরে এসে সুন্দর একটা কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেললে প্রথমে রক্তরাঙা ডালিম ফুলের গাছটাকে। তারপর কাটলে থোকা-থোকা সাদা সাদা ফুলে-ভরা কামিনী ঝাড়টাকে। সাদা খইয়ের মতন ঝরা ফুলে তার উঠোন ভরে গেল।

গোবিন্দর সঙ্গে একবার দেখা করে আড়বাঁশিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে বাঁস্থলী ছেড়ে।

ক'দিন পরেই শ্বশুরবাড়ি থেকে গাঁয়ের পথে ফিরে এল ডালিম। ঘাটে দেখা গোবিন্দর দিদি সাবিত্রীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলে সে সুন্দরের কথা।

গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে নাকি সুন্দর।

যাবার বেলা শুধু নিয়ে গেছে তার আড়বাঁশিটা। কেটে ফেলে দিয়ে গেছে ডালিম আর কামিনী গাছ দুটো, তাদের উঠোনের।

গোবিন্দ বললে, 'কোথায় শহরের কোন্ চালকলে কাজ করবে বলে চলে গেছে সুন্দর।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস পড়ল ডালিমের বুকের পাঁজর ভেঙে।

তারপর দু'দুটো বছর···

সিঁথির সিঁদুর মুছে ফিরে এল ডালিম বাঁসুলীতে। মা তখন তার মারা গেছে। আছে যৌবনের আগুনভরা দেহ। আর হৃদয়জোড়া অসহায়তা।

ঘরটা লাদনা, ডাঁসা, আড়কাঠা, পাড় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে বুড়োর মতন হুমড়ি খেয়ে আছে। চালে কাক বসে না প্রাণভরে।

হলদির হাওয়ায় গোপন কানাকানি। মানুষে মানুষে। ডালিমের রূপের আকর্ষণ যেন বিষাক্ত শায়ক। মানুষের অন্তরকে বিদীর্ণ করাই যেন ধর্ম।

কোনো সংস্থান নেই ডালিমের বাঁচার মতন। স্বামী মরার পর সতীন চণ্ডী আবার এসে হাত-পা ছড়িয়ে জুড়ে বসল সংসারে। মুখে তার তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম, সর্বদাই যেন খই ফোটে। লাঞ্ছনা আর গালমন্দ। সে নাকি তার রূপের ফাঁদে ফেলে তার শায়-শক্ত মানুষটার মাথা খেয়েছে চিবিয়ে। মুড়ি-ঝাঁটা মেরে তাকে দিয়েছে দূর করে খেদিয়ে। কিন্তু এতখানিরও বুঝি দরকার ছিল না। ডালিম কোনো একদিন চলেই আসত বাঁসুলীতে।

কিন্তু বাঁসুলীতেও যে আগুনের জ্বালা!

মা-টাও যদি আজ থাকত তার!

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। জীবিকা সংগ্রহের জন্যে পথে বের হতে হয় ডালিমকে। ফাগুনের শুকনো হলদির হাঁটুজল পার হয়ে সিধু বৈদ্যদের বাড়িতে যেতে আসতে দেখা হয় কত লোকের সাথে। তাদের চাউনিতেও কেমন ধরনের কুটিলতা।

নিতাই দলুই সম্পর্কে কাকা হলে কি হয়, বলে, 'ডালিম, তুই আমার ঘরে আয়। পাঁচজনের মুখ বন্ধ করে দোব পাঁচ গণ্ডা টাকা খরচা করে একপেট খাইয়ে দিয়ে।'

'বুড়ো হয়ে মরতে যাও খুড়ো···ছি! ছি! এ কি কথা তোমার।' কেঁদে ফেলে ডালিম।

অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়—দেখা হয় না শুধু সুন্দরের সঙ্গে। কতদিন দেখে নি সে সুন্দরকে। কেমন আছে সে?

কচি কচি কিশলয়ে ভরে গেছে শীতে-পাতা-ঝরা গাছগুলো। কোকিল ডাকে

দুরন্ত সুরে। দখিনা বাতাসে মিশ্র ফুলের গন্ধ। হলদির ওপারে ডুবছে রক্তকরোজ্জ্বল সূর্যটা। ঠোঁট দুটো শুকনো। আঁচলে বাঁধা দুটি চাল। ঢেঁকিতে 'পাড়' দিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বেয়ে যত ঘাম ঝরে পড়েছে, তারই কেমন যেন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। ক্লান্ত পা দুটো টলছে। এমনি একদিনের পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ পথে দেখা হল তার সুন্দরের সঙ্গে।

কালো, শীর্ণ চেহারা। গায়ে ময়লা হাফ-শার্ট। পায়ে টায়ার-কাটা সাণ্ডেল, পরনে কলাপাতা রঙের হেটো লুঙ্গি। হাতে আড়বাঁশি। চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করছে কোটরের ভেতরে। নাকটা খাঁড়ার মতন জেগে উঠেছে। চুলগুলো এলোমেলো।

চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

একটা মুহূর্ত। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চলে গেল।

বুকের মধ্যে তখনো বানবন্যা বয়ে চলেছে কূলে কূলে আছাড় খেয়ে।

একটা কথাও বললে না সুন্দর। কত রোগা হয়ে গেছে। চালকলের তেল কালি ময়লা ধুলোয় সুন্দর হারিয়ে ফেলেছে তার গ্রাম্য শ্যামশ্রী। চেনাই যায় না সহজে। কিন্তু কথা বললে না কেন সুন্দর? কি অপরাধ করেছে সে তার কাছে?

কান্নার চাপে গুমরে ওঠে ডালিমের বুকের ভেতরটা। সুন্দর এসে কোথায় গেল কে জানে? বনজঙ্গলে ভরে গেছে তাদের বাড়ির উঠোনটা। বন্য শ্বাপদের নির্বিপদ আস্তানা। কেটে-ফেলা ডালিম আর কামিনী গাছ দুটোর গোড়া থেকে আবার গ্যাজ বেরিয়ে ঝাড় বেঁধেছে। ছিটেবেড়ার নোনা-ঝরা দেওয়ালের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। ডালিম নির্বাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ফিরে এল।

পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে তখন।

পরদিন সাতসকালেই হরিশপুরের জমিদার দুর্লভ চক্রবর্তীর খলিফা গোমস্তা বুড়ো সনাতন পোদ্দার এল ডালিমের বাড়িতে।

'রাজাবাবু ডাক কইরেচেন। ক' বচ্ছরের খাজনা বাকি। নিলেম হয়ে গেছে। ভিটেমাটি ছাড়তে হবে দিদ্‌ঠাগরোন।' ট্যারা চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে কথা বলে সনাতন। ঝোলা ঠোঁটের বাইরে তার বড় বড় দুটো দাঁত। ফুট করে সোনার টিপ পরানো। লম্বা হয়ে পানের পিক ঝরে পড়েছে পরিপুষ্ট বুক-পকেটঅলা পাঞ্জাবিটায়।

'দাঁড়াও বাবু, নিতাই খুড়োকে ডাকি।'

'আরে মাগী, চ তুই আগে। রাজাবাবু রেগে তালপাতা। কার ঘাড়ে ক'টা গর্দান আছে—বাবু বলে, ছুঁড়িকে বেঁধে আনবি!'

নিতাই এল। গড় করলে গোমস্তা বাহাতুরকে।

'দশ বচ্ছরের খাজনা বাকি! তা না দিস বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কর্। পায়ে-হাতে ধরে একটু…মানে হেঁ হেঁ…'

"তাতো বটেই—তাতো বটেই!' সায় দেয় নিতাই।

সনাতন তাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলে, 'ধরা রে নিতে।'

ডালিম জানে এ ডাকের অর্থ কি। দিনচারেক আগে হঠাৎ পথের মাঝখানে দেখা তুর্লভবাবুর সঙ্গে। পানসি থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছেন। সঙ্গে দারোয়ান। হাতে বন্দুক আর ঠোঁট বেয়ে রক্তঝরা গোটা-তুই মানিকজোড় পাখি! পথরোধ করে বললেন, 'দাঁড়াও! কোথায় বাড়ি?'

বাবুর গায়ে ভর ভর করছে মদের গন্ধ। জুলপির চুলগুলো রুপোর মতন সাদা চকচকে। চোখে ভারি পাওয়ারের সোনার চশমা।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে যেতেই বাবু চিবুকটা ধরে তুলে তার মুখটা দেখলে। বললে, 'হুঁ! কোথায় বাড়ি গো কুন্দকলি?'

'বাঁসুলীতে। বাসুদেব হাজরার মেয়ে আমি।'

'নিলেম হয়েছে, কত টাকা লাগবে জিজ্ঞেস করো তো কাকা। টাকা আমি দোব।'

'আঃ মর্ মাগী! 'পিপীলিকার ডানা হয় মরিবার তরে'। টাকা যদি দিতে হয় তো তুশো টাকা দিতে হবে, পারবি?'

সনাতন গোমস্তা হাত-পা ছটকাতে থাকে।

'একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে মুন কিনে বর্তে যায়—টাকা! মোক্তা কথা! টাকা! হারামজাদীর কথা দেখ না! এখন এই কথার দরুন তোকে পনেরো দিন বাবুর পা টিপিয়ে তবে ছাড়ব!'

'তোর আর তোর লোচ্চা (পতিতার পালিত নাগর) বাবুর মাথায় মারি আধোয়া ঝাঁটা। বেরো হতচ্ছাড়া হাড়-হাভাতে পোড়ারমুখো মিনসে। দালালী মারাতে এয়েছ! বেরো বলছি!'

গাছ-কোমর মেরে ঝাঁটা হাতে নিয়ে সত্যিই এগিয়ে আসে ডালিম।

নিতাই হাঁ করে থাকে। সাক্ষী হবার ভয়ে পাশ কাটায় 'আসছি' বলে।

মেয়েটার কি 'আসপর্দা'। দুর্লভ চক্রবর্তীর নাম শুনলে গর্তের সাপ গর্তে সেঁদিয়ে যায় ল্যাজ গুঁজে, আর তার মহামান্য গোমস্তা বাহাদুরকে কিনা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করা!

'কত বড় বাচাল মাগী তুই, দেখিয়ে তবে ছাড়বে এই সনা গোমস্তা! হাড় পেকে গেছে তোর মতন কত গণ্ডাকে এই দু'ট্যাকে খুঁসে। দিনে পাঁচটা-দশটা! বিধবা, সধবা, কুমারী, যাকে ইচ্ছে।...'

'বেরো ছোটলোক, জিভ খসে যাবে তোর, বেরো!' ঘা-দুই ঝাঁটার বাড়ি কষিয়ে দিতেই হাতের ছড়িটা খুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর হঠাৎ পাঁই পাঁই করে কাছা-কোঁচা খুলে দৌড় মারলে সনাতন গোমস্তা। কেননা ঝাঁটা ফেলে বঁটি খুঁজতে দৌড়েছিল ডালিম: 'গুহোর বেটাকে আজ কুঁচিয়েই ফেলব আমার উঠোনের মাঝখানে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দোব।'

পাড়ার লোক শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে দিলে গালে হাত। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে আড়ি!

গোবিন্দ বলে, 'জলে কুমীর না থাকাই ভাল। মাছটাছ সব শালা খেয়ে ফেলবে।'

নিতাই দলুই বলে, 'ডালিম, ই কাজটা কিন্তন তোর ভাল হল নি কো। জমিদারবাবু য্যাখন ডেকেছে...এগবার...'

কেন, কার জন্যে তার দেহকে লাঞ্ছিত করতে চায় না ডালিম, অতুল উদ্দাম সম্ভোগকে সে পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে গেল কিসের জোরেতে—কিসের আশায়!

কান্নায় ভেঙে পড়ল ডালিম। তার কালো আকাশ বুঝি আরো কালো হয়ে গেল।

বড় অসহায় আজ সে।

বাইরে থমথমে রাত। পৃথিবী-জোড়া কুটিল রহস্যের মৌনতা। আশপাশের বন-বাদাড়ে খস্‌খস্ শব্দ।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে ডালিমের।

ক্ষীণায়ু লম্ফের আলোটা মৃত্যুর পূর্বে হেঁচকি টানতে শুরু করেছে। ভাঙা ছাউনির ফাঁক দিয়ে এক টুকরো আকাশে জলজ্বল করছে কতকগুলো তারা।

বুকভাঙা কান্নার সমুদ্রে কালবৈশাখীর গর্জন।

চারপাশে বিষাক্ত ছোবল হানবার জন্য ফণা তুলে তুলছে ঢেউয়ের ভুজঙ্গরাশি।

'মা! মাগো!'

কালরাত্রির মৌনতা ভেঙে হঠাৎ কে যেন ডাক দেয়, 'ডালিম!'

চমকে উঠে ঘরের এক কোণে জড় হয়ে বসে ডালিম। হাতে টেনে তুলে নেয় একখানা গাছকাটারি।

ভাঙা আগড়ের পাশে এসে দাঁড়ায় লোকটা।

'ডালিম!'

'কে? সুন্দর! সুন্দর! তুমি!'

'হ্যাঁ।' আলোটা নিভে গেল হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া লেগে। দোরটা খুলে বেরিয়ে এল ডালিম।

অন্ধকারে হাতখানা বাড়িয়ে সুন্দর একখানা হাত ধরলে ডালিমের।

সহায়হীন দুর্বলতা আর অবলম্বন লাভের আকস্মিক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে ডালিমের দেহটা। পড়ে যাবে নাকি ডালিম? অসুস্থ! সুন্দরের বুকের ওপরে মাথা গোঁজে ডালিম।

কিন্তু সুন্দর বলে, 'এস তাড়াতাড়ি।'

'কোথায়?'

'পরে বলব। আমি যেখানে যাব, যেতে যদি আপত্তি না থাকে তো চলে এস চট করে। সময় নেই। পেছনে বিপদ।'

তারার আলোয় অচেনা পথ চিনে দুজনে চলেছে হাত-ধরাধরি করে। শিথিল আঁচল টেনে কোন্ উন্মন মায়াবিনী চলে গেছে কবে তারার কুসুম ছড়িয়ে সারা আকাশের ছায়াপথ বেয়ে।

পৃথিবী গভীর তন্দ্রায় সুসুপ্ত।

ক্রু ক্রু শব্দে ঝিল্লী ডাকে।

রাতচরা পাখি ডাকে একটানা গভীর কুহক-স্বরে।

জমাট হিমশৈল গলে গলে পড়ছে সুন্দরের সূর্যকরস্পর্শোত্তাপে। অক্লান্ত —অঝোরে! বুকের পাষাণ-ভাঙা কান্না বুঝি আর বাগ মানে না ডালিমের।

সুন্দর বলে, 'জমিদারের পেয়দা-পাইক আজ রাত্রে তোকে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে নিয়ে পালাত। যে কদিন এই বাঁসুলীতে ফিরে এসেছিস ডালিম, আমার সোনামুখী, তোর পাশে পাশে থেকে আমি পাহারা দিইচি। অবস্থা দেখে ফিরে গেছি শহরে। কদিন 'ইস্টাইক' গেল। তাই ফুরসৎ পেতুম আসবার। গোবিন্দ

সব খবর দিত আমাকে। তাই···একটা ঘরও ঠিক করে রেখে এইচি।'

কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে থাকে সুন্দর, 'কি হালে আমার দু-দুটো বছর যে কেটেছে ডালিম, তুই যদি জানতিস! কত রাত, কত দিন তোর কথা ভেবেছি। কত কেঁদেছি—কত বাঁশি ভেঙে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু মধুমুখী, তোকে আমি ভুলতে পারি নি। তোর খোঁপার দেওয়া সেই রাঙা ডালিম ফুলটার কথা মনে পড়ে ডালিম!'

'হাঁ। মা বলেছিল, ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল!'

তারার আলোয় অশ্রুভরা ডালিমের মুখখানা করতলে ধরে চুম্বন করলে সুন্দর। বললে, 'যদি কোনক্রমে আজ আর না আসতে পারতুম ডালিম, আর কোনোদিন তোকে দেখতে পেতুম না। তুই হঠাৎ খরিশ কেউটের মতন সনা গোমস্তাকে ছোবল হানবি আমি ভাবতেও পারি নি। আজ রাত্রে খুব অঘটন ঘটত তোর কপালে—খুব ভয় করছিল না?'

'সুন্দর, তুমি আমার পাখি, আমার সোনা!' ডালিম তার হাসিকান্না-মাখা মুখখানা চেপে ধরলে সুন্দরের বুকের মাঝখানে। সাহারার হাহাকার জ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে। গভীর প্রশান্তিতে তন্দ্রাঘন চোখ দুটি আরো বিহ্বল হয়ে আসে ডালিমের। টপ্ টপ্ করে দুটো চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে সুন্দরের, ডালিমের মাথার ওপরে।

পীরিনী বুড়ীর বিচার

এক-মানুষ উঁচু দলিজের ওপর বসে মোড়ল বুড়ী ঢ্যারা ঘুরিয়ে পাট কাটছিল, আর সামনের তালপুকুরের ডানহাতি বাঁহাতি দুটি পাড়ে দাঁড়িয়ে ফেনা ভাঙছিল দুটি মাঝবয়েসী মুসলমান বাড়ির বউ। সম্পর্কে দুজনে জা। তাদের গালের বাঁধুনি, ভাষার চাতুরী, খরিশ-কেউটের মতন অঙ্গের দুলুনি সবই লক্ষ্য করছিল মোড়ল বুড়ী।

পশ্চিম পাড়ের বউ লায়েলা বিবি বলছিল: 'কড়কড় করে আগাশ ফেটে বাজ পড়বে তার মাথায় যে মিছে কথা বলবে!'

পুব পাড়ের হালিমা বিবি বলছিল: 'মালসা মালসা, সরা সরা লউ (রক্ত)

ভেঙে মরবে সে আঁটকুড়ির বেটি যে সত্যিকে আঁচল চাপা দিয়ে লুকোবে!'

দু'পক্ষেই বিশ-পঁচিশজন করে মেয়ে জুটে জটলা করছে। কেউ নীরব শ্রোতা। কেউবা কথা যুগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল—উৎসাহিত করছিল উভয় পক্ষকেই।

লায়েলা বলে: 'তুই যদি সতী হবি, হাঁ লা মাগী, তবে তোর লিজের সব ক'টা মেয়েছেলে হয় নে কেন লা? তোর মুরগীই খালি সব 'পিলে'-মুরগী বাচ্চা তোলে, আর মোর মুরগীর সব মোরগ-বাচ্চা হয়? ঠিক আছে লো বেহুলা সতী, তোর মুরগী যদি আমার মোরগের কাছে আসে তো গইলে (গোয়ালে) ফেলে তোর পাছায় কল্কি পুড়িয়ে দাগ দোব। তোর সতীগিরি থাকবে, তোর মুরগীর সতীগিরি থাকবে নে কেন লো বড়লাট-ভাতারী?'

হালিমা বলে: 'তোর বেটার মাথায় হাত দিয়ে বল্। তোর মাথায় কোরান শরীফ তুলে দোব, তোকে 'মজিদে'র (মসজিদের) ভেতর ঢুকে হলপ করে বলতে হবে, তোর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের ভেতর ক'টা ঠিক খাঁটি লোককে বাপ বলে ডাকে! ক'টা 'বাওয়া' আণ্ডা! তোর পাছার বাহার, তোর চলন দেখে কোন্ জোয়ান ছোঁড়া না গাড়োলের মতন চেয়ে থাকে! তুই নামাজ পড়িস লা, তুই তিরিশটা রোজা করিস লা? তোর ভাতার মোর দেওর, তাকে দেখে মোর লজ্জা কি লা? মোর ভাতার তোর ভাশুর, তাকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিস? এ-ঘাটে থাকলে ও-ঘাটে তুই নেবে যেয়ে উদোম হয়ে গা ধুস? তোর বিপদ নেই লা—আপদ নেই লা? তরকারি চাইতে আসবি নি লা বাটি হাতে লিয়ে?'

ছোট জা লায়েলা: 'তুত্তোর মুখে 'কুট' (কুষ্ঠ) হোক।'

'তোর মুখে 'ফুল' (শ্বেতী) পড়ুক।'

'তোর বাপ মরুক।'

'তোর বেটা মরুক।'

'তোকে ওলাউঠো হোক, হাঁফ কাশি হোক, ধুকড়ে বসন্ত হোক, ফাটা বসন্ত হোক, কালবসন্ত হোক, তোর মাথায় টাক পড়ুক, তুই বাঁ পায়ের গোল্লায় যা, তোর ভাতার খালভরা রাতদুপুরে হাসপাতালে যাক—কলকাতার বিলেত পাস ডাক্তার 'এলে' দিক—তুই কলজে ফেটে মর্—তোর প্যাটে বকরি ছানা হোক, তোর মদ্দমানুষ রাঁড়ের বাড়ি যাক—'

'আল্লা হে, আল্লা, তুই সেইজন কান করে সব শুনে রাখ। বেটির লিজের গাল যেন লিজে মাথা পেতে লেয়।'

দুপুর হয়ে গেছে। হাল-লাঙল করে ক্ষেত থেকে দুজনের মদ্দমানুষ ঘরে

ফিরে আসছে জানতে পারলে তুজনেই আপাতত ক্ষ্যান্তি দেয়।

হালিমা বলে: 'রইল লো বেটাখাকী, ঝোড়া চাপা রইল, মদ্দমানুষ চলে যাক, বিকেলে আবার ঝোড়া তুলব।'

'মোরও এই ধামা চাপা রইল—আসিস বিকেলে। সাক্ষী রইলে গো পীরিনী মা। তুমি বিচার করো।'

ছোট ছোট কমবয়েসী মেয়েরা গাল দিতে হয় কেমন করে, কাঁদতে হয় কেমন করে তা শিখে নেয়। খেলাঘরে তারা তার অনুকরণও করে।

পথ দিয়ে বুকভরা দাড়িওয়ালা বুড়ো নগেন মান্না যাচ্ছিল। মোড়ল বুড়ী বললে, 'জানলি বাপ নগেন, আমাদের এপাড়ায় আবার এ বছর বসন্ত কলেরা হবে। এইরকম গালমন্দ যারা বাইরে বার করে, ভেতরটা তাদের কী! বজবজ থানার বিদিরা, রামচন্দ্রপুর গাঁয়ে ভয়ঙ্করভাবে বসন্তর মহামারি দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশজন মারা গেছে। পাশাপাশি সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারী বাবুরা এসে ভাল লোককে টিকে দিচ্ছে, সেও তিন দিন পরে খতম। সাতটা শীতলা ঠাকুর তুলে পূজো দিলে, তবু রেহাই নেই। অভিসম্পাৎ!'

নগেন মান্না বলে, 'কেন আর বলো পীরিনী মা, সব গাঁয়েই ঐ রকম। চাষী-বাসী মুসলমানপাড়া বাগদিপাড়ায় যা একটু বেশি।'

বিকালে আবার গালাগালি শুরু হল তুটি বউয়ের স্বামী তুজন মাঠের কাজে বেরিয়ে যেতে।

ঝোড়া তুলে লায়েলা বললে: 'কই লো জোড়াবেটার মাথাখাকী, আয় না আজ রাতে মোর ঘরে মোর ভাতারের বিছানায় শুবি—মোটা করে বিছানা পেতে দোব'খন।'

ধামা তুলে হালিমা বললে: 'তোর বাপ গরু চুরি করে জেল খেটেছিল, মনে নেই লা?'

'ওলো তোর ঘরে আগুন লাগুক লো, ওলো তোর ধানের কাঁড়িতে আগুন লাগুক, তোর গোলার ধান পুতি পোকা হয়ে উড়ে যাক, তোর হেলে গরু-জোড়াকে মুচিতে বিষ খাওয়াক, তোর পুকুরের পাঁচসের-দশসের-করে-রাখা রুই-কাতলা মরে ভেসে উঠুক।'

'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক, পুলুস ঢুকুক, তোর ঘরে কাবুলী ঢুকুক। তিন সন্ধ্যে না পেরুতে তোর হাতের চুড়ি ভাঙুক।'

'ওলো বেটাখাকী, বাপখাকী, ভাইখাকী, মাখাকী, ফুফুখাকী, খালুখাকী,

ভাতারখাকী, শুয়োরখাকী—'

'তুই পা-পোঁছনায় যা, ঘষ্-পাতালে যা, রসাতলে যা, জাহান্নামে যা, কব্বরে যা, কালীঘাটে যা, বাবুর বাড়ি চাকরিতে যা, তোকে ফলনা করুক, তুষকো করুক, হরে করুক, লরে করুক! পাঁচ ছাবালের মা হয়েও তুই 'টাইট বডি' পিঁদে মুয়ে সোনো পাওটার মেখে টকি 'সাইসকোপ'-এ যাস—লজ্জা করে না? তুই ছেলেদের মা—না বাজারের নটী? ওইরকম পোশাক করলে তোর ভেতরে কি আছে মানুষ কি আর টের পায় নে? দু'বস্তা ধান বেচে তুই যে 'লাইলনে'র 'ওলঙ্গ-বাহার' শাড়ি কিনেছিস, কিসের জন্যে লা? শহুরে বিবি হয়ে নগরে নাগর নাচাতে যা না!'

সন্ধ্যা পর্যন্ত গাল থামল। স্বামী দুজন মোড়ল গিন্নীর কাছ থেকে সব শুনে এসে দুজনেই বেশ করে শুনো দড়ির চাবুকের বাড়ি কষালে দুটি বউকে। জ্বলন্ত উনুন কুপিয়ে দিলে। হাঁড়ির ভাত ঢেলে দিলে গরুর গামলায়।

পরদিন সন্ধ্যায় দুটি বউ এল মোড়ল গিন্নীর কাছে বিচার চাইতে। পাড়ার সব মেয়ে-পুরুষ এসে বসল। অনেকগুলি হ্যারিকেন জ্বলছে চারদিকে। মোড়ল গিন্নীর উপরে নাকি সত্যপীরের ভর হয়। সাচ্চা বিচার করে দেয়। সত্তর বছরের বুড়ী। তীক্ষ্ণ নাক। পটল-চেরা চোখ। টুকটুকে ফরসা। গায়ের মাংস এখনো লোল হয়নি। চোখের দৃষ্টি এত ভাল যে ছুঁচে সুতো লাগাতেও পারে। বুড়ী প্রতি সন্ধ্যায় পাড়ার ছোকরা আয়নাল গাজির সুললিত সাপ-খেলানো সুরের পুঁথি পড়া শোনে। রামায়ণ মহাভারত পড়া শোনে। কাসাসল আম্বিয়া (নবীগণের জীবনী) তার সব জানা হয়ে গেছে। হজরত ইউসুফের করুণ কাহিনী শুনে তাব দু' চোখের জল ঝরে। জল ঝরে সীতার দুঃখের কাহিনীতেও।

বুড়ীর বিচার তাই ঠেলে ফেলে দেবার শক্তি নেই কারো। বিচারে বসলে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়।

দুটি বউ তার পাশে বসলে সে চোখ বুজে দুজনের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কে মিথ্যাবাদী বা দোষী এতেই সে ধরে নেয়।

মোড়ল বুড়ী ওজু করে এসে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিয়েছে। তার ছেলেরা একটু দূরে দূরে বসে আছে। বুড়ী কথা বলে:

'ছোট বৌ লায়েলা কথা বলবে—কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের?'

লায়েলা বলে, 'মুরগীর বাচ্চা লিয়ে। আমার মুরগীর সাতটা আণ্ডা বড় জায়ের মুরগীর তায়ে দিয়েছিনু মুই। আমার মুরগীর আণ্ডা সব খেয়ে খেয়ে ফুরিয়ে গেছিল। বলি সাতটা আণ্ডা লিয়ে আর তায়ে বসাব? জাকে বলতে তার তায়ে

দিতে রাজী হল। আমি আমার আণ্ডায় হাঁড়ির কালির ঢ্যারা দাগ দিয়ে এসেছিনু। যদি 'ঘোলা' পড়ে তাহলে বাদ যাবে—বাচ্চা মোর পাওনা হবে নে। তা পাঁচটা নাকি ফুটেছে। দুটো ঘোলা পড়েছে। আমাকে বাচ্চা দেবার সময় দেখি সব মোরগছানা দিয়েছে। জা বলে, তোর সব মোরগছানা হয়েছে। আর ওর দশটা আণ্ডার নাকি সব ক'টাই মুরগীছানা হয়েছে। এই কথা কাটাকাটি লিয়ে শেষ অবদি ঝগড়া

'হালিমা বল'এবার।'

হালিমা বলে, 'ওর সাতটা আণ্ডার যে পাঁচটার বাচ্চা ফুটেছিল, সব ক'টা ৻৲গছানা আমি দেখেছেনু পরখ করে করে। তাই দিইচি।'

জেরা: 'যখন ডিম ফোটে তুমি কি রাত জেগে বসে থেকে থেকে দেখেছিলে?'

'সকালে দেখেছেনু খোলার ভেতর থেকে নড়েচড়ে বেরুচ্ছে।'

'একদিনের বাচ্চাকে কি চেনা যায়?'

'মাসখানেক বাদে দিয়েছেনু, একটু টন্‌কো হতে।'

'যখন ধাড়ির সঙ্গে ঘুরে বেড়াত সব চিনে রেখেছিলে?'

'হাঁ, তিনটে লাল, দুটো সাদা।'

'তোমার?'

'সব কালো।'

'ধাড়ির রঙ?'

'কালো।'

'মোরগের রঙ?'

'লাল।'

'লায়লার মোরগ-মুরগী কি রঙের?'

'মুরগী কালো, মোরগ সাদা।'

'ডিমের খোসাগুলো আছে?'

'হাঁ। ঝাঁটাকাঠি দিয়ে গেঁথে রেখেছি। চালের বাতায় খোসা আছে। আন তো মা এলাচি।'

ডিমের খোসাগুলো আনা হলে বুড়ী আলোর সামনে সেগুলো পরখ করে করে দেখলে। ভাঙা আধাআধি খোসা। কালি লাগানো পাঁচটা ডিম। ঘোলা-পড়া বাকি দুটোর খোসাও নাকি আছে লায়লার বাড়িতে। মুখ ফুটিয়ে ভেতরের

পচানি বার করে ফেলে দিয়ে রেখেছিল। তার বড় মেয়ে ফুলজান ডিমের খোসায় নানা রঙ দিয়ে 'সিকা' টাঙায় বলে খোসা জমিয়ে রাখে। সে দুটোও আনা হল।

সব দেখে বুড়ী বললে, 'লায়েলার কালি মারা এই সাতটা ডিমের খোল এক জাতের—এক মুরগীর নয়। কেননা এক মুরগীর আণ্ডার আকার এক রকমেরই হবার কথা। এই ঘোলা-পড়া দুটো এক জাতের। যার সঙ্গে মিল হালিমার আণ্ডার। তলার দিকে বেশি ভারী মোটা, মাথার দিকে সরু ছুঁচলো। যেমন বড়লোকদের মুখের ডৌল হয়। কপালের দিকটা ছোট—গালের দিকটা ভারী। আর গরিব লোকের মুখের ডৌল তেকোনানে। কপালের উপর দু'-কোণের দিক, নিচে এক কোণ। তা লায়েলার আণ্ডা সেই রকম অবশ্য উল্টে নিলে। যাই হোক, পচা ঘোলা-পড়া দুটো বড় জা হালিমার—অন্য দুটোর কালি তুলে দিয়ে নিজের যে দুটোয় বাচ্চা হয় নি তাতে কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ডিমগুলো থেকে মুরগীছানা হয়েছে—যার মুখ অল্প জায়গা নিয়ে কেটেছে। তাহলে দশটা বাচ্চা, মুরগী। পাঁচটা মোরগ। না না—ভুল হচ্ছে, সাতটা মোরগ। এখনো দুটো মোরগছানা হালিমার বাচ্চার মধ্যে আছে যাদের ও বেটি চিনতে পারে নি। আর একটু বড় হলে ধরা পড়বে। এখন বিচার হল সাতটা বাচ্চা দিতে হবে ছোট বউকে। বড় বউ পাবে সাতটা। একটা থাকবে মসজিদের জন্যে মানসিক। সেই মোরগ বড় হলে জবাই করে বড় বউয়ের অন্যায়ের জন্যে গরিব-ভিখারীদের হাজুত-ভাত খাওয়াতে হবে। যাও, সব মুরগী-বাচ্চা নিয়ে এস।'

মুরগীবাচ্চা আনলে দুটি বউ কোঁচড়ের মধ্যে করে। দুটি চুবড়ীর মধ্যে তাদের ধরা হলে মোড়ল বুড়ী—ইনসান মোড়লের স্ত্রী—খালেদা বিবি পরখ করে দেখে দেখে হালিমার মুরগীর বাচ্চার মধ্যে থেকে ঠোঁটের উপর ফুলমতো যে দুটোর সে দুটো নিয়ে হাতের তালুতে বসিয়ে সবাইকে দেখালে। বললে, 'এই দুটো মোরগ। লায়েলা পাবে চারটে মুরগী, তিনটে মোরগ। হালিমা পাবে তিনটে মোরগ আর চারটে মুরগী। একটা মানসিকের মোরগ—পালবে বড় বউ—হাজুতের চালও তাকে দিতে হবে। এখন বড় বউ বল, তুমি কারসাজি করেছিলে কিনা? তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে হবে।'

বড় বউ অপরাধ স্বীকার করলে।

জায়ে জায়ে মিল করে দিলে মোড়ল বুড়ী। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলে ওজু করে এসে বুড়ী ইশার নামাজ পড়তে বসল। ঘণ্টা-দুই পরে তাকে খাবার জন্যে

বড় ছেলে খালেক ডাকতে এসে দেখলে মা আলো নিভিয়ে দিয়ে পড়ে মৃগী রোগীর মতন অজ্ঞান হয়ে কেবলই শরীর ঝাঁকাচ্ছে। এই অবস্থাকে সকলে বলে পীরিনী বুড়ীর ভর হয়েছে। বাবা সত্যপীর ভর করেছে। এরকম অবস্থা হয় প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে। কোনো সপ্তাহে দুবারও হয় নাকি। খুব উত্তেজিত হলেও হয়। মোড়ল বুড়ীকে তার বড় ছেলে পাঁজাকোলা করে ধরে থাকে। বউরা আলো, জল নিয়ে আসে। দাঁত-কপাটি ছাড়িয়ে দেয় কানে-নাকে পালকের সুড়সুড়ি দিয়ে। তারপর যথারীতি প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বকতে থাকে পীরিনী বুড়ী :

মানুষের ভিতরে আছে কঙ্কাল
হাড়ের খিলেন।
বুকের মধ্যে আছে প্রাণ
পদ্মপাতার পানি।
চোখের মধ্যে মণি, ডিমের মধ্যে কুসুম,
ফুলে থাকে মধু আর গন্ধ,
পাথর ফেটে চৌচির হয়ে ঝরণা নাবে
আকাশ ফেটে নাবে বাজ
তবু আমাকে অন্ধকারে খুঁজে বেড়াও
নিজের পায়েই নিজে গড় করো!
মানুষ বেইমান
আলো, সত্য, সুন্দরকে ভুলে
ভালবাসছে কালোকে—
সে আহাম্মুক
সে জানে না তার রঙ নিয়ে খেলা
শুধু ছেলেখেলা।
কিন্তু ক্ষেতখামার পড়ে রইল
আবাদ করবে কে?
আকাশে লাঙল জুড়েছ
মাথার ঘি বিক্রি করে গাঁজা খাচ্ছ?
স্মরণ রেখো আসছে কিয়ামত
পাহাড় পর্বত উড়বে তুলোর মতন
সাগর উথলে উঠবে।

তোমার ইতিহাস তোমাকে পড়তে দেওয়া হবে।
চোখের পানিতে তখন দেখবে সব কালো।
নিজেকে পণ্ডিত ভাবতে
নিজেকে জ্ঞানী ভাবতে
ভাবতে তুমি পীর
চালাতে নিজেকে নেতা বলে
ছিলে বাদশা
ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াত তোমাব বাপ
বাপের হাড়ের মজ্জা
বাপেব রক্তের বীর্য
মায়ের গর্ভ খনিতে
কে তোমাকে হাড়ে চামড়ায় জড়ালে ?
বাইরের পোশাক তো তোমাব কাপড়
দুনিয়াতেই তা পড়ে থাকবে।
তুমি ছিলে কুত্তা
পথের সব খাবাব কুড়িয়ে খেতে
তুমি চলেছ পথে
তোমার কঙ্কালটা চলেছে সঙ্গে
সেটা তোমাব নয়
বাপের
আদমের
আল্লার।
আল্লা হল মনুষ্যত্ব
তাকে বাদ দিচ্ছ কিসের বদলে
দুধের বদলে তাড়ি ?
তবে তোমরা মরো—
তোমরা নষ্ট জিনিস
আঁধার আনব আবার
তারপর আলো।…

এই রকম লাচাড়ি চলে হাজার লাইন। গ্রামের লোক কেউ তার অর্থ বোঝে

না। এসব নাকি ভর-কথন। সিদ্ধ-বাক্য। বুড়ীর জ্ঞান হলে নাকি কিছুই মনে থাকে না। তাকে পীরিনী বললে নাকি পায়ের খড়ম তুলে দেখায়। মহাভারত পড়াশোনার সময় ঢুলতে থাকে। খুশী হলে হাততালি দেয়। রাগ হলে থু-থু করে।

পীরিনী বুড়ীর ভর হয়, ভর হলে কি সব বলে শোনার আগ্রহে একদিন যেতেই বুড়ী আদর করে কাছে বসালে। বুড়ী আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া হয়। চাচাত মামার দিদিশাশুড়ী। বুড়ী তার ছেলেদের ডাকাডাকি আরম্ভ করলেঃ 'ওরে খালেক, মালেক—তোরা এসে দেখ কে এসেছে! ডাব পেড়ে দে। মাছ ধর।'

একটা গোলাপ ফুল হাতে ছিল, তার হাতে দিতে বুড়ী সেটা শুঁকে আবার আমার হাতে ফেরত দিলে।

বললাম, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আমাকে 'তুমি' বল। আমি মা।'

'পীরিনী মা বলব?'

'না, শুধু মা।'

'মা!'

'বল্ বেটা।'

'আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?'

'তুই হলি গোবর গাদার পদ্মফুল! বন-ময়ুরের পেখম! দেখি তোর ডান হাত দে।'

পীরিনী মা আমার হাতটা তার মুখের ওপর চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করে রইল। পরে বললে, 'তোকে এখন সব কথা বলা ঠিক নয়। সামলাতে পারবি না।'

'ঠিক পারব। আমাকে রাজা-বাদশা করে দিলেও ঠিক চালিয়ে যাব। শুনি না একটু।'

মা হাসল। বললে গোপনে, কানে কানে।

আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

ভয় পেলাম।

আমার শরীর যেন কাঁপতে লাগল। চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু গড়াতে লাগল। মা পটল-চেরা চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, 'আজ আমার ভর হবে, বাঁ চোখ আর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল নাচছে। যখন ভর

হবে আর আমার মুখ থেকে কথা বেরুবে, তুই লিখিস তো—জ্ঞান হলে শুনব।'

সেদিন সত্যই ভর হল রাত ন'টার পর। আশ্চর্য সেসব বাণী! কোথা থেকে আসছে—কেমন করে আসছে? কেন আসছে? কাদের জন্যেই বা আসছে? সবটা লেখা অসম্ভব।

পরদিন সকালে লেখাটা ফ্রেশ করে তার সামনে ধরতে চেয়ে রইল। বললে, 'পড়।'

বললাম, 'না।'

'কেন?'

'আমার বাঁচবার উপায় বল।'

মা হাসলে। বললে, 'শিবের মতন পাথর হবি। রাগকে মেরে ফেলবি। দুনিয়ার সব লোক তোর আপন দেহ, মুচি মেথর পণ্ডিত জ্ঞানী সবাই যেন তুই নিজে এমনি ভাববি। কাউকে ঘেন্না করবি না। কাউকে আঘাত দিবি না। তওবা কর। আল্লা নেই একথা ভাবিস না। আল্লা হল মনুষ্যত্ব। সে তোকে আড়াল থেকে সাহায্য করছে। সে যাকে রক্ষা করে কেউ তাকে মারতে পারে না। হজরত ইউসুফকে তার অত্যাচারী ভাইরা মেরে পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে। তাকে তুলে নিয়ে গেল মনিরু সওদাগর, বেচে দিলে মিশরের রাজার কাছে। রাণী তাকে ভালবাসতে চাইলে, নোংরাভাবে। ক্ষেপে গিয়ে উল্টে বদনাম দিলে। তার জেল হল। সেখানে তার অন্তরে এল আল্লার দূত জিব্রিলের ভর। সে স্বপ্নের মানে বলে দিলে। পরে সাধক ইউসুফ হল দেশের উজীর। তারপর রাজা। দুর্ভিক্ষের সময় তার ভাইরা এলে সে চিনল। তাদের একজনকে চোর দায়ে ফেলে আটকে রেখে বিচারের সময় পরিচয় দিলে। তোমরা কি মনে কর ইউসুফ মরে গেছে? তারা বললে, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বললে, আল্লা যাকে বাঁচায় সে মরে না। তার রাজপোশাক খুলে দিতে পুত্রশোকে অন্ধ বাবার কাছে তা আনলে। সেই পোশাক আনতেই বাবা বলে উঠল, আমার ইউসুফের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি কোথা থেকে!'

পীরিনী মা বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে ফেললে। বললে, 'তোর অন্ধ বাপ মারা গেছে, সে এখন জগতের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে—তাদের পথে অনেক কাঁটা—রক্ত ঝরছে। দুর্ভিক্ষ বেধেছে। তোর কাছে সবাই আসবে—তাদের ফিরিয়ে দিস না। তাদের পেছনেই বাপ আছে অন্ধ হয়ে বসে—আশীর্বাদের ডালা হাতে নিয়ে।'

মাকে তার বাণী পড়ে শোনালাম। মা অবিশ্বাস করে আমার গালে আলতো-ভাবে আদর করে একটা চড় মারলে। বললে, 'এসব কি আমি বলতে পারি! তুই বানিয়ে বানিয়ে লিখিচিস।'

বললাম, 'আল্লার কিরে মা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, না।'

মা তখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। আমি বিদায় নিলাম।

পথে আসতে আসতে মনে মনে হাসতে লাগলাম।

পীরিনী, না ঘোড়ার ডিম!

মা—শুধু মা! মায়ের বুকের ভেতরের একটা চিত্র শুধু মূর্তি ধরে বাইরে প্রকাশ পেয়েছে।

আটকুঁড়ির বেটি মরলেই তার কবরের পাশে লোকে মালসা, সরা উপুড় করে দেবে। মাটির ঘোড়া বসিয়ে দেবে সারি সারি।

কিন্তু তার পটল-চেরা চোখ দুটো যে বাঘের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে না? কি সর্বনাশ!

সুরমী বিবি যেরকম

'বুবু'র বাড়ি 'বুল্‌তে' এসেছিল সুরমী বিবি! বুবু কুলসমের একটা মেয়ে হবার পরে 'সোঁত' রোগে 'বিছেন'-ধরা 'আবস্থা' হলে সুরমী—ছোট বোন• এল অচল সংসার সামলাতে। তার ডালিম-ভরা বুকে বোনাইয়ের পাপ-চোখ যেন বিঁধে গেল। 'শতেক কথায় সতী ভোলে!' সুরমীর আর দোষ কি! বোনাই জামির মল্লিক 'হাসখোল' মানুষ। সদাই হাসি-ইয়ারকি। সদাই তার পিছনে ভ্যানভ্যান করে। থালা-বাটি মাজতে গেলে ঘাটে গিয়ে হাজির। গোয়ালে গোবর তুলতে গেলে, গরুকে খড়-খোল-ভুষি দিতে গেলে সেখানে হাজির, তালগাছ কাটতে গেলে ভাঁড় নিয়ে চল সঙ্গে, মাঠে গরু বাঁধতে গেলে কুয়াশার মধ্যে সেখানেও তাকে ধরবে আর রাত্রে দিদির পাশে ঘুমোলে মিনসেটা উঠে এসে চুপিচুপি হাতে-গায়ে-পায়ে হাত দিয়ে দিয়ে যেন জলের মধ্যে আন্দাজে 'নয়না' মাছ খুঁজে বেড়াবে।

একটা ভয়ানক আতঙ্কে যেন সারারাত চোখে-পাতায় করতে পারে না সুরমী। অন্ধকার ঘর। তক্তাপোশটা মচ্‌মচ্‌ করে। ভগ্নীপতি বোধহয় নামল। মেঝেয়

তাদের বিছানা। মট্ করে হাঁটুর শব্দ হল। বসল বোধহয় মশারীর পাশে। তারপর পায়ে হাত পড়ল। হাতটা কাঁপছে।

সুরমী পা ছোঁড়ে। ডাকে যেন ঘুমভাঙা জড়ানো গলায়ঃ 'বুবু! ও বুবু!··· কি মরণের নিদ বাবা!'

আবার চুপচাপ।

মোটা দুর্গন্ধ কেরোসিনের কুপীটা জ্বালাঃ জামির মল্লিক। বিড়ি ধরায়। ছারপোকা মারে। সুরমী বলে, 'মিনসে যেন ঢং!'

'আরে ধের শ্রালী, ছারপোকাতে খেয়ে ফেলছে তোদের!'

'তাই মোর পায়ে হাত দিচ্ছিলে?'

'চুপ শালী!'

'বুবুকে বলে দোব। ওরকম জ্বালাতন করলে কাল আমি চলে যাব।'

জামির বলে, 'তোমার পরাণে দয়া নেই!'

আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গিয়ে অন্ধকারে তারা-জ্বলজ্বল-করা আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে জামির। ধানের গোলার পাশে ইঁদুর-ছুঁচো দৌড়োয়। সুরমীও ঘুমোতে পারে না বোধহয়। গরমে ঘাম হচ্ছে। বাইরে এসে গায়ের আঁচল খুলে হাওয়া দেয় তালপাতার পাখা দুলিয়ে। তারপর একটা ঝ্যাৎলা পেতে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে বোধহয়। নাকি ভান!

জামির এসে বসে তার পাশে। গায়ে হাত দেয়। কোনো সাড়া করে না সুরমী। কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের যেরকম আচরণে জাগা উচিত তার বোধহয় সীমা পার হয়ে যায়। তাই সাড়া দিতে বাধ্য হয় সে। ধড়ফড় করে উঠে বসে। জামিরের হাত চেপে ধরে চোর ধরার মতন করে, 'কে তুই র‍্যা?'

'চুপ চুপ! মুই তোর বোনাই।'

'ডাকব বুবুকে?'

'তোমার পায়ে ধরি।'

সুরমী আর যেন পারে না। লোকটার কাকুতি-মিনতি দেখে ভেঙে পড়ে। যেন একটা ঢেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বানের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আর সে যুঝতে পারবে না। ডুবে যাবে। তলিয়ে যাবে।···দিদি দুঃখ পাবে।···

তবু সেখানেই আবার শুয়ে পড়ে সুরমী। কাঁদতে থাকে ফোঁস ফোঁস করে বালিশে মুখ চেপে। জামির অনুনয় করে মাথায় মুখে হাত বুলোতে বুলোতে

বলে, 'তুমি কেঁদো না সুরমী, ধান বেচে, খড় বেচে তোমাকে সোনার হার গড়িয়ে দোব। পাছাপেড়ে শাড়ি কিনে দোব। রূপোর মল, তাবিজ, গোট গড়িয়ে দোব।'

সুরমী বলে, 'তোমার বউকে দাও। তাকে কি ভাল লাগে না? একই তো জিনিস। এক তরকারী, দুটো বাটিতে করে দিলে কি দু'রকম স্বাদ লাগে?'

জামির বলে, 'ও বুড়ী হয়ে গেছে। রোগী। তুমি থাকো। তোমাকে বিয়ে করব।'

'বুনে বুনে সতীন হয় বুঝিন? বউ মরে গেলে তার বুনকে বে' করতে আছে। শালীকে নষ্ট করলে বউ তালাক হয়ে যায় জানো?'

'হয় হবে। তোমাকে আমার চাই-ই। কুলসম মরুক।'

'লোকে কি বলবে?'

'বলুক। সংসার ছারেখারে যাক। তোমার রূপ, তোমার 'যৈবন' আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তোমাকে চাই-ই।'

সুরমী বোধহয় ভয় পেলে। উঠে দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দিদিকে জাগালে। জল খাওয়ালে। বাচ্চার কাঁথা পালটে দিলে।

কুলসম আর ঘুমোবে না। তাই সুরমী সুযোগ বুঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

সকালে জামিরের মেজাজ কড়ুয়া হয়ে গেল। খালি-খামকা হেলে গরুটাকে পিটতে লাগল। সুরমী ঝাঁটপাট সেরে ভগ্নীপতিকে জামবাটি ভরে পান্তা খেতে দিলে, কিন্তু সে এল না। কুলসম বাইরে থেকে আসার সময় সামনে পড়তে জামির বললে: 'মরিসনি? ওলাউঠো ধরেছে, কবে লিয়ে যাবে তোকে?'

কুলসম বলে, 'আমি মরলেই তো তোমার হাড়ে বাতাস লাগে। 'জু-জাহান' ঠাণ্ডা হয়। আল্লারও কি চোখ আছে, সে যে অন্ধ! মরণ কি মোর দেবে?'

সুরমী হঠাৎ একটু খেলাতে চাইলে ভগ্নীপতিকে। দিদিকে শুনিয়ে বললে, 'বুবু মুই ঘর যাই। তোদের সংসার তোরা ছাখ।' সে কাপড় পরতে গেল।

কিন্তু জামির কিছু বললে না। খড় এনে পাকিয়ে কলাই-রাখা 'পুঁড়ো' বানাবার জন্যে বিড়িয়ে বিমুনীর মতন ছোটা তৈরি করতে লাগল উঠোনে বসে বসে।

কুলসম কোনো কথা বললে না। শুয়ে পড়ল গিয়ে। বাচ্চাটা ককিয়ে চলেছে।

সুরমী শাড়ি পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল খিড়কি দিয়ে।

জামির চেয়ে দেখলে শুধু একবার।

তারপর সামনের মাঠের মাঝখানে যখন চলে গেছে সে, জামির দৌড়ল। ধরলে তাকে এসে।

'এই শালী, চলে যাচ্ছিস, রাঁধবে কে? তোর বুনকে দেখবে কে?'

'কেন, আমি কি তোমাদের দাসী? লোক রাখতে পার না? ছাড়ো, হাত ছাড়ো।'

'আয়, চলে আয়।' হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে যেন দৌড়োয় জামির। দেড়মুণ ধানের বস্তা একাই যে মদ্দমানুষ মাথায় তুলে নিতে পারে তার হাত ছাড়ানো শক্ত! মাঠে মেয়েরা বিঁ কলাই তুলছিল, হিন্দু মেয়েরা হাসতে লাগল দৃশ্য দেখে। কিন্তু একটি মুসলমান বুড়ী বললে, 'সোমত্ত শালীর সঙ্গে মুসলমান-ঘরে অবাধ মেলামেশা-ঢলাঢলি করা নিষেধ। ছাখ—মজা ছাখ!'

জামির তাদের শুনিয়ে হেঁকে হেঁকে বলে, 'বউ পালাচ্ছিল গো মা-মাসিরা। ধরে আনছি। যাবে কোথা শালী, পুলুস তুলে ধরে আনব।'

সুরমী হাসে, কাঁদে, গাল দেয়। কিন্তু ছুটতেও হয় ভগ্নীপতির সঙ্গে। গোঁয়ার ষাঁড়ের মতন সে টেনে নিয়ে চলেছে। শেষে কামড়ে দেয় তার হাতে। রক্ত বার করে দেয়। সুরমী ক্ষেপে গেছে। কেননা হাল-বাড়ির ঢেলামাটিতে তার পায়ে চোট লেগে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও হাত ছাড়ে না জামির। হাত বদলে নেয়। অন্য হাতটা মাথায় ঘষতে থাকে। ফুঁ দিতে থাকে দাঁতে-কাটা জায়গাটাতে।

নিজের বাগানের উপর টেনে তুলে আনলে হঠাৎ সুরমী বলে, 'এই মিনসে ছাড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, এই আমি ন্যাংটো হয়ে গেছি···দোহাই আল্লার··· তুমি যা চাও দোব···ছাড়ো···'

ছেড়ে দিতে কাপড় পরে নিলে সুরমী। কিন্তু হঠাৎ আবার পালাতে গেলে তাকে দৌড়ে ধরে এনে শূন্যে চাগিয়ে তুলে ধরে একেবারে বাড়ির মধ্যে আনলে।

কুলসম ঝেড়েমেড়ে উঠে বসল ঘরের মধ্যে। দৃশ্যটা দেখে কপালে হাত চাপড়ে আবার শুয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ডুকরে ডুকরে। বাচ্চাটা ককাচ্ছে দেখে একবার ভাবলে, ওর গলাটা টিপে দেবে কিনা। বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে এসে দোলায় বসে থামায় তাকে সুরমী। দিদি কাঁদছে কেন? সে চলে যাচ্ছিল বলে? তাই ভাবে অবশ্য সুরমী।

সেই রাত্রেই সুরমী আর বাধা দিলে না জামিরকে। ভয়ানক এক আনন্দের বন্যায় যেন সে ভেসে গেল। বাঘিনী যেন মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে পাগল হয়ে গেল।

সে আর ঘরে ফিরে যাবার নামও করে না। প্রকাশ্যেই দিদিকে একদিন

বললে, 'তোর মন্দ-মানুষ আমাকে নষ্ট করেছে।'

'চুপ, কাউকে বলিসনি। ঘরে চলে যা। আমি তো এবার একটু সেরে উঠেছি—যেমন করে হোক কাজ-কাম করব। হালীর মাকে বলিচি, কাজ করে দিয়ে যাবে।'

কিন্তু সুরমীর চোখে কেমন যেন এক চাতুরী-ভরা হাসি। সে আর যেতে চায় না। দিদির বুকের ওপরে যেন চেপে বসেছে সে। ভগ্নীপতির সঙ্গে তার প্রণয় আর লুকোনো রইল না পাড়ার কারো চোখে।

এক রাত্রে ওদের ধরলে কুলসম। বোনকে ঝাঁটার বাড়ি ঘা-দুই দিলে। 'বেরো, দূর হ, হারামী।'

জামির কুলসমের টুঁটি টিপে ধরে জিব বার করে ফেললে, বললে, 'তুই দূর হয়ে যা মাগী। তোকে তালাক দিচ্ছি।'

সকালে মেয়েকে কোলে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল কুলসম। মা শুনে ছুটে এল। সুরমীর চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেললে, 'হারামী তোর এই ব্যাভার!'

জামির বললে, 'ওর দোষ নেই মা, আমি ওকে নষ্ট করেছি। ওকে নিয়ে আমি ঘর করব। তোমার বড় মেয়ের তালাক হয়ে গেছে।'

শাশুড়ী বলে, 'তুমি একটা মানুষের বাচ্চা, তাই তোমার মুখে ও-কথা বেরুতে লজ্জা হল না।'

কিন্তু সুরমীর হাত ধরে টানাটানি করলেও সে আদৌ ভগ্নীপতির ঘর ছেড়ে এখন আর যেতে রাজী নয়। অগত্যা তার পিঠে লাথি মেরে জামিরের শাশুড়ী পাড়ার মোল্লা, রেইস, কোলেমান সবাইকে ডাকতে গেল বিচারের জন্যে।

সন্ধ্যার সময় বিচার বসল।

মোল্লা শুধোলেন, 'জামির, তুমি কি তোমার শাশুড়ীর কাছে বলেছ যে তোমার বউকে তুমি তালাক দিয়ে শালীকে নিয়ে ঘর করবে?'

'হাঁ, মোল্লাজী।'

'সুরমী বিবি কি রাজী?'

সুরমী বলে, 'বুবুকে তালাক না দিলেও সে তালাক হয়ে গেছে এমন কাজ আমার সঙ্গে আমার ভগ্নীপতি করে ফেলেছে।'

'রেইস' মানে প্রধান বলে উঠল, 'দুজনের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে কলকাতা শহরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ওসব কাজ করলে

কেউ কিছু বলবে না।'

'জানো জামির, এর কি দণ্ড ?'

'হুজুর যা বলো !' হাত কচলাতে লাগল জামির মল্লিক। চ্যাপটা মুখে কুতকুতে চোখ দুটো তার পিটপিট করতে লাগল। ভাবটা যেন সুরমীর 'যৈবনে'র খেলার বিনিময়ে সে যে কোনো শক্ত সাজা নিতেও এখন প্রস্তুত।

'কুলসমের দেন মোহরের টাকা দিতে হবে, আর একশো টাকা জরিমানা, অথবা শালীর সঙ্গে তোমার সাদী পড়াবার দিনেই গ্রামের সমস্ত লোককে খানা খাওয়াতে হবে।'

রায় হেঁকে দিলেন সাদা দাড়িঅলা বৃদ্ধ মোল্লা সাহেব।

জামির রাজী।

সবাই অবাক। একজন বললে, 'যার সাথে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম ? এখন কি আর পাতলা রস আছে, জমে মিছরির কুঁদো হয়ে গেছে।' শুধু শাশুড়ী কপালে করাঘাত হেনে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একশো পঁচিশ টাকা দেন মোহর বাবদ নগদ বার করে এনে দিলে জামির মোল্লার পায়ের কাছে।

প্রকাশ্যে বড় বিবিকে তিন তালাক দেওয়ানো হল। সবাই চলে যাবে কিন্তু হঠাৎ পাশের বাডির বাবুজান দর্জি বুড়ো লোকটা বলে ফেললে, 'মোল্লা সাহেব যাবেন না, ওরা যে ক' রাত একসঙ্গে থাকবে তাতে পাপ বাড়বে, গ্রামে কলেরা হবে, তার চাইতে আজই—এখনি সাদী পডিয়ে দিয়ে যান। জামির ইচ্ছে করলে কালই সবাইকে খানা খাওয়াতে পারে।'

প্রস্তাবটা সবাই মেনে নিলে। সুরমীর সঙ্গে সাদী পড়ানো হয়ে গেল জামির মল্লিকের।

জামির অন্ধকারে একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে বাবুজান দর্জির দাড়িভরা মুখে চুমো খেয়ে বললে, 'চাচা, তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইনু মুই। আমার বাপের মতন কাজ করেছ তুমি।'

বাবুজান দর্জি বললে, 'তুই শালার বেটা এমন কাজ করলি, এখন কি করি বল্!'

পরদিনই গরু জবাই করে, খাসী মুরগী কেটে, মণখানেক চালের ভাত রেঁধে, ডাল, মাছের মাথা দিয়ে আলু ঘণ্ট, মাছভাজা তিন রকম, মাংস রান্না করে জামির মল্লিক খাইয়ে দিলে পাড়ার সমস্ত লোকজনকে।

শালী বউ হয়ে গেল, বউ পর হয়ে গেল তার কোলের দুধের বাচ্চাটা নিয়ে।

ভানা-কোটা করে খেতে খেতে মা'টাও একদিন মারা গেল। কিন্তু কুলসম

আর নিকে সেঁধল না। পুরুষমানুষের ওপরে তার ঘৃণা ধরে গেছে। বাটা-নগরের পাশে মুঙ্গির বিখ্যাত ধনী এবং পরহেজগার মানুষ তারিক মোল্লা সাহেবের বাড়িতে সে দাসীর কাজ করতে চলে গেল। চোখের জল মুছতে মুছতে সে ধানসিদ্ধ করতে, কাপড় কাচতে, রান্না করতে লাগল।

বছর পার হয়ে চলল হু-হু করে।

কুলসমের মাথার চুল পাকলো। তার মেয়ে হল যুবতী। মেয়েটা মাঝে মাঝে আসত জাঁমির মল্লিকের কাছে। কুলসম এলেও জামিরের বাড়ির সদরে মাথা গলাত না। দর্জিদের বাড়ি থাকত। বোনে বোনে দেখা নেই।

সুরমী ডেকে পাঠালে কুলসম বলে, 'ছেনালের মুখে মারি ঝাঁটা!'

সুরমীর কোলে তখন দুটো মেয়ে।

বড় মেয়ের সাদীর জন্যে টাকার দাবি করতে এসেছিল কুলসম। বাবুজান দর্জি অনেক বোঝাতে, মোল্লার নির্দেশে জামির টাকা দিলে। বড় মেয়ের সাদী হয়ে গেল মুঙ্গিতেই। তারিক সাহেবরাও সাহায্য করলেন।

সুরমীর কিন্তু মেজাজটা তিরিক্ষি হতে থাকল দিন দিন। জামিরকে সে তোয়াক্কাই করে না। বলে, 'বাঁশ-কাঠ বেচা টাকা, তালপাতা, গুড়, কলাই বেচা টাকা, আমড়া, শাঁকালু, কলা, আতা, পেঁপে বেচা টাকা, ঘুঁটে কঞ্চি বেচা টাকা, আমার সুদের টাকা—বার করো সব মিনসে। না হলে তোমাকে বঁটি দিয়ে 'কুইচে' ফেলব। বড় মেয়ের বিয়েতে ক'শো টাকা দিয়েছ? কার টাকা? আমি মেয়েমানুষ হয়ে কোথা জন ডেকে এনে ধান রুয়ি—হাল করাই, নিজে ডাঙা কোপাই কাছা সেঁটে, চোর পড়বার ভয়ে 'বালাম' ছোরা লিয়ে রাত জাগি—ভুঁড়ো মিনসে শুধু তাড়ি গিলে ঢোল হয়ে পড়ে থাকবে। জমিদারের প্যায়দা এসে খাজনার জন্যে বাকুলে ঢুকে 'সুরমী বিবি—সুরমী বিবি' বলে তম্বি—গুহোর বেটাকে কাটারি লিয়ে তাড়া করতে মারলে ভোঁ দৌড়! সুরমী বিবি বড্ড জালিয়াদ! খালি তার টাকাটাই মিষ্টি!'

জামির বলে, 'মাগী তোর বড্ড ফড়ফড়ানি। সুনো দড়ির চাবুকের বাড়ি মেরে তোর 'কাবলা' ফাটালে তবে রাগ যায়। বড় মেয়েটা কি বাওয়া আণ্ডা? আমার মেয়ে লয়? রামনগরে মেয়েমানুষের 'ভাইয়ে' নাচ দেখতে যেতে তুই ছেনাল ঘরে সিঁদ কাটবার নাম করে মোর যত টাকাকড়ি ছিল বার করে লুকুলি। জানি নি মুই?'

সুরমী হঠাৎ জামিরের সামনে হাঁটুর ওপরে কাপড় চাগিয়ে তুলে ধরে নাচতে

থাকে ঘুরপাক মেরে। বলে, 'মরি মরি! কি আবদারের কথা! মুই নাকি মন্দ-মানুষের টাকা চুরি করিচি! তোমাকেও তো চুরি করিচি। কি আদরের কথা! বড় মেয়েটা ওর! আমারগুনো বানে ভাসা। তবে বড় গিন্নীকে ফের পায়ে ধরে আনো না।'

জামির বলে, 'তার পায়ে আছে তোর কপালেও নেই। বুন হয়ে বুনের সংসার যে ভাঙে তার ইহকালেও সুখ নেই—পরকালেও সুখ নেই। তোব টাকা কোথা থেকে এল শুনি? বাপের বাড়ি থেকে এনেছিস? কুলসম তো কক্ষনো একটা পয়সা 'লিতুনি'। আর তুই সব টাকা দখল করেছিস।'

'আরে বুড়ো 'ঢোস্‌কা' তুমি তো কবে এবার পটল তুলবে, তখন কি আমি আর একটা 'লিকে' সেঁধব? গতরে রেখেছ কিচ্ছু?' নিজের শরীরটা দেখায় সুরমী।

সুরমীর পেটের দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে অল্পদিন পরেই জামির পেটের যন্ত্রণায় আছাড়-কাছাড় করে 'বিনি তিকিজ্জেয়' মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলতে সুরমী বললে, 'টাকা কোথা? মিনসে কি আমাকে টাকা দিত?'

ছোট জামাইটা বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে রইল। ক্ষেতেখামারে কাজ করতে লাগল। সে তালগাছ খেজুরগাছ কেটে রস নামায়, গুড় জ্বাল দেয়, ডাঙা কোপায়, বনজঙ্গল কাটে আর মেয়ের পেটে প্রতি বছরে একটা করে বাচ্চা পয়দা করিয়ে যখন কুঁড়ে গরুর মতন 'আলা' মেরে গেল তাকে সুরমী ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে।

মেয়ে ঝগড়া করলে তাকে আলাদা করে দিলে। জন খাটতে বেরুল সে।

সুরমী একাই আলাদা খায়। একটা হাফপ্যাণ্ট (বোধহয় তার ছোট জামাইয়ের) পরে এলো গায়ে হুমহুম করে নিজের ডাঙার মধ্যে কোদাল পাড়ে, জল বয়, গাছ লাগায়, পাট কাটে। পাড়ার লোকজন আসে জ্বালানী কাঠ-পাতা কিনতে। একমুঠো নারকেল পাতা চার পয়সা দাম, একঝোড়া ঘুঁটে চার আনা, গেছো পান একগোছ চার আনা। কাঁচা বুনো আমড়া, মোচা, সবেদা, আম, কলা, বাতাবীলেবু, কাঁঠাল, তাল, নারকেল, নোনা, আতা, খামালু—যখনকার যা সব মাথায় করে বয়ে নিয়ে বিক্রি করতে হাটে যায় সুরমী। রাত্রে মেয়ের খোকাটাকে কাছে নিয়ে শোয়। প্রায় কুড়িটা কাঁথা পেতে রেখেছে তক্তাপোশের ওপরে। তার ভাঁজে ভাঁজে টাকা আছে। টাকা আছে তক্তাপোশের বাক্সর মধ্যে। ঘরে সিঁদ কাটার ভয়ে কাঁটা-পালা ঘিরে দিয়েছে বনেদের পিছনে।

ছোট মেয়ে হাসেন বান্নুর দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কুলসম শেষ জীবনটা জামাইবাড়ি থেকে সুখেই মারা গেল। মেজ মেয়ের বর বাটানগরের কারখানার শ্রমিক। ভাল সপ্তা পায়। সে এলে সুরমী বিবি মুরগি জবাই করে খাওয়ায়। হাসেন বান্নুর দুটি মেয়ের বিয়ের খরচ অবশ্য সুরমীই দিয়েছিল। হাসেন বান্নুর ছেলেটার গোঁফ গজিয়েছে, ভাল জনমজুর হয়েছে। সুরমীর জবরদস্তি, এখনো তাকে বুড়ীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে শুতে হবে। আর বুড়ী তাকে সারারাত ঘুমোতে দেবে না।

সুরমী বিবির কাছে কত টাকা আছে?

লোকে বলে অনেক।

তবে চোর পড়ে না কেন? চোরেরা সুরমীকে ভয় করে। সে একটু কুকুর ডাকলেই বল্লম নিয়ে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে আসে। 'কুন্ গোলাম র‍্যা…'

সুরমী বিবির কাছে লোকে আসে সুদে টাকা নেবার জন্যে। তার ভাগ্নে বড়লোক মস্তাজ মোল্লাব মতন লোক, পাঁচ হাজার টাকা চায়। জমি কিনবে। অভাব পড়ে গেছে টাকার। মাস ছয়েক পরেই দিয়ে দেবে।

'কত সুদ দিবি?'

'টাকায় দু'পয়সা।'

'অত টাকা মোর কাছে আছে হাঁ লা হাসেন বান্নু?'

মেয়ে টাকা গুনতে জানে। বলেল, 'হবে। কাল সকালে এস দাদা।'

রাত্রে সবাই ঘুমোলে মেঝের মাটি খুলে একটা মাটির কলসী বার করে সুরমী বিবি আর তার মেয়ে। জয়নালকে সেদিন আর ঘরে শুতে দেয় না।

এক কুড়ি এক কুড়ি করে প্রথমে পাঁচ কুড়িতে একশো টাকার থাক দেয় হাসেন বান্নু। দশশো হলে এক হাজার। এইরকম পাঁচটা সারি।

সুরমী বলে, 'মনে রাখিস মা, এই টাকার জন্যে বিনি তিকিজ্জেয় তোর বাপ মরেছে তবু টাকা ছাড়িনি…অনেক কষ্টের টাকা…সুদটা হিসেব করে লিবি।'

সেকালের অনেক কাঁচা টাকা রয়েছে। মেয়ের হাতের দিকে সদাই লক্ষ্য রাখে সুরমী বিবি। দশটা টাকা পেট-কাপড়ের মধ্যে 'লুইকে' ফেললেই হল।

মস্তাজ মোল্লা টাকা নিয়ে গেল সকালে এসে। কোনো সাক্ষী বা লেখাপড়া নেই। কিন্তু সুরমীর পায়ের কামাই নেই। যাকে পাঁচটা টাকা ধার দিয়েছে প্রতিদিন একবার করে তার বাড়ি যাওয়া চাই। কথা শোনানো চাই। শেষে তার বউ কি রান্না করেছে দিতে বলে। সাতসকালেই একটা ভাঁড় হাতে নিয়ে

পাড়ার বাড়ি বাড়ি যাবে মুরগির কুঁড়ো গুলবার জন্যে ফেন চাইতে। কেউ যদি সুদসমেত টাকা মিটিয়ে দিয়েও থাকে তবু তার রেহাই নেই। সুরমী বলবে, 'বিপদের সময় টাকা চাস, এই যে ছেঁড়া কাপড় পিঁধে আছি, কই দাদিকে তো একটা ছ'হেতে 'ঠেটি' কিনে দেবার মুরোদ হয় নে।'

বি. এ. পাস বিষ্টুবাবু, সম্ভ্রান্ত লোক, দেখা হলেই সুরমী বলবে, 'হাঁ-র্যা বিষ্টু, তুই 'পেসডণ্ড'বাবু হলি মোকে 'লিলিফে'র মাল দিসনি কেন? মোর কি আছে?'

ছোট জামাই 'ডুবে' সামনে পড়লে বুড়ী বলে, 'গোলামের বেটা যেন সং! মাগ নেই, ছেলে নেই, আঠারোটা 'ট্যেকা'র জন্যে ডাক্তার দিয়ে ফি করিয়ে বলদ হয়ে এলি। এখন পাড়ার ছুঁড়ীদের খারাপ করে বেড়াবার মতলব।' ডুবে কিন্তু কিচ্ছু টুঁ শব্দ করে না—বুড়ীকে সে ভয় করে। কিছু বললেই এক্ষুণি পটাস্ করে গালে চড় মেরে দেবে। সোজা মাথা হেঁট করে চলে যায়।

সুরমীর সঙ্গে দেখা হলেই সবাই ভাবে অযাত্রা। মুখ খারাপ করতে, ঝগড়া করতে তার জুড়ি নেই ভূ-ভারতে।

তবু পেটে ব্যথা উঠলে যত রাতই হোক মেয়েরা লম্ফ জ্বেলে নিয়ে ডাকতে যাবে সুরমী বিবিকে। পোয়াতি খালাস করানোর ব্যাপারে সে নাকি ওস্তাদ। যে মোল্লাজী তার সাদী পড়িয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী-ছেলেরা প্রায় ভেসে যায়। কিন্তু বিধাতার কি বিধান, মোল্লাজীর বড় ছেলেটা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে নাকি কবি-সাহিত্যিক হয়ে গেল। বুড়ী তাকে বড় ভালবাসত। তাদের ঘর বাঁধব্যর জন্যে টালিখোলা কিনতে বিনা সুদে দেড়শো টাকা ধার দিলে। টাকা শোধ দিলেও একটা কাপড় দেয়নি বলে বুড়ী তারও ভূত ভাগিয়ে দিতে কসুর করে না। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপরে তার দরদ অপরিসীম। তাদের কাউকে মারতে দেখলে সে ক্ষেপে যাবে। তার বাড়িতে কারো ছেলেমেয়ে গেলে সে কাকে-খাওয়া পেঁপে, বাদুড়ে-খাওয়া আম, শিয়ালে-খাওয়া কাঁঠাল—এই-সব হাতে দেবে। গুড় বা আমসত্ত্ব দেবে। আর বিয়েবাড়িতে কন্যায় গায়ে হলুদ দেবার সময় সারারাত নাচগান করবার জন্যে ডাকো সুরমী বিবিকে। সুরমী লজ্জাশরম উড়িয়ে দিয়ে নাচবে গাইবে:

আঁধার ঘরে চাঁদের বাসর
নেটের মুশারী
তার ভেতরে শুয়ে এ কোন্
নবীন কিশোরী?

চাঁদ সদাগর গায়ে দিল হাত
কন্যে যেন ঘুমে মরে কাত্
ওমা মিনসে করে কি !
ছি ছি ছি !
মুখের ওপর মুখ রেখে সে
কাটিয়ে দিলে রাত !'…

বিয়ের কনে লজ্জায় বুড়ীকে চিমটি কাটে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। তারপর আদিরসের হাঁড়ি যেন হাটে ভেঙে দেয় সুরমী বিবি।

বিয়ের পর যুবতী শালী থাকলে বরকে দেখায় সুরমী বিবি : 'ওটা এখন, পরে এইটা হে মিন্সে !'

শালী হয়তো বলে, 'হাঁ, তোমার মতন সবাই !'

'সবাই লো সবাই। লাজে কই না। বোনাই কক্ষনো ভদ্দরলোক হয় না লো !'…

তার কথার মাত্রা সীমা ছাড়াতে চাইলেই কেউ হয়তো পট্টি মারে : 'ও সুরমী দাদি, তোমার বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, চোর পড়েছে বোধহয়…'

অমনি একটা লাঠি কিংবা কাটারি খুঁজে নিয়েই মালকোঁচা মেরে অন্ধকারেই দৌড় মারে সুরমী বিবি, 'কুন্ গোলামের ব্যাটা র্যা—জামির মল্লিকের ভিটেয় পা দেয়—হারামীর ছাওয়ালের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দোব ভড়াত্ করে এক সড়কি মেরে !'

উদয় কামার এবং তুলি

লাঙল ঘাড়ে নিয়ে ঈশা খাঁ এসেছে উদো কামারের কামারশালে। মুখে তার মেহেদিপাতায় রাঙানো লম্বা নরম দাড়ি। গায়ে সবুজ রঙের বেনিয়ান। পরনে লুঙ্গি। কপালে নামাজ পড়ার কালো দাগ। গোঁফটা চেঁছে কামানো তবে শেষ প্রান্ত দুটোতে লোম আছে এক গুচ্ছ করে। ঈশা খাঁর গড়নটা 'আড়জাঁই' অর্থাৎ বড়সড়—যেন দু'কড়া মই। পাত্লাটে গড়ন হলে কি হবে হাড়ভারী লোক, হাড়ের মধ্যে মজ্জা ভরা, ওজন দু'মণ তের সের ! পাট মাপার সময় সবাই

দেখেছে কাঁটা-পাল্লায় তাকে বসাতে এক মণ, আধ মণ, ফের আধ মণ, আবার দশ সের হন্দর-বাটখারা চাপাতেও খাঁ সাহেব সমান হয় না—আবার তিন সের দিতে হল। উদয় কামারের ওজনও কম নয়—এক মণ আটতিরিশ সের। ভুঁড়িদার চেহারার বিষ্টুবাবু কিন্তু হলেন মাত্র এক মণ তিরিশ সের। উদয় তার বড় বড় ডোণ্টকেয়ারী গোঁফে মোচড় দিয়ে তাড়ির নেশায় টর হয়ে বললে, 'তা ঈশে খাঁ চাচা আমার চেয়ে 'রোজনে' ভারী হলে কি হয়, ক্ষ্যামতায় পারবে? আমি নেহাইয়ে হাম্বর মেরে আমার গতর পাথর করে ফেলেছি। শালা ডাক্তার 'ইনজেসেন' দিতে এসে পট করে ছুঁচ ভেঙে ফেললে। আয় তবে, বাড়ি টানাটানি হোক—কার কত ক্ষ্যামতা দেখা যাক। দেখা যাক, কে কতটা মায়ের দুধ খেয়েছে।' বলে উদয় তেলকালি মাখা ছেঁড়া কাপড়টা কোপনী মেরে পাছার দুই 'বাগ্‌লা' বার করে দুই উরুতে আর বুকের ওপর বার দুই চাপড় মেরে বসে গেল কামারশালে চেঁছে রাখা শক্ত বাবলা ডালের কোদাল-বাঁট নিয়ে।

ঈশা খাঁও বসে গেল তার সামনে। ক্ষমতার পরীক্ষা হয় তো হয়ে যাক। পাট ব্যাপারী আর তার দালালরা মজা দেখতে ঘিরে দাঁড়াল। পাড়ার যত লোকজন জুটে গেল। উদো কামারের বউ হারানী, মেয়ে দুলি, বুড়ো বাবা মাহিন্দ কামারও এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

পায়ের পাতায় পায়ের পাতা ঠেকিয়ে সরল রেখায় পা মেলে বসেছে দুজনে সামনাসামনি। দুজনের ঠিক সমান ব্যবধানে কাঠের ডাং রেখে ধরলে হাত দিয়ে দুজনে। ঈশা খাঁ ধরেছে দুই প্রান্তে। মাঝখানে উদো কামার। টান দেবার আগে ঈশা খাঁ বললে, 'ইয়া আলী!'

উদয় বললে, 'জয় মা কালী!'

তারপর হাড়গোড় মড়মড় করতে লাগল দুজনের। শোরের গোঁ দিয়ে টানতে লাগল উদয়। আর ঈশা খাঁ টানতে লাগল যেন এঁড়ে গরুর মতন। ঈশা খাঁ একবার টেনে তুলে ফেলেছিল প্রায়। উদয়ের বাপ খেঁকিয়ে-মেকিয়ে চিল্লে উঠল ছেলেকে সাহস দিয়ে, 'ভূঁই ছাড়া হইচিস কি শালার বেটা, তোকে তোর যমের বাড়ি পাঠিয়ে দোব! তুই যদি মাহিন্দ কামারের বেটা হোস তবে সিঁদে বসে থাকবি, টেনে তুলে নিবি ঈশাকে!'

কিন্তু তারা দুজনে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরস্পরকে টানাটানি করতে লাগল শুধু। কেউ কাউকে হারাতে পারলে না।

বুড়ো মাহিন্দ কামার বললে, 'তোরা দুজনেই সমান।'

কিন্তু ঈশা খাঁর সারা মুখ লাল হয়ে গেছে তখন। আর উদয় কামার থু করে বন্ধ মুখ থেকে এতখানি রক্ত সমেত একটা দাঁত ফেলে দিলে। বাড়ি টানবার সময় যখন সে হেরে যাচ্ছিল আর বাপ তার জন্মের শপথ দিলে তখন মরা কামড় দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে টানতে যেতেই গালের মধ্যে মড়াৎ করে একটা দাঁত ভেঙে যায়। নোনা রক্ত সমেত গালের মধ্যেই সে দাঁতটা চেপে রেখে দেয়। চোখ ফেটে গুলি হুটো বেরিয়ে আসবার মতন হয়ে পড়ে, মনে মনে কাঁদতে থাকে, হে ভগবান, হে মা কালী—রক্ষে করো……ঈশা খাঁর গায়ে কত ক্ষ্যামতা…

উদয় বললে, 'এস চাচা, তোমার কোদাল, খড কুঁচনো বঁটি, কাটারী, হেঁসো—সব হয়ে গেছে। চটখানা পেতে দে মা তুলি তোর দাদাকে।'

কামারশালের হাপর বা গাঁতা টানা বন্ধ করে উদো কামারের বছর কুড়ি বয়েসের কালো গোলগাল পাথর খোদাই চেহারার মেয়েটা এক হাতে বুকের কাপড সামলে ধরে অন্য হাতে একখানা থলে বিছিয়ে দেয়।

ঈশা খাঁ হঠাৎ তুলির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় যেন। বলে, 'এই তোর কপালের সিঁদুর কই ?'

তুলি পাছা দুলিয়ে একটু ট্যারচা দৃষ্টি হেনে পৈঠার ওপরে ধপ করে বসে পড়ে ভারার ওপরে রাখা বাড়িটার মাথার দড়ি ধরে টানতে থাকে ক্রমাগত একতালে। কোনো কথা বলে না। হটোর হটোর…ফ্যাস ফ্যাস…ঠুংঠাং বিচিত্র শব্দ উঠতে থাকে কামারশালে। উদয় পোড়া কয়লার ভেতর থেকে আগুন-রাঙা লোহা খণ্ডটা বার করে নিয়ে হাম্বর মেরে কাজ করতে করতে বলে, 'স্মুন্দির পো জামাইটার কথা আর কি বলব চাচা তোকে। রোগা পেঁকুটে। তাই নিয়েই নাকি কি বিক্রম! 'আঁটে'র দোরে পড়ে থাকে। 'রিস্‌কা' চালায়, 'ট্যাসকি'তে 'কনট্যাকটরী' করে—সাতদিন ঘরে আসবে না—তুদিন কাজ করবে, চারদিন হাওয়া খাবে—মেয়ে আমার কি গতর নিয়ে গেল আর কি হয়ে এল! জামাই শালা, ভাত দেবার মুরোদ নেই কিল মারবার গোঁসাই। উদো কামারের মেয়ে বাবা, মারতে আসতেই দিয়েছে হাতটা মুড়ে পাকিয়ে ভেঙে! তাই নিয়ে ওর শাউড়ী ওকে ঝ্যাটাপেটা করতে আসতেই তাকেও শুইয়ে ফেলে বুকে চড়ে কিল মেরে, খোঁদা মেরে দাঁত কটা তার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে চলে এসে সিঁথির সিঁদুর পুঁছে ফেলে দিয়েছে! এখন আবার ওর কি করি বল তো চাচা ?'

উদো কামার প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে গালটা হাঁ করে থাকে কতকক্ষণ। ফোগ্‌লা

দাঁতের ফাঁকটা তার হাঁ হাঁ করে। উদয়ের চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। এক মুঠো করে চাল দিলে তবে সেই গর্তটা যেন ভরবে। চাদরের মতন মোটা চামড়াটা লোল হয়ে গেছে। মোটা মোটা পাঁজরা-কাঠিগুলো গোনা যায়।

ঈশা খাঁ চারমিনার সিগারেট বার করে ধরায় একটা, গম্ভীরভাবে আর একটা দেয় উদয় কামারকে। বলে, 'ভাবনার বিষয় বটে উদয়! তোর মেয়েটার চেহারা ভাল, দেখলে শালা, পাথরের শিবঠাকুরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে!'

দুলি অপাঙ্গে বান হানলে বুড়োকে। একটা পোড়া কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে। বললে, 'উঃ! বুড়োটা যেন অবতার!'

'হুঁ হুঁ দিদি···অবতার মানে 'এ্যাক্কেরে' কল্কি অবতার! তা এক কাজ কর্ বাবা উদয়। তুই না হয় আমার শ্বশুর হয়ে যা! আজকাল ওসব হচ্ছে, জাত-ধর্ম মানামানি নেই।'

দুলি হাত পা ছুঁড়ে নাকে কাঁদে: 'এই বুড়ো, তোমাকে জনারী পোড়া করে ছাড়বা এই কামারশালের আগুনে!'

উদয়দাদা নাতনীর এই তামাসায় শুধু হাসে আর চোঁ চোঁ করে সিগারেট টানে। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'বলুক না মা, তোর দাদামশায় হয় যে!'

দুলি বলে, 'তোমার মতন বুড়ো ঢচ্ঢরেকে আমি বে' করব? গলায় দড়ি! তোমার বুড়ী যে এখনো তোমাকে 'তাল্লাক' দেয়নে তাই কপাল! বুড়ীর আবার নাকে নথ! এক গা সোনা!'

'তবেই বোঝ্! তুইও বউ হলে ঐরকম গয়না পাবি। বুড়ো বলছিস, এখনো আমি দেড় মণ করে ধানের বোঝা একাই মাথায় তুলে নিতে পারি। এখনো আমার গিন্নীর ছেলেপুলে হচ্ছে। আমি চোদ্দ ছেলেমেয়ের বাপ। এখনো কোঁপাই, লাঙল ঠেলি, এখনো নারকেল গাছে উঠতে পারি। তাল গাছ খেজুর গাছ কাটি। তিনপো চেলের ভাত খাই। এক মালসা গোস্ত খেতে পারি।'

উদয়ের স্ত্রী পাছাভারী হারানী আসে। কোলে তার পেটডাবা একটা ন্যাংটা পুঁটে। ঈশা খাঁর উদ্দেশে বলে, 'কি গো বাবা, মেয়ের বাড়ি এলে, কি এনেছ গো?'

উদয় বলে, 'ঐ একটা লাঙল।'

সব্বাই হা হা করে হেসে ওঠে।

ঈশা খাঁ বলে, 'তোমার মেয়েটা নাকি সিঁথির সিঁদুর পুঁছে ফেলেছে, আমি ঘন ঘন আসা-যাওয়া করলে লোকে বদনাম দেবে, তা বদনাম সইতেও রাজী মা,

যদি তোমার ছুলালী আমার গলায় মালা দেয়।'

ছুলির মা হারানী বলে, 'তা বেশ তো চাচা, তুমি নিয়ে যাও, তোমার মতন বর না হলে ওকে সাজাও দিতে পারবে না কেউ!'

ছুলি মাকে গাল দেয়, '…বুড়োটার মরণ! দাঁড়াও—দিচ্ছি চিৎ করে মুখে আগুন!'

ছুলি উঠে এসে ঈশা খাঁকে পিছন থেকে টেনে শুইয়ে ফেললে। মেহেদি রাঙানো লাল দাড়িটা মুঠো করে ধরে বললে, 'পাকা সাদা রঙ দিয়ে ঢাকলেই কি শুকনোটা রসিয়ে উঠবে বুড়ো?'

বাপ মা তাড়া দিতে ছুলি ছেড়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। ঈশা খাঁর কাছে গোটাকতক নটেদানা, কুমড়োদানা, চিচিঙ্গেদানা চেয়ে পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে হারানীও চলে গেল কিছুক্ষণ পরে। উদয় আর ঈশা খাঁ অভাব-অনটন, সংসার-ধর্ম, চাষ-আবাদ, গরু-বাছুর কংগ্রেস-'কমিউনিস্টি' মামলা-মোকদ্দমার গল্প করতে করতে মুখ আঁধারী সন্ধ্যা নেমে এল। একটা ধোয়া মাছুর এনে দিতে কামারশালের পাশে পেতে ওজু করে এসে ঈশা খাঁ মগরেবের নামাজ পড়ে নিলে।

নামাজ পড়া শেষ করে এসে ঈশা খাঁ বলে, 'না উদয়, মেয়েটার আবার দেখে-শুনে একটা ব্যবস্থা কর্। ঘরে রাখা ভাল নয়। যুবতী মেয়েকে জেদ করে যে ঘরে রাখে তার ঘরে সে যেন আগুন রেখে দেয়। দমকা হাওয়া এসে কোন্ গোপন সময়ে সারা ঘর পুড়িয়ে দেবে তার ঠিক নেই। আমার ছোট মেয়েটাও বেশ ডাগরপানা হয়ে গেছে—ছেলে দেখছি…তা হাঁ উদয়, তোর ছেলেটা এখন কি করে?'

ছুলি আবার এল একটা মশাল-জ্বলা কেরোসিন-কুপি হাতে নিয়ে।

উদয় বললে, 'ছেলে? সে ব্যাটা বউকে নিয়ে যেয়ে শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। তার শাউড়ী নাকি তাকে বশীকরণ-ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে পানের সঙ্গে মেয়ের হাত করে। এখানে থাকলে হাম্বর পিটতে হয়। শ্বশুরবাড়ি হাল ঠেলছে গিয়ে। যাক, ব্যাটা মরুক।'

ঈশা খাঁ দশটা টাকা দিয়ে বললে, 'ভাল করে 'আটচাল' এটে 'মুড়ো'টা বদলে ফালখানা 'পাজিয়ে' দিস বাবা। ঐ লাঙল দিয়ে উচ্ছে-ঝিঙে, মুগ কলাইয়ের চাষ দিয়েছিনু ঠেকরে ঠেকরে। কাটারী বঁটিতে ইস্পাত দিইচিস তো? না, সব ফাঁকি?'

'তোর সঙ্গে বেইমানী করব হাঁ চাচা? এই দুলি, আয় হাতুড়ী মার।'

উদয় সাঁড়াশী দিয়ে পোড়া লোহা নেহাইয়ের ওপর ধরলে দুলি হাতুড়ী মারতে থাকে তালে তালে।

ঈশা খাঁ দৃশ্যটি দেখে কিছুক্ষণ। কুপির আলোয় দুলির পাথর-কোঁদা চেহারাটা যেন ছবির মতন দেখায়। ইশা খাঁ বলে, 'চালি রে দুলি, কপালে আবার সিঁদুর পর!'

দুলি হেসে ফেললে। হাম্বর নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। পেটানো লোহাটা গামলার জলের মধ্যে ছোঁক করে শব্দ করে ডুবিয়ে দিলে উদয়। বললে, 'যদি আর না ফিরি চাচা, আমার বাল-বাচ্চাদের একটু দেখো।'

'আচ্ছা'—বলে ঈশা খাঁ তার যন্তরপাতিগুলো নিয়ে চলে গেল।

রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করার পর কামারশালের আগুনে জল ঢেলে দেয় উদয়।

গা হাত ধুয়ে এসে ভেলি গুড় দিয়ে খানকতক রুটি ছিঁড়ে খেয়ে নিয়ে এসে চাঁদ-ওঠা আকাশের দিকে তাকিয়ে খেজুরপাতার চাটাই পেতে মাঠের হাওয়ায় শুয়ে থাকে।

কাল মামলার দিন আছে, সেই কথাই ভাবতে থাকে উদয়। টাকা চাই। পাঁচ কোট মামলা হয়ে গেছে। হারানীর জবানবন্দী হয়ে গেছে। কাল মামলার রায় বেরুবে। মামলার খরচায় তার হাড়ে দূর্বাঘাস গজিয়ে দিলে। হয়তো তার জেল হবে। হলে তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে, সোমত্ত মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে হারানী? দুলিরই বা কি হবে? ছেলে কানাই সংসারে ফিরবে কি মা বোনের দুর্দশা দেখে?

ঘুম এসে পড়েছিল। হারানী এল। কাছে বসল। বললে, 'ঘুমোলে নাকি?'

'হাঁ।'

হারানী হাসলে। বললে, 'দাও না গা পিঠটাতে একটু ঘামাচি মেরে। বড্ড কিটুচ্ছে।'

'হাই তেঁতুল গাছটাতে গা ঘষ্ যেয়ে। আমার শালা সারাদিন লোহা ঠেঙিয়ে এমনি বলে গতর জখম, ওর এখন ঘামাচি মারার বাই উঠল।'

হারানী একটা ঝিনুক নিয়ে স্বামীর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'দাও গো দাও, তোমার পায়ে পড়ি!'

অগত্যা, মামলা-মোকদ্দমা, অভাব-অনটন, শ্রান্তি-ক্লান্তির কথা মনের আঁধারে

ডুবিয়ে দিয়ে স্ত্রীর শরীরের সেবাতে লাগতেই হয় উদয়কে।

একসময় উদয় বলে, 'ঘরে চলো না।'

অস্ফুটে হারানী বলে, 'না, তুলি ঘুমোবার ভান করে বোধহয় জেগে থাকে! ওর আবার বে' দাও।'

'জেল হলে সব শালা হয়ে যাবে!'

'অমন কথা বলো না গো! ভাবলেই পাগল হয়ে যাই। বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসারে যত সব অপয়া কাণ্ড ঘটছে। তোমাকে কত করে বারণ করনু, শম্ভু ধাড়াকে খুন-জখম করনি। তা এমন হেঁসো চালালে ভুঁড়ি বেরিয়ে গেল। ভুঁড়িটা যদি ধরে কেটে দিতে সাবাড় হয়ে যেত। হাসপাতালে যেতে সেলাই করে দিলে। ভাল হয়ে গেল।'

'শালা!' দাঁতে দাঁতে কর্কশ শব্দ করলে উদয়।

'আমার সোনা, আমার পাখি!' ভীষণ উত্তেজনায় স্বামীকে আঁকড়ে ধরলে হারানী। তারপর কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার কালই যদি জেল হয়ে যায়···দিনদুপুরে খুন করলে···শম্ভুটা বৌদি বৌদি করে নেশায় পাগল হয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে···কেউ ছিল না তখন ওদের আমাদের বাড়িতে···তুমি এলে দুপুরে···বলতেই ছুটে যেয়ে খুন করে বসলে···তিনজন চাক্ষুষ সাক্ষী···'

কেউ কোনো কথা নেই আর কিছুক্ষণ।

হঠাৎ হারানী দেখতে পেলে তুলি খানিকটা দূরে কাঁটালী চাঁপাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

মরণ! হারানীর মরণ হল না কেন!

সকালে কাক ডাকতে লাগল।

উদয় খেয়ে নিয়ে ছোট ছেলেমেয়ে তিনটেকে আদর করে, নেহাইটাতে কপাল ঠেকিয়ে গড় করে স্ত্রীর দিকে ব্যাকুল চোখে একবার, তুলির দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ঝাপসা চোখ মুছতে মুছতে মামলায় চলে গেল।

কাকটা কাঁপা কাঁপা গলায় কর্কশ স্বরে ক্রমাগত ডাকতে লাগল।

যে মানুষ চলে গেল সে আর ফিরল না।

রাত ন'টার পর খবর এল উদয় কামারের সাত বৎসরের কারাদণ্ড হয়েছে। শুনেই হারানী-বউ বসে পড়ল দাওয়ার খুঁটি ধরে। কুপির আলোয় ঘুমন্ত বাচ্চা তিনটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ঢুলি কিন্তু স্থির। মনের কোনো এক গোপন দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সে অটল। মায়ের মাথায় জল চাপড়াতে লাগল। নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য! কার নিয়তি কোথায় কখন তা কেউ জানে না। গুণ্ডা শম্ভূ ধাড়া এসে ঢুকল উদয় কামারের বাড়িতে। নেশা করেছে। আবদারে জড়ানো স্বরে বললে, 'মা তো মরেইছে, ঢাল শালী এক গেলাস।···উদো গেছে বুধো এসেছে।···বৌদি, তোমার কুনো ভাবনা নেই। কুছ পরোয়া!···আরে মাই ডিয়ার ঢুলি যে··· আচ্ছা, আচ্ছা···মায়ে-মেয়েতেই আমার সঙ্গে থাকবি! ভারী মজা শালা!'

'কী বললি?' ঢুলি ছুটে যায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে। একটা নতুন ধারালো গাছ-কাটারী এনে মায়ের-গায়ে-হাত-দিতে-থাকা শম্ভূ ধাড়ার দিকে এগোতেই শম্ভূ দৃশ্য দেখে চকিতে দৌড় মারে। ঢুলি দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে দোরগোড়ায় এসে গায়ের জোরে ঠিক শম্ভুর গর্দানের ওপরে ঝেড়ে দেয় এক কোপ! 'মা'—বলে শুধু একটা শব্দ! শম্ভু ছিটকে পড়ে গেল উঠোনের দিকে তিন হাত দূরে। মুণ্ডটা তার ধড় থেকে কেটে নিয়ে চুল ধরে ঝুলিয়ে এনে সবেমাত্র জ্ঞান-ফেরা মাকে দেখালে ঢুলি। হারানী ভয়ে আঁতকে উঠে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল!

ঢুলি বালতি করে জল এনে রক্ত সাফ করে ফেলে গোবর গুলে নিকিয়ে ফেললে উঠোন, দোরগোড়াটা। লাশটাকে বস্তায় পুরে আগেই সে পুকুরের জলে, ঘাটের নিচে রেখে এসেছিল। সেখান থেকে তুলে মাথায় করে নিয়ে কাক-জ্যোৎস্নার আলোয় মাঠ পার হয়ে কচুরি-দাম ভরা নির্জন এক ডোবার মধ্যে ফেলে দিয়ে এল। স্নান করে এসে আলো নিয়ে ভাল করে উঠোন-বাড়িঘরদোর দেখলে। না, আর কোথাও পাপিষ্ঠের রক্তের স্বাক্ষর নেই।

ঢুলি নিজের উত্তেজনা অথবা আতঙ্ক থামাবার জন্যে মাকে জড়িয়ে ধরলে। তখন হারানী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। ঢুলি দেখলে বিপদ। কেউ এলেই উঠোন ভিজে কেন জানতে চাইবে। বললে, 'কেঁদো না মা, কিচ্ছু ভয় নেই। দাদাকে কাল আমি ধরে আনব।'

সকালে গিয়ে দুপুরের মধ্যে সত্যিই কানাইকে ধরে আনলে ঢুলি।

আবার উদয় কামারের কামারশালের হাপরের চুল্লীতে আগুন জ্বলে উঠল।

কানাই পোড়া লোহা সাঁড়াশী দিয়ে নেহাইয়ের ওপরে ধরলে, 'হেই হেই' শব্দ

তুলে হাম্বর মারে তুলি। হারানী যাঁতার দড়ি টানতে থাকে এলো বুকে ছেলেকে নিয়ে।

ঈশা খাঁ তার লাঙলের জন্যে এসে বসলে হারানী গায়ে-মাথায় কাপড় দেয়। কিন্তু তুলি যেন বেপরোয়া। বলে, 'বসো দাদা, আজ তোমার গলায় মালা দোব!'

ঈশা খাঁ করজোড়ে তার উদ্দেশে বললে, 'দেবী রক্ষেকালী! তোমাকে নমস্কার!'

এবং খড় কাস্তে আলীমদ্দি

ধানের 'কাঁড়ি' ভাঙা হয়েছে, দশটা জন লেগেছে, ভোরবেলাতেই হালিমা বালতিতে করে গোবর গুলে খামারে গোবর-জল দিয়ে নিকিয়ে দিতেই আলীমদ্দি বাঁশের বাঁখারী বোনা 'আগড়' ফেলে ধানের কাঁড়িতে উঠে বিচালীগুলো নামিয়ে দিয়েছে। বীজধানের আঁটিগুলো আলাদা করে ফেলে দিতে পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পিঁড়ে পেতে বসে বীজধান বাছতে বসেছে আলীমদ্দির মা দুলালী বিবি। প্রত্যেকটা ধানের আঁটি পায়ের কাছে মাটিতে রেখে শীষগুলো মেলে ধরে মিশেল ধানগুলোর শীষ হাত দিয়ে চুঁছে ঝরিয়ে দিতে হয়। সাদা পাটনাই ধান 'ভেগুন' বা বীজ থাকবে। তার সঙ্গে লাল মউলো ধান এসে মিশেছে বীজ ছড়াবার সময় 'তলাপোড়ে' থেকে। লাল কালো ধানগুলো সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু সাদা ধানের সঙ্গে অন্য সাদা ধান মিশলে তাও বেছে বার করতে হয়। আলীমদ্দির ডাগর মেয়ে সেরিনা ধান বাছতে বসে ঠিক চিনতে না পারলে বুড়ী চেঁচামেচি করে বলে: 'বে' দিলে মাগীর দুটো ছেলে হয়ে যেত, এখনো তুমি ধান চেন না? এটা কি ধান, সরু? কলমকাটি আর এটা দুধ-কলম। দুধ-কলম ধানও সাদা, মাথায় কালো ছোট্ট একটু টিপ আছে। সরে যা, তুই ধান বাছলে জমির বীজধানের মধ্যে সব 'ভেল' হয়ে যাবে।'

'হলেই বা ক্ষতি কি! সবেই তো ভাত বা মুড়ি হবে।'

'তোর মাথা! পাটনাই ধান যে-জমিতে হবে, সেই জমিতে কলমকাটি হবে কেন? পাটনাই একটু নাবি জমিতে হয়, কলমকাটি হয় চড়াতে। ভাত তো সব ধানেরই হয়, তার মধ্যে মুড়ির ধান মোটা, ডহর জমিতে হয়, চড়া জমিতে আদৌ

ভাল হবে না। সরু ধানে মুড়ি হয় না। ভাত চিঁড়ে হয়। আবার ধর নাজানি ধান—মুড়ি ভাত দু-ই হয়। মাঝারি ধানে দু'রকমই হয়।'

'কে জানে বাবা, অতো 'বিধেন' আমি জানি না।'

'তুই ইসকুলের পড়া পড় যেয়ে। তোর দাদাটা এম-এ পাস করেছে, সে একটা ধানও চেনে না।'

শাল মুড়ি দিয়ে মুখের মধ্যে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে হা ণের চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে লুঙ্গি পরে এসে দাঁড়ায় খয়রুল বাসার। বলে, 'কি বলছ দাদি, আমি ধান চিনি না?'

'চিনিস?' হাসলে বুড়ী দুলালী বিবি। 'বল তো এটা কি ধান?'

খয়রুল ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বসে ধানটা হাতে নিয়ে চিনবার চেষ্টা করতে থাকলে তার বাপ হাসে, জনেরা হাসতে থাকে আগড়ের ওপরে ধানের আঁটি কাছড়াতে কাছড়াতে। পাড়া মাত করে পটাস পটাস শব্দ উঠছে।

খয়রুল বাসার বলে, 'এটা আঙুরশাল ধান।'

বুড়ী খলখল করে হাসতে থাকে।

খয়রুল গম্ভীর হয়ে বুড়ীর হাসি দেখে।

সেরিনা বলে, 'বুড়ী এবার একটা মিথ্যে কিছু বলে দেবে।'

বুড়ী চোখ বার করে: 'দূর হারামী! লক্ষ্মীর নামে মিথ্যে বলে দোব? এটা হল গয়াবালি ধান।'

শীষটা কেটে নিয়ে সেরিনা তার বাপকে দেখিয়ে শুধোয়, 'এটা গয়াবালি ধান হাঁ বাবাজী?'

আলীমদ্দি বলে, 'মা ঠিক ধান চেনে। ওটা গয়াবালি ধানই।'

বুড়ী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'তোর বাপকেই বা ধান চেনালে কে? মোকে শিখিয়েছে তোদের দাদু।'

কলেজে-পড়া দুটো মেয়ে—মঞ্জুশ্রী আর হেমলতা পড়তে এসেছে খয়রুলের কাছে। মুখে জল দিয়ে চা খেয়ে নিয়ে গিয়ে পড়াতে বসায় তাদের খয়রুল পাকা বৈঠকখানাটার মধ্যে।

বাড়ির মধ্যে রেডিও চলছে।

অনেক মোরগ-মুরগী ধান খুঁটে বেড়াচ্ছে।

গোয়াল থেকে গাই-বাছুর হেলে-গরু চারটেকে বাইরের রোদে বার করে বেঁধে দেয় আলীমদ্দি।

চারটে লোক পান গুছোতে বসেছে বৈঠকখানার দাওয়ার একদিকে।

প্যাকাটির খদ্দের এলে আলীমদ্দি তাদের মাল দেখায়, দরদস্তুর নিয়ে কচ্‌লা-কচ্‌লি করে। শেষে মতামত ঠিক হলে লোকগুলো প্যাকাটিগুলো গুনে নিতে থাকে। পাটের খদ্দের আসে, আটান্ন টাকায় চল্লিশ কেজি। আলীমদ্দি রাজি হয়। না হয়ে উপায় নেই। তুলালী বিবি হাত-ইসারায় কাছে ডেকে বলে দেয়, 'দিয়ে দে বাবা, ইঁতুরে পাট কেটে নষ্ট করে ফেলছে।'

'বলন' সমেত একশো মণ পাট দিয়ে দেয় আলীমদ্দি। কাঁটা করে মেপে বেঁধে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে যায় লোকগুলো। পাঁচশো আশী টাকা। প্যাকাটি বেচার দাম পায় তুশো টাকা।

সুপারি, নারকোল, বাঁশ, উলু, খড়, কেশে, কলা, আখ—এসব বেচা টাকা আসে অনেক—কিন্তু রোজ পনেরো-ষোলোটা জনের রোজ যায় মাথাপিছু তিন টাকা করে। তাদের মুড়ি-বিড়ি আছে। জমি চাষের খরচ আছে। পঞ্চাশ বিঘে জমি। একটা ছেলে এম-এ পাস করে প্রফেসারি করছে। আর একটা মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ছে। টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে—সব সময়েই মেয়েটা ফার্স্ট হয়। পাস করে যাবে। দেখতেও পরীর মতন। ওদের মাকে যে দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। বিশটা গ্রাম খুঁজে শতখানেক মেয়ে দেখার পর তুলালী বুড়ী বউ করে এনেছিল। যেমন নাকের গড়ন, তেমনি তুটো চোখ। গায়ের রঙ একেবারে যাকে বলে তুধে-আলতা গোলা।

বউমা এক গ্লাস গরম তুধ এনে দেয় শাশুড়ীকে—সর-পড়া ঘন মিষ্টি তুধ। বুড়ী খেয়ে নিয়ে বলে, 'খয়রুলকে আর একটু বেশি করে তুধ দাও বউমা, ও কেন যেন দিন-দিন কাহিলপানা হয়ে যাচ্ছে। গাই-গরুটার তুধ কমে গেছে। মূলতানী গাই, অতো টাকা খরচা করে আনা হল। ছ'কেজি তুধ দিতে দিতে পাঁচ কেজিতে নাবলো।'

বউমা হালিমা মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে খাটো গলায় শুধোয়, 'আজ কি রান্না হবে হাঁ মা? মাছ-গোস্ত কিছু নেই।'

বুড়ী হাঁ করে বউমার দিকে তাকায়। হামানদিস্তেতে ছেঁচে-আনা গুড়ি-পানের গুঁড়োগুলো গালে ফেলে বলে, 'খয়রুল তো খেয়ে কলেজে যাবে। এই ইনসান, জাল ফেলে মাছ ধরে দে বাবা—তোর ধানঝাড়া এখন থাক্।'

ইনসান বললে, 'পানি যা 'কালা' ঝি-মা!' বলে সে গামছায় গা ঝেড়ে ফেলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একটা বালতি আর খেপলা জাল নিয়ে বিলের দিকে

মাছ ধরতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ইনসান মাছ নিয়ে এলো। আলীমদ্দি মাছ দেখে খুশী হল। একটা ভেটকি মাছ পড়েছে কেজি-তিনেক। অনেকগুলো বাটা মাছ পড়েছে। ভারী বর্ষায় মানুষের পুকুর ভেসে গিয়ে রাজ্যের পোনা মাছ এসে জড়ো হয়েছে তাদের মাঠের বিলে।

আলীমদ্দি খেতে এসে বসে বসে টাকা গুনতে থাকলে তার বউ বলে, 'খোকা বলছিল টাকা সব ব্যাঙ্কে রাখতে, চুরি-ডাকাতি হলে সব যাবে।'

আলীমদ্দি বললে, 'চোর তো একজনই আছে।'

হালিমা লজ্জা দেখিয়ে দাঁতে মাথার কাপড়ের পাড়টা কামড়ে কটাক্ষ হেনে বললে, 'সে-চোর বুঝি হালিমা?'

ছুটো ডিমসিদ্ধ খানিকটা হালুয়া, লুচি আর নারকোল নাড়ু খেতে দেয় হালিমা। এক গ্লাস দুধ এনে দেয়।

'কত টাকা জমিয়েছ তবু শুনি?'

হালিমা বলে, 'কোথা গো! আমার কাছে কিচ্ছু নেই। মেয়ে আর ছেলে কি টাকা আমার কাছে রাখে?'

'হুঁ! শালা, মেয়েমানুষ কখনো কি তার গোপন ভাঁড়ারের খবর দেয়। কই আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো দিকিনি একটা টাকাও নেই আমার কাছে।'

'বললে তোমার মাথায় আর একটাও চুল থাকবে না। মিথ্যে কথা বললে চুল সব উঠে মাথা ওল হয়ে যাবে।' হি হি করে হাসতে থাকে হালিমা।

'এই শোন'—হাতটা ধরে কাছে টেনে আদর করে আলীমদ্দি। বলে, 'কত আছে বল না, মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা লাগবে না? হাজার পাঁচেক হবে তো?'

'হাজার পাঁচেক! এক লাখ বলো! বাড়ি করবার সময় তুমি আমার সাত হাজার টাকা নিলে, নারকোল পাতা, ঘুঁটে, খড়, মাছ, কঞ্চি-বেচা টাকা, আমার বাপ দুশো দিয়েছিল—সব গেল—সে-টাকা দিতে হবে, হাঁ।'

'এই যে দোতলা পাকা বাড়িতে বাস করছ, এটা কার? তোমার না?'

'এই দেখ রগড়, আমার ঠোঁট ফেটে গেছে, দিলে তো রক্ত বার করে। গালে ইয়ে কর কেন? দাগ বসে যায়—মেয়েটা এসে পড়ে যদি জিগেস করে মা তোমার গালে এমন লাল দাগ কেন?'

'কেন, সত্যি কথাই বলবে!'

'মরণ! বুড়ো বেলায় ঢং!'

'এই—বল না কত টাকা আছে?'

'কেন?'

'খয়রুলের বিয়ে দোব। মেয়ে দেখা ঠিকঠাক।'

'তোমার সব মিথ্যে গুলপট্টি। জানো, সতীসাধ্বী অবলা বউকে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়!'

'হয় বৈকি! তবে যে-বউ টাকা চুরি করে তাকে সত্যি কথা বলাও পাপ। সত্যিই খোকার বিয়ে দোব এ-বছর। হাজী কবিরুল গাজির মেয়ের সঙ্গে। বি-এ পাস করেছে। দেখতেও মন্দ নয়।'

'ধ্যেৎ! আমি সে-মেয়েকে দেখেছি। কালো। ও-মেয়ে আমি তুলবো না বলে দিচ্ছি।'

'কালো না হাতি! ওকে কালো বলে না!'

'ছেলের বিয়ে থাক্, বরং মেয়ের বিয়ে দাও—বড্ড ডাগর হয়ে গেছে।'

'বেশ দোব। কথা তো একরকম হয়েই আছে। ভাগ্নে বলে নয়, মনসুর ভাল ছেলে, বি-এ পাস করে মাস্টারী করছে—জমি-জিরেতটাই যা বড্ড কম।'

'তাই হোক। এই শোন, মনসুর না, সেদিন এসেছিল, আর সিঁড়ি-ঘরের নিচে হঠাৎ দেখি দুজনে—'

'কি!' সচকিত হাসিতে শুধোয় আলীমদ্দি।

'এই!' বলে চুম্বন করে দেখালে হালিমা।

'ওঃ!' হাসল আলীমদ্দি।

'তরকারী পুড়ে যাবে' বলে হালিমা রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল। টাকা তার কাছে কত আছে আর জানা হল না আলীমদ্দির। একটা হাসকিং মেশিন কিনবে বলে ভাবছিল সে।

মেয়েদের পড়িয়ে এসে জামা-কাপড় খুলে সাবান-তোয়ালে হাতে নিয়ে খয়রুল বলে, 'মা, তোমার ভাত হল?'

হালিমা কাছে এসে ছেলেকে বসিয়ে তার মাথার চুলে একপলা তিলের তেল ঘষে দিতে দিতে বলে, 'মাছটা হয়ে যাক। তোর 'গোসল' (স্নান) করে আসতে আসতেই সব হয়ে যাবে।'

খয়রুল মায়ের মুখে চক্রাকার টিপ-টিপ লাল দাগ দেখে ক্ষণিক এক চোখ তাকালে। তারপর বললে, 'শীতকালের চান মা, কাকের মতন পড়ব আর উঠব, উঃ! আমার যা ঠাণ্ডা লাগে! হাড় যেন কনকন করে!'

'কান দুটোয় তোর কি ধুলো-ময়লা বাবা! মুখেই খালি সাবান ঘষিস! আর এই নখগুলো কত বড় বড় হয়েছে রে তোর! ক'মাস পর পর নখ কাটিস?'

'জানো মা, একটা ছেলে না বারো ইঞ্চির মতন নখ রেখেছে—হাত মুঠো করতে পারে না! নখে আবার 'চিত্তির' করে রঙ দিয়েছে। বলে পয়সা দিন! অধ্যবসায় করে নখ রেখেছি। আমার দেখলে ঘেন্না করে—গা শিউরে ওঠে। আর পায়ের আকারে এতখানি করে জুলপি!'

হালিমা হাসতে থাকে। বলে, 'কেউ দাড়ি রাখছে, কেউ জুলপি রাখছে, কেউ নখ রাখছে—তুই যেন বাবা ওসব করিসনি—তোকে এমনিতেই দেখতে ভাল—যা গা ধুয়ে আয়।'

সেরিনা এসে বলে, 'মা আমার মাথায় উকুন!'

'উকুন!'

'হাঁ! একটা 'ড্যাঙোড়'! এত বড়!'

'কোথা থেকে এলো?'

'অঞ্জুব চুল দেখছিলুম সেদিন। তার চুলে রাজ্যের উকুন। সদাই ঘষোর ঘষোর করে।'

'বেশ করেছিস, তোর মাথায় নুড়ো জ্বেলে দোব। একবার উকুন হল মামার বাড়ি যেয়ে, তোর মামীর কাছে শুয়ে। কত ওষুধ দিয়ে ভাল করনু। চুল ভাল করে আঁচড়া যেয়ে। আজ বাদে কাল তোর বে' হবে।'

'বে' হবে!'

'হাঁ। বে' হবে। মেয়েছেলে—ঘরে কি তোলা থাকবি। তোর জন্যে ছেলে দেখা হয়ে গেছে। বর্ধমানে। এক জোতদার ধনী লোকের ছেলে।'

'মিথ্যে!'

'মিথ্যে কিরে!' মা অবাক হয়।

'সেরিনা বলে, 'তাহলে মনসুর গাজি আমার জন্যে গলায়ে দড়ি দিয়ে মরবে।'

'আর তুই?'

'আমি? আমি গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরব!'

'মরণ! পুচ্‌কে মেয়ে! পীরিত শিখেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঝাঁটার বাড়ি দোব। সিঁড়ির তলায় সেদিন তোরা কি করছিলি শুনি? ওসব বিয়ের আগে করতে নেই। 'গোনা' (পাপ) হয়।'

'একালে 'গোনো'টা পাতলা হয়ে গেছে মা। তোমাদের সময়ে ঘন কালো

ছিল। এই পাতলা রঙটা আবার বিশ বছর পরে একেবারে ফরসা হয়ে যাবে।'

'পালা হতভাগী, মায়ের সঙ্গে কথা বলছিস, না নানী-দিদির সঙ্গে?'

'মা মেয়েতে যা কথা হয় মা, বাপ-ছেলেতে তার শতাংশের একাংশ হয় না। বোনে বোনে যা হয়, ভায়ে ভায়ে হয় না—কেন হয় না মা?'

'আমি জানি না। ওটা স্বভাব। ভালবাসার রকম আছে। যা, জনেদের মুড়ি দিয়ে আয়। তোর দাদিকে খেতে ডাক। দেরি হলে টিপে টিপে কথা শোনাবে।'

আলীমদ্দি বাড়িতে এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করলে: 'কই গো, 'খয়রুলের বউ' (বউ-মা), দেখ, কতখানি হাত কেটে ফেলন্থ, ঝুঝিয়ে শালা 'লউ' (রক্ত) বেরুচ্ছে!'

হালিমা ছুটে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে বললে, 'ওমা! ই-কি কাণ্ড করেছ! হুঁস করে এট্টু কাজ করবে তো। দাঁড়াও, চুন দিয়ে বেঁধে দিই।'

বুড়ী ছুটে এসে আঙুলটা টিপে ধরে নিজের আঁচলে রক্ত মুছে একাকার করে বলতে থাকে, 'হাঁ র‍্যা হতভাগা, তোকে কে ধারালো কাটারী লিয়ে পাকা হাড় কামিনী-কাঠ কেটে গরুর খুঁটো বানাতেই হবে বলে মাথার দিব্যি দিয়েছ্যালো! জনেদের বললে কি তারা করে দিতে পাত্তুনি?'

খয়রুল স্নান করে এসে বাপের কাটা হাতে চুন লাগাতে যেতে দেখে বললে, 'না মা, চুন দিও না। দাঁড়াও আমি ডেটল দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।'

হাতটা বেঁধে দেবার পরই আলীমদ্দি চলে গেল জনেদের কাছে। স্থির হয়ে একটু বসে থাকবার বান্দা সে নয়। রাত দুটোর সময় যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তো টর্চ হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে গরুর গোয়ালে যাবে। খড়ভুষি আছে কিনা দেখবে। কুকুর ডাকলেই টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখবে চোর-ডাকাত কেউ এলো কিনা।

দুপুরে জনেরা চলে গেলে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে জনেদের হিসেব লেখে সে।

পাড়ার তিনটে সখির সঙ্গে সেরিনা ক্যারাম খেলে কোলাহল করতে করতে। হালিমা কতক্ষণ রেডিও ঘোরায়। তারপর স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে থাকে।

বিকালে জনেরা এসে খড়ের তড়পা বেঁধে ফেললে আলীমদ্দি নিজেই 'টাল' দিয়ে দেয়। জনেরা কুলোর হাওয়া মেরে 'ধান সারতে' থাকলে আলীমদ্দি বলে, 'কি করে তোদের তিন টাকা জনের দাম দোব বল? স্যায়দালি দশ পণ বিচালী

ঝেড়েছিস মোটে। মাহিন্দ বারো পণ। শুধু পূর্ণ সরদার এক কাহন বিচালী ঝেড়েছে। সাতবার ঝোঁক মারবি সব। আর এ বছর ধান যা হল গায়ে জ্বর! বিঘে প্রতি ছ'মণ হলে কপাল মনে করব! দু'বার ঝড়-পানিতে পচে-গলে গেল। তবু সাতবিঘেটাতে দু'লরী ধাপার ময়লা সার দেওয়া হয়েছিল বলে ফলটা এট্টু ভাল হয়েছে যা। খড়ের দাম এ বছর আগুন হবে। কত পোয়াল হয়েছে দেখ না! গাঁট থেকে সব ছেড়ে গেছে। আর ঐ কালো পানি-ডোবা দাগঅলা খড় গরু খাবে কি? আমার গরুগুলো শালা সৌখিন জীব হয়ে গেছে—খইল-ভুষি না দিলে 'ম্যাচলা'য় মুখ ঠেকাবেই না।'

জনেদের ধান 'সারা' হলে একজন বলে, 'আলীমদ্দি চাচা, ধান মাপবে কে? তোমার তো হাত কাটা?'

'স্যায়দালি না হয় পূর্ণ সরদার মাপ।'

স্যায়দালি বলে, 'মোর বড্ড পিঠের চাল কনকন করে। হেঁটো ধরে যায়। পূর্ণ তুই মাপ ভাই।'

পূর্ণ ধান মাপতে বসে। পাঁচ-সেরি পাল্লা নিয়ে। বস্তায় করে ধান ধরে নিয়ে জনেরা গোলায় ঢেলে দিয়ে আসে। রাত হয় কাজ শেষ হতে।

দুলালী বুড়ী জনেদের ঘটিভরা গরম চা এনে খাওয়ায়। তেলমাখানো মুড়ি খেতে দেয়।

খয়রুল ফিরে আসে, সঙ্গে মনসুর। তার মামাতো ভাই। যার সঙ্গে সেরিনার বিয়ে হবার কথা আছে।

সালাম করতে হেসে প্রতি-সালাম করলে আলীমদ্দি। কিন্তু হঠাৎ সে যেন চমকে গেল। মনসুরের কথার মধ্যে কেমন যেন জড়তা। অস্বাভাবিক হাসি বা তোয়াজ করার ভঙ্গি। মদ গিলেছে নাকি?

খয়রুল বললে, 'বাইরে বস মনসুর। আসছি আমি।'

'বাইরে কেন 'বাওয়া'!'

'প্লিজ! বাইরে মানে আমার পড়ার ঘরে। তুই মাল টেনেছিস, মা-দিদা-বাবাজী জানলে মুশকিল হবে!'

'ও স্যরি! 'ধাম্মিক'রা 'হেট' করবে! বেহেস্তে গেলে সুরা মিলবে কিন্তু দুনিয়াতেই শালা অচল!'

খয়রুল বাড়ির মধ্যে এসে ডাকলে, 'মা!'

হালিমা ছেলের ঘরে ঢুকল।

খয়রুল বললে, 'মনসুর এসেছে। বাইরের ঘরে তাকে বসতে বলে এসেছি।'

'কেন, বাইরে কেন বাবা?'

'ওকে ভূতে ধরেছে।'

সেরিনা কাছে এলে তার বেণীটা ধরে পাক দিয়ে আদর করে খয়রুল বলে, 'মনসুর মদ খেয়ে এসেছে। বলে, অন্তরে অনেক জ্বালা। বাবা বুড়ো বয়েসে নিকে করে আনলে, তার তিনটে ছেলে, শরীক ভাগ করে দিচ্ছে। খুব ঝগড়া করেছে। ওকে নাকি বলেছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।'

'তা মদ খেতে গেল কেন?'

'ও খায় তো!'

'তা কি তুই কোনোদিন বলেছিলি?'

'ভেবেছিলুম শুধরে ফেলতে পারব। ও যে এখন এখানে কিছুদিন থাকতে চায়!'

সেরিনা একটা হ্যারিকেন নিয়ে বাইরের পড়ার ঘরে এলে মনসুর বলে ওঠে, 'হ্যালো, ডার্লিং! হাউ নাইস! বিউটি!'

'কি খেয়েছ?' কড়া স্বরে শুধোয় সেরিনা।

'এই মাইরি, এট্টু মাল টেনে ফেলেছি। কিছুতেই খাব না, শালা!'

'বাপ ভীষণ বিগড়ে গেছে। হারাম জিনিস খাও তুমি! তুমি এক্ষুণি চলে যাও। আর আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।'

সেরিনা চোখ মুছতে লাগল এসে গোলার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আলীমদ্দি একটা উচিত কথা শুনিয়ে ছোঁড়াটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে বলে ভেতর থেকে বাইরে আসতে গিয়ে হঠাৎ মেয়েকে গোলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখলে। সে ইতস্তত করলে একটু। ভাবতে লাগল। তারপর খয়রুলের পড়ার ঘরের দিকে তাকে আসতে দেখেই মনসুর হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দিলে। আলীমদ্দি নীরবে সেই ঘরের দোরে তালা-চাবি এঁটে দিয়ে গেল।

সারারাত আর কেউ এল না। অন্ধকার। মশা। শীত। চুরি করে একটা কম্বল জানলা গলিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিল সেরিনা—কিন্তু আলীমদ্দির তা চোখে পড়ে যেতে কম্বলটা কেড়ে নিলে।

আলীমদ্দি বললে, 'মরচে ধরা লোহাকে পুড়িয়ে পিটে অস্তর তৈরি করতে হয় —যদি খাঁটি অস্তর হয় তবে এখানেই থাকবে—অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।'

বাপের কথা শুনে সারা মুখটা যেন আলো হয়ে গেল সেরিনার।

বেদেনীর ফাঁদ

'বাত ভাল, ব্যথা ভাল, কানের পুঁজ ভাল—।'

দুটো বেদেনী মেয়ে দীর্ঘ লয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে পাড়ার পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু দূরের সামনের মাঠে তারা তাঁবু গেড়েছে ক'দিন হল।

আনন্দ দেখলে মেয়ে দুটির মধ্যে একটির গড়ন চমৎকার। চোখ দুটো বড় বড়। কালো শামলা-রঙ। গায়ে লাল খাটো একটা কুর্তো। নাভির গর্ত সমেত সুডৌল পেটটা বেরিয়ে আছে। পরনে একটা ঘাগরা। বুকের ওপর দিয়ে কোমরে জড়ানো একটা পাতলা চেলি। অন্য মেয়েটির দেহ খাটো—ঈষৎ পাতলাটে। লালচে কটা চুল। তার পরনে একখানা খাটো ধুতি। গায়ে ব্লাউজ নেই। দুটো ডাণ্ডার মধ্যে গলানো দু'জনের পিঠের দিকে দুটো করে তাল-পাতার খুঁড়ি। তার মধ্যে ওদের শিকড়-বাকড়, ওষুধপত্তর।

আনন্দ বললে, 'এই, আমাদের বাড়ি যাবি? আমার মায়ের পায়ে বাত আছে, সারিয়ে দিবি?'

'হাঁ বাবু, কেনো নাই যাবে? তু কেতনা পয়সা দিবি?' যৌবনপ্রমত্তা বেদেনীর চোখের তারায় যাদু আছে। সে নাগিনীর মতন হেলে-দুলে কোমর বাঁকায়।

আনন্দ চাষীর ছেলে হলেও সভ্য শান্ত, লেখাপড়া জানে। দেখতেও তাকে ভাল। যুবতী বেদেনীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে লোলুপতার নেশা দেখে আনন্দ বুঝতে পারে কম পয়সাতেই ও যাবে। তাই বলে, 'তুই কত নিবি তাই বল!'

'এক রুপিয়া লিব।'

'তোকে নিয়ে—যা শালী!' আনন্দ চলে আসবার ভান করে।

'গালি না দিবি বাবু! ভদ্দর আদমী আছিস তু? হামারে লিবি তো দু'রুপিয়া লাগবে, হাঁ!' বেদেনী রহস্যময়ীর মতন চোখের হাসি, মুখের হাসি মিশিয়ে যেন আহ্বান জানালে আনন্দকে।

বললে, 'তবে আয়। মায়ের বাত সারাবি এক রুপিয়া পাবি আর তোর চেহারা দেখাবি আর এক রুপিয়া পাবি।' বেদেনী দুজন সঙ্গে সঙ্গে এল আনন্দর। বড়টাকে শুধোলে, 'তোর নাম কি?'

'হামার নাম ইংলি, অ্যার নাম বি আছে মুংলি।'

'ইংলি ! বেশ নাম। তোর সাদি হয়েছে ?'

'নাই বাবু। মরদ নাই।'

ওরা আনন্দর বাড়িতে এল। আনন্দ মাকে তার গেঁটে বাত দেখাতে বললে। তার মা দাওয়ায় পা মেলে বসতে ইংলি পা দুটো টিপে-টিপে দেখলে। আনন্দর মা সারদা দাসী উ-আ করে চেঁচাতে লাগল যন্ত্রণার জায়গায় হাত পড়লে।

ইংলি তার খুঙির মধ্যে থেকে একটা কালো মতন তেলের শিশি বার করে তেল ঢেলে মালিশ করতে লাগল আর তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব মন্তর আওড়াতে লাগল।

পাড়ার সমস্ত ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝিউড়িরা জুটেছিল বেদেনীদের দেখতে। আধঘণ্টা ধরে মালিশ করা আর মন্তর পড়ার পর সত্যাই নাকি বাতের উপশম হয়ে গেল সারদা দাসীর।

একটা মেয়ের কানের পুঁজও টেনে বার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলে। দুজনকে দুটো শিশিতে করে ওষুধ দিলে।

ইংলি বললে, 'হামারা লাচ দেখাব—তুরা পুইসা দিবি ? 'হাপু' খেনাব—পুইসা দিবি ?'

সবাই রাজি। সবাই মিলে আরো আট আনা পয়সা দেবে বললে।

তখন নাচ-গান শুরু হয়ে গেল দুজন বেদেনীর। পিঠে ছড়ি মারে আর একটু এগিয়ে যায় আবার পিছু হাঁটে। মাঝে মাঝে কোমর দোলায়। অশ্লীল ভঙ্গি করে। সায়া তোলে খানিকটা। সবাই তখন খিলখিল করে হাসে।

আনন্দ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে জানালা দিয়ে সেই নাচ দেখছিল। তারা হাপু খেলাচ্ছিল অদ্ভুতভাবে ডিগবাজি খেয়ে। দুজনে জড়াজড়ি করে। তাদের অশ্লীল নাচ দেখে সারদা দাসী বললে, 'থাক্ বাবা, তোদের উড়োন খ্যামটা রাখ !'

কিন্তু বেদেনীরা এবার গান ধরলে।—

'রাংলি গাঙ কেরায়া ভাঁটি
আদমী বন্‌শী বজায়া রে
কানাহি তুহার ডেরা কাঁহা রে !···
দি-দি দি-দি হুম তারিয়া হুম তা
ছা-ঘিন ঘিন খাড়ুয়া ঝুমঝুমা···

নাগ টিলা নাগ টিলা
লখিন্দুরে জান নিলা
বেউলা রাণ্ডী আঁসু গিরা রে…
রাংলি গাঙ…বন্‌শী বাজায়া রে…'

ওদের নাচ থামল যখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সারদা একটা নারকোল, এক সরা চাল, দুটো আলু, একটা সুপুরি, চারটে পান আর একটা টাকা দিলে। ওরা খুব খুশী। পুঁজ সারানো মেয়েটির জন্যে তার মা একটা টাকা আর এক খোরা মুড়ি দিলে। নাচের জন্যে আট আনা পয়সা দিলে সবাই চাঁদা তুলে।

দাওয়ায় বসে সারদা দাসীর পা দুটো আবার দেখবার ছল করে ঘরের মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আছে দেখছিল। পান সেজে দিতে ওরা খেলে। তারপর ওরা চলে গেল।

হাতে টর্চ নিয়ে আনন্দও ওদের পিছু নিলে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। সন্ধ্যার মুখেই থালার মতন চাঁদ উঠছে পূব-আকাশ আলো করে।

ওরা মাঠের পথে নামল। দূরে মাঠের মাঝখানে ওদের তাঁবু। মশালের আলো জ্বলছে সেখানে। ওদের গায়ে টর্চ মারলে আনন্দ। ইংলি ফিরে তাকালে। আনন্দ ডাকলে তার নাম ধরে।

তাঁরা দাঁড়িয়ে গেল।

কাছে এল আনন্দ। হঠাৎ সে কিছু বলতে পারলে না। ইংলি তার হাত ধরলে। বললে, 'আয় বাবু ডেরামে।'

'তোর সাদা গোঁফঅলা বাপ আছে, তাকে আমার ভয় করে!'

ইংলি আর মুংলি দুজনেই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। ইংলি বললে, 'হামার বাপ উ বহুত ভালা আদমী আছে রে বাবু। চল্ চল্—চল্ না।'

ওদের মনে কি ছিল কে জানে, ইংলি আমনধানের শূন্য ক্ষেতের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে আনন্দর গলায় একটা হাত বেড় দিয়ে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল। মুংলি চলেছে এগিয়ে এগিয়ে। তার হাতে বোঝা। দুটো খুঙি, ইংলির চেলিতে বাঁধা চাল, নারকোল, আলু। ইংলি শুধু একটা সায়া আর খাটো কুর্তা পরে আছে।

আনন্দ উত্তেজিত হয়। ওর শরীরে হাত দেয়। ইংলি বলে, 'রুপিয়া দে।'

আনন্দ পকেট থেকে আর একটা টাকা দেয়।

ইংলি তখন দাঁড়ায়। চাঁদের দিকে মুখ করে। আনন্দকে হাত দিয়ে খানিকটা পূবদিকে পেছিয়ে দিয়ে তাকে শরীর দেখায়।

কিন্তু এর বেশি নয়। ইংলি বলে, 'যা, পালা বাবু! কুত্তা হাঁকরে দিব।' তারপর হাসলে ইংলি।

তবু পায়ে পায়ে গেল আনন্দ ওদের তাঁবুর কাছে। দেহের দুরন্ত এক আকর্ষণ তার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে।

একটা মশাল জ্বলছে। গোটাছয়েক শুয়োর শুয়ে পড়ে আছে গায়ে গায়ে। দুটো মোষ। একটা কুকুর। দুটো ভেড়া। কতকগুলো হাঁস-মুরগী একটা খাঁচার মধ্যে। কয়েকটা গিনিপিগ। একটা মুখ-কোঁচকানো অথর্ব বুড়ী হুঁকোয় তামুক টানছে। গোঁফ-সাদা গলায় পেতলের তক্তি-বাঁধা খাটো খাটো মোটা মজবুত চেহারার বুড়োটা ইংলিদের আনা চাল নারকোলগুলো খুলে দেখে খুশী হয়। মুড়িগুলো খেতে আরম্ভ করে গাল গাল করে সকলে। আর একটা মাঝারী বয়সের লোক—তার দুটো কানে চারটে মাক্‌ড়ি—সে একটা বঁটি পেতে বসে ইঁদুর না কি যেন কাটছে। তার গালে মুড়ি দেয় মুংলি।

আর একটা বাচ্চা ছেলে নারকোলের মালায় করে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চুপ করে একটা ভেড়িতে বসে রইল আনন্দ। শুধু সাপের ভয় তার। বৈশাখ মাস। সারাদিন গরমের পর এই সন্ধ্যার বাতাসে সাপগুলো বেরুবে এবার।

কুকুরটা ডেকে উঠল আনন্দকে লক্ষ্য করে।

ছুটে আসতে লাগল। ইংলি আতু-আতু শব্দ করে কুকুরটাকে ডেকে নিলে। ইংলি তা হলে জানে আনন্দ এসেছে। তখন আনন্দ পায়ে-পায়ে ওদের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। কী আর করবে বেটারা।

ওরা সবাই একচোখ দেখলে।

ইংলি তার বাপ আর দাদীকে বললে যে, ওদেরই বাড়ি থেকে চাল আর টাকা এনেছে। বাবু খুব ভাল লোক। আর কি সব যেন ফুসফাস করে যুক্তি করলে।...

বুড়োটা বসতে বললে। বসে পড়ল আনন্দ। সিগারেট দিলে তাকে। বুড়ী একটা চাইলে। তারপর ইংলি-মুংলিও নিলে। যে লোকটা ঝলসানো ইঁদুরের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কুঁচোচ্ছিল তাকে মুংলি সিগারেট খাওয়াতে লাগল চিৎ হয়ে পড়ে। বোঝা গেল, লোকটা মুংলির স্বামী। আর বাচ্চা ছেলেটা ওদেরই।

ইংলির বোধহয় স্বামী নেই।

ওরা ভাত রান্না করলে মাটির ঢেলার ওপরে মাটির হাঁড়ি বসিয়ে। তারপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বসিয়ে তাতে একটু সরষের তেল ঢেলে, পিঁয়াজ লঙ্কা কুচোনো আর নুন দিয়ে ইঁদুরের মাংস কষতে লাগল ইংলি। আশ্চর্য! কলকল করে দুটো ইঁদুরের মাংসের তেল বেরিয়ে পাত্রটা ভরে গেল। তারপর তাতে আলু কুঁচিয়ে ফেলে দিলে। নারকোলটা ভেঙে একটা যন্ত্র দিয়ে কুরে কুরে সেই তরকারীর মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর দুটো শশা। দুটো কাঁচকলা। তারপর জল ঢেলে দিলে। তরকারী ফুটতে লাগল। উনুনের আগুনে ইংলির খোলা সুডৌল বুক আর পুরন্ত মুখ দেখা যাচ্ছিল। সে বার বার আনন্দর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। হেসে হেসে কটাক্ষ হানছিল। আবার সকলকে সিগারেট দিলে আনন্দ। তারা খুব খুশী। বুড়ী দাড়ি ধরে চুমো খেলে। তার হাতে একটা সিকি দিলে আনন্দ। বুড়ী তামুক কিনবে, বেবাক খুশী।

তরকারী রান্না হলে সেগুলো সবই ভাতের মধ্যে ঢেলে দিলে ইংলি। তাদের তাহলে পোলাও রান্না হচ্ছে! ভাতের মধ্যে আবার ডাল দিয়েছিল আগে।

বুড়ো বললে, 'হামারা বেদিয়া আছে বাবু। ঘর নাই, ডেরা নাই। সিথল গাঁয়ে হামাদের আদি বাস ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে হামারা ভোজবিদ্যা দেখাতুম। এখন হামারা দ্যাশে দ্যাশে ঘুরি। মহিষ শুয়ার চরাই, বিকৃরি করে দিই। বাত, বেদনা, সাপে কাটার ওষুধ বিকৃরি করি। মাইয়ার সাদি দিলাম, সাপে কাটল উ বি মারা গেল। ও বি জামাই আছে—মুংলির বর। শালা, কানে কালা আছে। ও বুঢ়টী হামার মায়ি আছে। এ লেড়কা মুংলির।'

এরা ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে পালায় বলে শুনেছে আনন্দ। কিন্তু সেকথা মনে হলেও কিছু আর বললে না। বললে, 'তোমরা সাপ খাও?'

'হাঁ বাবু, ঢাঁড়া-সাপ খাই। ব্যাঙ, চুয়া মানে ইঁদুর, গোসাপ, খরগোস, বেজি, কাঠবেরালী, ভাম, বাদুড়, পাখী—ইসব শালা হামারা খাই।'

একাঙ্গীর গন্ধ পেলে আনন্দ। খানিকটা নিয়ে তাদের 'পলান্নে'র (পল—মাংস। সংস্কৃত) উপর ছড়িয়ে দিলে। তারপর ডোবা থেকে ইংলি আর মুংলি চান করে এল। কাপড় ছেড়ে রেখেই চান করে এসেছে, কেননা আগের সায়া কুর্তোই ইংলি আর মুংলি পরেছে আবার।

ওরা খেতে বসে গেল। অনেকটা করে খায় সবাই।

ইংলি খেতে খেতে বললে, 'আয় বাবু—তু খাবি আয়।'

আনন্দ হাসলে। বললে, 'তোমরা খাও।'

ওদের খাওয়া হতে পান সাজতে বসল।

ইংলির বাবা শুয়ে পড়ল। শুয়ারগুলো মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে। বুড়ীও শুয়ে পড়ল। তাঁবুর মধ্যে শুল মুংলি আর তার বর আর ছেলেটা। একটা খেজুরপাতার চটি পেতে বাইরে বসল বেদেনী ইংলি একটা তালপাতার বিরাট ছাতার নিচে। আনন্দকে ডাকলে, 'আয় বাবু বস্থ, হামার কাছে।'

আনন্দ চটিটাতে চেপে বসল। আস্তে শুধোলে, 'তোমার বাপ কিছু বলবে না?'

'না। হামারা স্বাধীন আছি। তু হামার বন্‌শী শুনবি বাবু?' বলে তাঁবুর মধ্যে থেকে একটা আড়বাঁশি বার করে এনে চাঁদের দিকে মুখ করে বসে পিঠে চুল এলিয়ে বাঁশি বাজাতে লাগল ইংলি।

অপূর্ব সে বাঁশির সুর! কি তার কথা!…তার বাঁশির সুরে সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল। সুরের মধ্যে বেদনার মূর্ছনা যেন গভীর। স্বামীর কথা কি ভোলেনি ইংলি!

চাদ যখন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে তখন ইংলি আনন্দর হাত ধরে সোজা মাঠ পার হয়ে একটা জাঙালের এপারে চলে এল। তারপর আনন্দকে ধরল নাগিনী বেদেনী আর মেতে উঠল যেন মাতঙ্গিনীর মতন। ভোর পর্যন্ত তাকে যেন পাগল করে রেখে দিলে। বচের মতন কি একটা শিকড় তাকে খাইয়ে দিয়েছিল ইংলি, তারপর যেন নেশা ধরে গেল!…হঠাৎ ইংলির বাপ হাঁক মারতে ইংলি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল তাদের তাঁবুর দিকে। বললে, 'বাবু, মনে রাখিস।'

চাদ যখন ডুবু-ডুবু—একটু পরেই সকাল হবে, আনন্দ বাড়িতে ফিরে মায়ের কান্না শুনে বোকা বনে গেল।

সারদা বললে, 'ওরে বাবা, তুই সারারাত কোথায় ছিলি? ঘরে সিঁদ দিয়ে সব সোনাদানা টাকাকড়ি চোরে নিয়ে গেছে!'

ঘর দেখে গাল হাঁ হয়ে গেল আনন্দর।

সে তখনি মাঠের দিকে পা বাড়ালে আবার।

গিয়ে দেখলে বেদেরা সেখানে নেই। গত রাতের রান্নার উনুন পড়ে আছে। পড়ে আছে কলাপাতা আর মহিষ-শূকরের নাদি।

হঠাৎ তার সন্দেহ হল বেদেদের। ইংলি কেন তাকে সরিয়ে রেখেছিল

অতক্ষণ? তখন কি মুংলি, তার বর আর ইংলির বাপ এসে সিঁদ কেটে মাল-জাল টাকা-সোনা বার করে নিয়ে গেছে?

কোন্ দিকে তারা গেছে?

ইংলির দুরন্ত যৌবনের ফাঁদে পড়ে তাহলে কি আনন্দকে সব হারাতে হল! চোখের হাসিতে কেন কেউটে খেলা করছিল বেদেনীর এখন বুঝতে পারলে আনন্দ। তারা কোন্ দিগন্তের ওপারে চলে গেছে এখন কে জানে!

গওশল পালোয়ান

সৃষ্টিবৈচিত্র্যে খোদাতায়ালার রসবোধের তুলনা হয় না। গওশল পালোয়ানকে মনে হয় তিনি নিজের হাতেই গড়েছিলেন একটু উদার-হাতে—বেশি মাল-মশলা দিয়ে। গওশলের চেহারা, 'লাখে না মিলয়ে এক'! লম্বায় সে প্রায় সাত ফুট, চওড়াতেও ফুট পাঁচেকের কম নয়। ন-গজ কাপড় লাগে তার জামা করতে। সাত গজ কাপড়ের লুঙ্গি। পায়ের জুতো তার কোথাও পাওয়া যায় না। মুচির কাছে অর্ডার দিয়ে একবার দুখানা নিউকাট জুতো তৈরি করিয়েছিল, খড়ের নৌকোর মতন বড়—দু'মাসেই তা ফেঁসে গেল ট্যানিং করা ভাগলপুরী গাইগরুর চামড়া হওয়া সত্ত্বেও—বিনা নজরানায় প্রায় প্রতিদিন তাপ্পি মেরে মেরে মুচির বাপের নাম ভোলালেও বচ্ছর দুই তবু তো তা চলেছিল নিতান্ত চামড়ার জিনিস বলে, কিন্তু মেয়েমানুষ একটাও টিকল না গওশলের কপালে, বারসাতেক পবিত্র কলেমা পাঠ করে সাদী করা সাত-সাতটা ডাগড়াই যুবতী মুসলমান রমণীকে ঘরে আনলেও।

মাত্তর তিন দিন কেঁদে-কেটে ঘর করে কনে বউগুলো সেই যে তাকে 'বাপ' বলে পালায় আর আসে না। গওশল পালোয়ান হতে পারে, একশোজন মানুষকে সে একাই একটা লাঠি নিয়ে পায়তারা কষে দৌড় করাতে পারে বটে, কিন্তু মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কি সে লড়াই করবে? আর মুসলমান মেয়েগুলো বড় ধড়িবাজ! পুরুষরা মেয়েদের তালাক দিতে পারে শরিয়তের একচেটিয়া অধিকারে, কিন্তু বেশরিয়তি ফতোয়ায় মেয়েরাও তালাকের অধিকার বা হক আদায় করতে পারে—সোজা সোয়ামীকে 'বাপ' বলে দিলে—বাস সব শরিয়ত, আইন, ফতোয়া

ভুগুল! মানে তালাক হয়ে গেল! আর তার সঙ্গে ঘর-সংসার চলবে না!

গওশল পালোয়ানের দাপট সহ্য করতে না পেরে সাত-সাতটা ভর-যুবতী মেয়ে নাকি তাকে 'ধরম বাপ' বলে পালিয়ে গেছে।

তাই গওশল একক, নির্বংশ।

চারটে পাঞ্জাবী গাইগরু পোষে সে, একটা রাখাল রেখেছে। গাইগরুর দুধ থেকেই তার ভরণ-পোষণ হয়ে যায়। তাছাড়া বাইরের উপায় আছে। দাঙ্গা, জমি দখল, ক্ষমতার প্রদর্শনী, রাতের মোহিনীদের থেকে প্যালা-পানি ইত্যাদি পায় সে।

দু'সেলের টর্চের মতন বড় পিতলের 'সাঁপী' বাঁধানো অর্ডারী কল্‌কেতে এক ভরি গাঁজা ধরিয়ে সশিষ্য মজলিস বসিয়ে হুগলী নদীর তীরে তিন ফটকের পুলের পাশে তিন কাঠা জায়গা জুড়ে বসে কোল্‌জে-ফাটানো মিনিটখানেক চোঁচা দম মারে গওশল—আর তারপর হু হু করে নীলচে আঁশটে কটুগন্ধ ধোঁয়া ছাড়ে যখন, নদীর নৌকোগুলো আড়াল হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত শিষ্যদের চোখ থেকে। সাধারণ সরু কল্‌কে যতই পাকা পোড়ামাটির হোক না কেন, গওশল বাবা গুন্‌জের মল্লিকের নাম নিয়ে মাত্তর একটা দম মারলেই চড়াং করে ফেটে যায়! গাঁজা পবিত্র শৈব নেশা, একশো টাকার নোট পুড়িয়ে সেই নেশায় অগ্নিসংযোগ করতেও নাকি কসুর করে নি গওশল পালোয়ান—এমনি দিলদার মানুষ সে।

দক্ষিণে খালের পারে বেশ্যাপটি। তার সামনে হুগলী নদীর বেটমনির রাস্তার দু-বগলে দোকান-'পাসারী' ফেরি ঘাট—গরাণ কাঠের আড়ত—উত্তরে বিড়লা কোম্পানীর বিরাট চটকল, লিনোলিয়াম, স্টেবল ফাইব্রো, অ্যাসিটিলিন প্লাণ্ট, অকসিজেন প্লাণ্ট, ক্যালসিয়াম কারবাইড ফ্যাকটরী—পাওয়ার হাউস। পশ্চিমে নদী। পূব দিকে কিছু দূরে কারখানার বাবুদের স্টাফ-কোয়ার্টার। শিবমন্দির। সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং—ঢং ঢং। বনঝামা, নলখাগড়া, হরকোচ, গেঁয়ো, তেকাঁটালের বনঝোপ খালের ধারে। ফেরি নৌকোর মাঝিরা দরিয়ার ওপর থেকে কারখানা-শ্রমিকদের পারাপারের উদ্দেশে চিৎকার করে 'যাবে—বাগাণ্ডা—বুড়ুল—নলবাড়ি...' তাদের দীর্ঘ লয়ের স্বর বাতাসে ভেঙে ভেঙে যায়। রাতের মোহিনীরা মুখে ছাই-পাশ মেখে যে যার খুপরির দোরে দোরে লম্ফ জেলে বসে আছে। কেউ বা শিকারের ধান্ধায় অনর্থক চা-দোকানগুলোর হ্যাসাকের আলোর সামনে এসে বিড়ি পান বা চা খাবার অছিলায় ঘোরাফেরা করছে। শনিবার হলে কারখানার 'হপ্তা'-পাওয়া মানুষদের ভিড় হয়। আম, কাঁটাল, ইলিশ, আনাজ

কেনে তারা। কেউ কেউ একটু 'ল্যাশা' করে, তাড়ি-মদ খায় তারপর মোহিনীরা 'বাঘের খেলা' দেখাবার জন্যে হাত ধরে টানলেই ভগবানের নাম শরণ করে নরকের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে। ভগবানের নাম করতেই হয়। কার সখের 'রাঢ়ী', হঠাৎ সোডার বোতল মাথায় ফাটলেই হল! তাই অন্ধকারেই ইষ্ট নাম জপার প্রয়োজন হয় বেশি।

তবে গওশল পালোয়ানকে যে বেটা কিছু 'চোকারা' বা ভেট দিয়ে যায় তার বিপদ কম।

অন্ধকারে গওশল বসে থাকে বটে, কিন্তু তার ভীমের মতন বিশাল পাটল চক্ষু সব দেখতে পায়। কিছু গণ্ডগোল বাধলেই গওশল হাঁক মারে—'কোন্ শালা রে' ···বাস্ সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু আড়াই-ফুটে বামন ভজহরি গায়েন গওশল পালোয়ানকে কেয়ার করে না! সে তার গোপালভাঁড়। নাকটা উঁচু, কান দুটো বড় বড়। পিঠে একটু কুঁজ। সে বলে, 'শালা, তুই পালোয়ান হলে কি হবে, আমার মতন এমনি ছোট হতে পারবি? তোর অতবড় 'শরীল'কে কুঁকড়ে বেঁকে-দুমড়েও আমার মতন বামন-অবতার হতে পারবি নি। একবার আমার মাথায় চাঁটি মারলি 'ভগবান তোকে শালা ঘোড়ার আণ্ডা থেকে পয়দা করেছে নাকি রে' বলে, আর আমি অপমানে রাগে তোর কাপড় ধরে ঝুলে পড়তেই তুই শালা আমাকে একটা ঘণ্টার মতন এক হাতে শূন্যে তুলে ধরলি—সেই আমার আকাশে ওঠা—তারপর তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি তিন ফট্‌কে পোলের জলে—জল শালা ভীমবেগে ছুটেছে। আমি এসে পোলের পাল্লার কাঠে পড়নু। একটা বালা ধরে ঝুলে রইনু। তখন ওপরে সব চেঁচামেচি। গওশল তুই নিজেই ছুটোছুটি করলি। কেউ দেখছে জলের তোড়ে পোলের ওপারে বেরিয়ে গেল কিনা! তুইও কেঁদে ফেললি। তখন আমার যেন প্রাণে মায়া হল তোর জন্যে! লোকটা সখ করে আমার মতন মিনি-দামের লোককে ফেলে দিয়ে মজা করেছে বটে কিন্তু আমার কি উচিত ওর মতন মহারাজ ভীমসেনকে কাঁদানো। তাই 'চিৎকার' করে সাড়া দিনু, 'ভজহরি এখানে! ভজহরি বামন অবতার—তাকে মারা যায় না।'

গওশল হেসে উঠল। ভজহরির পায়ের ধুলো নিয়ে তার মাথাতেই বুলিয়ে দিয়ে বললে, সোনা আমার! তোকে তখন একটা বাঁশ দিয়ে তবে তুলি। তাও আবার মজা শোন। বাঁশ কোথা পাই, মনে পড়ে গেল সরলা বেউশ্যের উঠোনে কাপড় শুকোবার জন্যে একটা বাঁশের ভারা আছে বটে, ছুটে যেয়ে বাঁশ খুলতেই

ওদের ঘরে ঘরে যত হাঁড়ি-মারা হুনো বেড়ালরা ছিল শালা আমাকে দেখেই সবাই বেরিয়ে পড়ে মার খেঁচে দৌড়! তারপর মেয়েগুলো সবাই এসে অভিযোগ করলে, লোকগুলো সব পালাল—এবার টাকা দেবে কে? তখন এই 'সোনা'কে দেখিয়ে বললুম, এই যে, একে নিয়ে যা। তারা তখন খিল-খিল করে কী হাসি! সরলা ওকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। শরীর গরম করে দিলে। ওকে ওরা সবাই পেতে চায় অতিথিরা চলে গেলে অবসর রাত্তিরে। গেঁড়া গুটকে লোকের ক্ষ্যামতা নাকি দেখার মতো।

গওশলের গা-গতর ডলছিল জবেদ আলী—পাতলা তালপাতার সেপাই—মাথায় ফুট পাচেক—সে গায়ের জোরে ঘুঁষি-কিল মারছিল কিন্তু গওশলের কিছুই হচ্ছিল না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় যখন গতর বেশি কামড়ায় তখন সে শুয়ে পড়ে আর সব্বাই তার গায়ে চেপে মাড়ায় চটকায়, এক চড়ের খদ্দের নয়, সামান্য টুনকুচি পাখি জবেদ আলী তার কি করবে!

চা আসছিল। গাঁজা চলছিল। চাকার মতন গোলাকার ভুঁড়িদার চেহারার একটা লোক এসে বললে, 'গওশল সাহেব, আপনাকে কি আজ রাত্তিরে পাওয়া যাবে?'

সবাই তখন চুপচাপ।

গওশল মাথার উড়ুনীর পক্কড়টা খুলে ফেলে গম্ভীর মেজাজে বলে, 'কোথায়, কতদূর, কি ব্যাপার?'

লোকটা উবু হয়ে বসল। হাতেব চারটে আঙুলে সোনার আংটি। মালদার লোক মনে হয়।

লোকটা বললে, 'আমার দোতলা পাকা-বাড়ি। ভগবানের আশীর্বাদে অবস্থা খারাপ নয়। আমার বাড়িতে আজ রাত্রে নাকি ডাকাত পড়বার সঠিক যুক্তিযাক্তা হয়েছে। ডাকাত দলের কথাবার্তা যে চা-দোকানে গোপনে চলে তার পাশের পঞ্চানন্দের চাতালের বেদীতে পড়ে ঘুমোচ্ছিল একটা ভিখারী। সে একসময় জেগে যায়। কান পেতে তাদের কথা শোনে। তারা দোকানের মধ্যে মদ খায়। ভিখারীটি পরদিন সকালে এসে আমাকে সব জানায়। বলে, তারা বলেছে বোশেখ মাসের আট তারিখ রাত দুটোর সময়। দশ জায়গার দশজন অমুক মাঠে মিট্ করবে। বন্দুক থাকবে একখানা। বলেছে, বামুনগাছির দক্ষিণামোহন দত্তের বাড়িতে। আজ আট তারিখ। যেতেই হবে আপনাকে।'

ভজহরি বলে, 'ওরে বাপ! বন্দুক আছে—যেও না।'

জবেদ বলে, 'অচেনা জায়গা।'

আরো চারজন শিষ্য, তাদের প্রত্যেকেরই বউ নেই, কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, কেউ তোতলা, কেউ কালা, কেউ বেঢপ—সবাই যেন একটা বিশাল বটগাছের তলায় আশ্রয় পেয়েছে—তাদের নেশা ভাং খাবার মায় মোহিনীদের প্রসাদ পর্যন্ত এমনি এমনিতেই লাভ হয়, কাজেই বিপদে পড়ে সর্দার দেহত্যাগ করলে তখন আর কার জন্যে সবাই মিলে গলা জড়িয়ে কাঁদবে। তাই সব'ই বলে, না, তুমি যেও না। দিনের বেলার দাঙ্গা নয় যে মানুষদের দেখতে পাবে—সাত গেরাম তাড়া করে দিয়ে আসবে।'

এবাদত তোতলা বলে, 'শা-শা-শা-শা-লা, জী-জী-জী-জী-বন নি-নি-নিয়ে খে-খে-লা !

বদ্ধ কালা বিরিঞ্চিরাম ঢেঁকি, মনে করে লোকটা বুঝি নরক দর্শনার্থী, তাই সে বলে, 'রেণুবালা, 'ফাস কেলাস' মেয়ে আছে, যাকে বলে পানতুয়া !'

গওশল কিছুক্ষণ যেন কত কি ভাবলে। তারপর বললে, 'কত দেবেন ?'

'আপনি কত চান সেটা বলুন।' লোকটা হাত কচলাতে লাগল।

'আপনার সাধ্য কতখানি আমি কেমন করে জানব বলুন। যদি ডাকাতরা আপনার স্ত্রীকে নষ্ট করে, ছেলেমেয়েদের আছড়ে মেরে ফেলে, যদি সব টাকা সোনা লুটে নিয়ে যায় আর আপনাকে জবাই করে রেখে যায় তো তখন মিছে টাকার মায়া করে কি করবেন ?'

ভজহরি কি যেন বলতে যায়। গওশল এক তাড়া মারে, 'থাম্ শালা !'

লোকটা ভয় পায়। চা-দোকানের স্বল্প আলোয় তার বিহ্বল চোখ দুটো দেখতে পায় গওশল।

লোকটা, মানে দক্ষিণা দত্ত বলে, 'আপনি চলুন—একশো টাকা দেব।'

সশিষ্য সবাই তখন অট্টহাস্যে হঠাৎ ফেটে পড়ে গওশলরা। বলে, 'একশো টাকা! তাহলে তো কোম্পানীর মিলের তিনশো টাকায় বাঁধা মাইনের হেড দরোয়ান কিংবা বডিগার্ড থাকলেই পারতুম। আপনি পাঁচশো টাকা দিতে পারবেন ?'

'পাঁচ শো !'

'আজ্ঞে হাঁ। পাঁচশো। এক্ষুণি একশো দিতে হবে—পরে কাজ ফতে হলে বাকি চারশো। আমার জীবনটাও তো যেতে পারে ? জীবন গেলে আর আপনার টাকা লাগবে না।'

ভজহরি বলে, 'উনিই বা তখন আছেন কোথায় ?'

লোকটা বললে, 'দুশো কিংবা তিনশো টাকাতে হয় না ?'

চটে গেল গণ্ডশল। বললে, 'কিছু মনে করবেন না দত্ত মশায়, আপনি বোকা, তাই লেবু কচলাচ্ছেন। আপনারা যখন ব্যবসার সময় লোককে ঠকান, তাদের গলা ধারালো ছুরি দিয়ে কাটেন ? আমি চিংড়ি মাছ নয়, বেশি দর-দস্তুর করবেন না— আমার এককথা।'

তখন লোকটা একশো টাকার একখানা নোট বার করে দিলে। গণ্ডশল সেটাকে লম্বা করে পাকিয়ে কানের ওপরে গুঁজে নিয়ে 'আসছি' বলে চা-দোকানটাতে চলে গেল।

বেঞ্চিটাতে বসতেই সেটা মড় মড় করে উঠল। গণ্ডশল ট্যাকসির পা-দানির ওপরে দাঁড়ালেই অন্যদিকে 'ষটাই' লোক থাকুক, গাড়ি তার দিকে অবনতি স্বীকার করে। এক বিয়ের দিনে তার শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়েছিল সে। তার খাওয়া দেখতে লোক জুটে গিয়েছিল। চার ঝোড়া লুচি আর দু'মালসা মাংস—সের তিনেক মিষ্টি—তিন ভাঁড় দই খেয়ে তবে উঠল গণ্ডশল। ছোট জলের ঘড়াটা সে একহাতে ধরেই গলায় জল ঢাললে আর সব খেয়ে ফেললে ! নতুন ময়রা কেউ বসলেই সে তর্ক করে তার দোকানের সমস্ত মিষ্টি খেয়ে নেয় আর তাকে দু'মাসের মধ্যেই পাত্তাড়ি গুটোবার জন্যে উদারভাবে সহায়তা করে।

গণ্ডশল বসলে তার অধিকতর অনুরাগভাগিনী রেণুবালা (আসল নাম গহর-জান) এসে কানের ওপর থেকে নোটখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে দেখে। বিস্ময়ে বলে, 'কে দিলে গা ? একশো টাকা !'

গণ্ডশল বলে, 'তবে তোদের মতন পাঁচসিকে ? যা, এখন একটা শুভ কাজে বেরুচ্ছি, অপয়া মাগী সরে যা।'

তখন রেণুবালা হঠাৎ তার কোলের ওপরে বসে পড়ে। গণ্ডশল তাকে জোরে একটা চিমটি কেটে দিতেই সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। উরুতে, যেখানটাতে গণ্ডশল চিমটি কেটেছিল সে হাত বোলাতে থাকে। তখন গণ্ডশল ঠাট্টা করে তাকে একটা হালকা লাথি মারে। মেয়েটা পড়ে যায় দুটো বেঞ্চির মাঝখানে। আকাশ ফাটিয়ে হা হা করে হাসে তখন গণ্ডশল। লোকজনের হাতের চা পড়ে যায় রেণুবালার গায়ে-মুখে। মেয়েটা তখন ফণা তোলে। উঠে পড়ে নোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গালাগালি করে।

গণ্ডশল হাসে। পরে তেড়ে যাওয়ার একটা ভঙ্গি করতেই রেণুবালা তার

অন্ধকার কুটরীর দিকে পালিয়ে যায় দেহ দোলাতে দোলাতে।

গণ্ডশল দক্ষিণা দত্তের সঙ্গে চলে এসে ভাড়াটে নৌকোয় ওঠে। অন্ধকার নদী। কেউ কোনো কথা বলে না। জলের শব্দ। ঘণ্টাখানেক পরে তারা এসে একটা ঘাটে ওঠে। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে একটা গ্রাম তারপর বিরাট একটা মাঠ পার হয়ে এসে একখানা পাকাবড়ির সামনে দাঁড়ায়।

গণ্ডশল ভেতরে যায়। দেখেশুনে নেয়। ঘরদোর খুঁইই ভাল। কয়েক লাখ টাকার মালিক দক্ষিণা দত্ত। পাঁচ কন্যার জনক। জোয়ান ছেলে নেই কেউ।

খাওয়া-দাওয়া করার পর একটু আরাম করে নিলে গণ্ডশল। আরো যারা দু-চারজন থাকবে তাদের দেখে চিনে রাখলে। একটা ঘাইঝোড়া আর ইট যোগাড় করলে।

দত্তবাড়ির বুড়ী মা তার দুখানা হাতে ধরে কান্নাকাটি করে গেল। বউ সোমত্ত মেয়ে তিনটে আর ছোট দুটো—সবাই কাতর চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। দত্তবউ কাঁদতে লাগল কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে।

গণ্ডশল বললে, ‘ভগবানকে ডাকুন। সব ভয় কেটে যাবে। মিথ্যে সংবাদও তো হতে পারে!’

রাত একটার সময় কিন্তু সত্যিই সামনের মাঠে একটা বিরাট হৈ মেরে উঠল ডাকাত দল!

নিঝুম নিষুতি রাত। ঝিল্লী, ব্যাং, উইচিংড়ি, ঘুরঘুরে, সাপ ডাকছে ঐকতানে।

বিষম ভয়ের রাত!

হাতে বন্দুক নিয়ে ছাদে উঠে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল দক্ষিণা দত্ত।

ঘরদোর সব বন্ধ।

গণ্ডশল রইল কিন্তু বাইরে। সামান্য দূরের খিড়কীর দিকের এক বাগানে। নিবিড় অন্ধকার। দেবদারু না কি যেন গাছের ঝোপ।

ডাকাত দল এল। সাড়া-শব্দ নেই।

হঠাৎ ফায়ার হল। ডাকাত দলেরই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ। দক্ষিণা দত্তর সাড়া নেই। বোধহয় মূর্ছা গেছে। একজনের কাঁধে আর একজন উঠে ওরা পাঁচিল টপকালো। সদরের হাঁসকল খোলা হল। তখন সবাই ভেতরে ঢুকে গেছে। দোর-ভাঙার শব্দ।

মেয়েদের কান্নাকাটি।

গওশল ঝাঁকা হাতে নিয়ে সুট করে ঢুকে পড়ল। হাঁক মারলে জোরে, 'দুশো লোক—সবাই ঘিরে ফ্যাল! মার শালা হাতবোমা!'

সামনে একজন ছুটে আসতেই দিলে জোরে এক লাথি।

তারপরেই গুলি! নীল আলো জ্বলে ওঠে। ঝড়াং করে শব্দ হয় ঝোড়ার ওপরে পড়ে! গুলি ভরবার আগেই লোকটাকে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে বন্দুক কেড়ে নিয়ে তারই বাড়ি মাথায় মেরে শুইয়ে দিলে। একটা বল্লমের ফলা এসে উরুতে বিঁধল গওশলের। বল্লমটা ধরে সে ঠেলে নিয়ে গেল লোকটাকে। অন্য পায়ে তাকে লাথাতে লাগল আর বল্লম টেনে তুলে নিয়ে তাকে গেঁথে সাবাড় করে দিলে। হু-হু করে তখন পালাচ্ছে সবাই। তাদের পেছনে ধাওয়া করলে সে। বন্দুকের আঘাত খাওয়া লোকটা তখন অন্ধকারে কোথায় ছিল কে জানে পিছন থেকে ছুটে এসে গওশলের পিঠে কি যেন মারলে। গওশল ঘুরে পড়ে তাকে ধরে ফেললে। লোকটার শক্ত-সমর্থ চেহারা। দলের সরদার মনে হয়। মাথায় চোট খেয়ে জখম হয়েছিল আগেই। তার মাথাটাকে আবার পাকা দেওয়ালে ঠুকে দিলে ঝুনো নারকোল ঠোকার মতন বেশ করে। মেরে ফেললে চলবে না। হাত-পা মড়াস মড়াস করে ভেঙে দিলে। লোকটা আর্তনাদ করতে লাগল।

গওশল হাঁক দিলে, 'ইয়া আলী!'

তার সেই হাঁক শুনে গোটা গ্রাম যেন কাঁপতে লাগল। গ্রামের চারদিকে কোলাহল। আলো জ্বলে উঠল। সরদারের জ্যান্ত দেহটা ভেতরে টেনে এনে দোর বন্ধ করে আগল তুলে দিল সে।

দুটি লাশ ঘায়েল হয়েছে। আলো জ্বালো! দক্ষিণাবাবু কই ?• আর কোনো ভয় নেই। আল্লা বাঁচানেওয়ালা।'

কিন্তু কে আলো জ্বালবে!

অন্ধকার!...

লোকটা কাতরাচ্ছে।

পাড়ার লোকজন কেউ এল না ভয়ে।

গওশলের উরু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে। ভীষণ কনকন করছে। সেঁটে বাঁধলে জায়গাটা। তার শরীরটা যেন ঝিম করছে। বসে রইল কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে। তারপর গালাগালি শুরু করল সে: 'খানকীর বাচ্চারা কেউ বেরোয় না কেন? আলো আনো, জল আনো। ডাকাতরা খুন হয়েছে, পালিয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ পরে জানালা খুলে টর্চ মেরে দেখলে কে যেন। দক্ষিণা দত্তের কুমারী যুবতী বড় মেয়ে বোধহয়। দৃশ্য দেখে সে সাহস করে বেরিয়ে এল। তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সরদারকে আর পেটে বল্লম গাঁথা মরা লোকটাকে দেখলে গওশল। গাদা বন্দুকটা পড়ে আছে। মেয়েটাকে দেখলে সে। থরথর করে কাঁপছে এখনো।

গওশল বললে, 'একঘটি জল আনো মা! আর ভয় নেই। তোমার বাবাকে ডাকো।'

তারপর আলো জ্বলল।

দক্ষিণা দত্ত নেমে এল। ঠক-ঠক করে কাঁপছে সে। ছাদের ওপরের দিকে ডাকাতেরা গুলি চালাতেই নাকি দত্তমশায় লেগেছে মনে করে পড়ে যায়। কিন্তু তার লাগে নি। তবু সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

শুনে গওশলের এত দুঃখ-কষ্টের সময়ও হাসি পায়। তার পা-টা খুলে দেখাতেই সবাই আঁতকে ওঠে। ডেটল দিয়ে বেঁধে ফেলে।

সকাল হলে পাড়ার লোকজন আসে।

ডাক্তার আসে গওশলের জন্যে। পুলিস আসে থানা থেকে।

কালো পাথর চেহারার জুলপী বড় সরদার জুলজুল করে চেয়ে আছে। হাত-পা ভাঙা তার। বারকয়েক সূঁচ ফোঁটাতেই গোটা দলের নামধাম বলে দিলে। পুলিস তাদের নিয়ে চলে গেল।

দুদিন পরে টাকা নিয়ে ফিরে এল গওশল পালোয়ান। ভজহরি এক কলকে গাঁজা সেজে বললে, 'আর যদি কোনোদিন শালা তুমি ডাকাতি রদ করতে গেছ তবে তোমার একদিন কি আমার একদিন। মই ঠেকিয়ে উঠে যদি না তোমার গালে চড় মারি তো আমার নাম ভজহরি নয়।'

গওশল হাসে। কিছু না বলে গাঁজা টেনে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে রেণুবালার ঘরে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। তার সাত-সাতটা বউয়ের কেউ একটা নেই তো, কেই বা এখন আর দেখবে? রেণুবালা তাকে পাখার হাওয়া দেয়। যত্ন করে। আর গাল দেয়ঃ 'মুখ লুকুনে মিনসে আমার, ঘাটের মড়া —জ্বালাতে এল! মড়ার মতন এবার পড়ে থাকবে রাতদিন—আমার খদ্দের-পত্তর গেল!...'

গওশল পাশ ফিরে শোয়, তক্তপোশটা মড় মড় করে আর তারপর তার নাক ডাকতে থাকে ঘড়র ঘড়র! আস্ত যেন কুম্ভকর্ণ!

সন্ধ্যার মন্দিরা

আমন ধান নিড়োনোর পর চাষীদের এক রকম বিশ্রাম। ডাঙা জমিতে ঢ্যাঁড়োস, পটল, বেগুন, বরবটি, করলা থাকলে তা মাঝে মাঝে তুলে এনে হাটে বাজারে পাঠাতে হয়। ভাদ্রে নারকোলগাছ ছাড়ানো আছে। পাতা, মোচ, চেঁচ্‌লি, চুম্‌রি, নারকোল কুড়িয়ে জড়ো করতে হয়। নারকোল বেচে দিতে হয় শ' দরে। পাতা বিক্রি হয় কুড়ি দরে। কুমোরেরা তাদের 'পন' ধরাবার জন্যে নিয়ে যায়। যাদের পান বরোজ আছে তারাও কেনে। অথবা অনেক চাষীর মেয়েরা অবসর সময়ে পাতার কাঠি চেঁছে কেজি দরে বিক্রি করে। ভরা ভাদরে বৈঠকখানায়, দলিজে বসে বসে অনেকেই ঝ্যাৎলা-মাদুরী বোনে, জাল বোনে, খড়ের মোটা ছোটা পাকিয়ে বিড়ে, আট্‌লা তৈরি করে। খেসারী অথবা মুগ কলাই রাখবার জন্যে চওড়া একরকমের ছোটা পাকিয়ে বেণীর মতো শতখানেক হাত লম্বা করে বেড় পাকিয়ে পাকিয়ে বৃহৎ গোলাকার 'পুঁড়ো' তৈরি করে। কেউ 'টাকুর' বা তক্‌লি ঘুরিয়ে ছড়ি-সুতো পাকায় উরুতে হাতের ঘষা মেরে বন বন করে ঘুরিয়ে। কেউবা খুঁটিতে পাটের শীষ বেঁধে ঢ্যারা ঘুরিয়ে দড়ি কাটে।

ভাদ্র-সংক্রান্তিতে আসছে অরন্ধন পূজো—চাষীরা যাকে বলে 'রান্না পুজো' অথবা 'টক-পান্না'। 'পান্না' শব্দটি 'পান্তা'র ভিন্ন রূপ। তারপর আসবে মহালয়া। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। 'বড় পূজো'র আবহাওয়ার আনন্দ বইতে শুরু করে ভাদ্রশেষের সবুজ ধানক্ষেত দেখেই চাষীদের মনে।

তখন শুধু কামনা : 'হে ঈশ্বর, ঝড়-ঝাপটা দিও না। বন্যা-বাদলে ঘনশ্যাম মেঘবর্ণ ধানক্ষেত ডুবিয়ে হাজিয়ে দিও না। আমাদের ক্ষেত ভরে আশ্বিনের মঙ্গলাশীষ ভরে দাও।'

সন্ধ্যা নামলেই দলিজে বৈঠকখানায় পাড়ার চাষীবাসীরা খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম করতে বসে। উদাত্ত নিনাদে গ্রামের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' ধ্বনিত হয়। করতালের ঝনঝনানিতে জনপদ মুখরিত হয়।

মুসলমান চাষীরা 'কাসাসল আম্বিয়া', 'খয়রল হাসার', 'শোনাভানে'র পুঁথি পড়ে সুললিত স্বরে।

জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী বকুলপুর গাঁয়ের সব চাইতে সম্ভ্রান্ত চাষী। তিনি নামে বৈষ্ণব কিন্তু গৃহী। মাছ খান। নিজে হাল-লাঙ্গল পর্যন্ত করেন। তবে টিকি,

পৈতা, গলায় তুলসীর মালা আছে ঠিকই। অবসর পেলে মালা-জপও করেন। তিলক সেবা করেন কোথাও বার হতে হলে—সে আলীপুর কোর্টে মামলা করতে বা সাক্ষ্য দিতে কিংবা বি-ডি-ও-তে সার বা সিমেণ্টের জন্যে দরখাস্ত দিতে—যে কাজেই হোক না কেন।

জীবন বাবাজীর বয়স নাকি নব্বই বছর। ছ ফ্‌ট খাড়াই চেহারা। মোটা-সোটা হাতপায়ের হাড়। গায়ের চামড়া লোল হয়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। দাঁত নেই একটিও। ফোগ্‌লা গালে তার হাসিটি লেগে আছে। হামানদিস্তায় পান-সুঁপারি থেঁতো করে দেয় তাঁর স্ত্রী বুড়ী 'পেমোদা' অর্থাৎ প্রেমদা। তাঁর নাকের সোনার নথটা দোল খায় যখন বুড়োর পান থেঁতো করেন পুরাণ ভাগবত পাঠ শুনতে এসে ভিড করে বসা পাড়ার মানুষজনদের মধ্যে বসেই।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলে।

মাহিন্দ ঘোষ বলে, 'ঠাকুর-দা, আমার পঞ্চান্ন বছর বয়েস হল, শালা এই ১৩৭৭ সালের ভাদ্দর মাসের মতন বন্যে আর কখনো দেখি নি। বহু লোকেব ঘরদোর পড়ে গেল। বহু লোক মারা গেল। রেডিও, খবরের কাগজ যা বলছে তা তো ভয়ঙ্কর। হুগলী জেলার আরামবাগ, মেদিনীপুরের ঘাটাল, ২৪ পরগণার গোসাবা অঞ্চল নাকি অতল জলের তলায়। হাজার হাজার লোক মারা গেছে। তিন-চারটে নদীর জল, ডি-ভি-সি-র জল, বন্যার জল এসে আরামবাগের আরামের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে।'

জীবন বাবাজী বলেন, '১৩০৭ সালে এমনই বন্যা হয়েছিল। সবই শ্রীকৃষ্ণের লীলা! ঈশ্বর মাঝে মাঝে ধ্বংস আনেন, তাঁর কতখানি ক্ষ্যামতা দেখান। তাঁকে ভুলে গেলে দেশের বিপর্যয় সুনিশ্চিত। অনাহার, লোভ, খুন-জখম, মিথ্যার বেসাতি, জালিয়াতি এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে যে, সমস্ত দেশটা যদি ঈশ্বর ধ্বংস করে দেন তো আমার আপত্তি নেই। আবার সবুজের রেখা ফুটবে, আবার নতুন মানুষ জন্মাবে।'

প্রেমদা বলেন, 'সবাই মরলে তুমি কি আকন্দ ডাল মাথায় দিয়ে বসে থাকবে গোঁসাই?'

'মরি শালা মরব। আর আমার বাঁচবার সাধ নেই। ঢের খেয়েছি, ঢের দেখেছি, ঢের বেঁচেছি—এবার বিদায় নিতে পারলেই হয়।'

মোহম্মদ গাজি ভাল পুঁথি পড়তে পারে বলে তাকে সবাই সমাদর করে। সে রোজ আসে। তামাক টানছিল সে কোল্‌কে ধরে। হু হু করে ধোঁয়া ছেড়ে

দিয়ে সে বললে, 'ওহে গোঁসাই, মুখে তো বলছ মরণ এলেই বাঁচি! কিন্তু মরণ কি রকম জানো? সমস্ত পৃথিবীর ভার যেন বুকে চাপানো হয়েছে মনে হবে—তখন বলবে বাপ রে, মৃত্যুর দরকার নেই। তার চেয়ে 'পেমোদা'র লাঞ্ছনা গঞ্জনা ঢের ভাল। সে 'পিথিমি'র চাপ অনেক আরামের।'

প্রেমদা তখন মোহম্মদের পিঠে একটা কিল মেরে দিয়ে হাসতে লাগলেন পান খাওয়া রাঙা গাল মেলে।

বুড়ো কানাই পরামাণিক প্রাইমারী স্কুলের গুরু মশায়। তিনি বলেন, 'তুই কি মরে দেখেছিস?'

মোহম্মদ গাজি বললে, 'যিনি না মরেই স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁকে যম জানিয়েছিলেন মৃত্যু নাকি পৃথিবীর ভার চাপানোর সমান।'

'কে তিনি?'

'হজরত ইদ্রিস পয়গম্বর। তিনি নাকি যম বা আজরাইলকে অনুরোধ করেন তাঁকে বেহেস্তে অর্থাৎ স্বর্গে একবার ঘুরিয়ে আনতে। তিনি দেখবেন সে জায়গা কত সুন্দর, মনোহর আর হুর বা অপ্সরীরা কেমন, পয়গম্বরগণ কেমন হীরামুক্তা চুনীপান্নার ইমারতে আছেন। শুনে আজরাইল বললেন, হে বাণীবাহক, মৃত্যুর পর সেখানে যেতে পারেন একমাত্র পুণ্যবানরা। আপনিও যাবেন কিন্তু সে আপনার মৃত্যুর পর। তখন পয়গম্বর বললেন, মৃত্যু কি রকম? আজরাইল বললেন, সমস্ত পৃথিবীর ভার বুকে চাপানোর যে বিষম কষ্ট তাই হল মৃত্যু। নবী বললেন, তবে মরে গিয়ে স্বর্গে যাবার আমার বাসনা নেই। আল্লা আপনাকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন, আপনি যদি আমাকে একবার স্বর্গে যেতে দেন তবে ফিরে এসে মৃত্যুগ্রহণ করব। আজরাইল রাজী হয়ে গেলেন। মহামতি ইদ্রিস পয়গম্বরকে নিয়ে গিয়ে স্বর্গের বুলন্দ দরওয়াজায় হাজির করলেন। বললেন, আপনার রূপোর খড়ম খুলে রেখে যান—বেহেস্ত দেখে এসে পায়ে দেবেন। আপনি যে পৃথিবীর লোক, এখনো হায়াত আছে অর্থাৎ জীবিত, তার প্রমাণ রইল। আল্লার নাম করে আজরাইলকে সালাম জানিয়ে হজরত ইদ্রিস স্বর্গের মনোরম কাননে চলে গেলেন। মরকত হীরকের বালাখানা চারদিকে। অনেক মহাজন মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। শেষে তাঁর নিজের ঘর দেখে তাতে ঢুকে পড়লেন। আর বের হলেন না। এদিকে আজরাইল ব্যস্ত। সময় বয়ে যায়। এক নিমিষে তাঁকে কত লোকের মৃত্যু ঘটাতে হয়, সেসব কাজ বাকি। তিনি জোরে হাঁক মেরে হজরত ইদ্রিসের নাম ধরে ডাক দিলেন। হজরত ইদ্রিস

সাড়া দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দোস্ত আজরাইল, পৃথিবীর চাপ আমি সইতে পারব না বলেই বুদ্ধি করে না মরেই পালিয়ে এসেছি। আমি আর যাব না। মানুষ না মরে কি স্বর্গে আসতে পারে ? আমার মৃত্যু-সংবাদ আপনি আপনার হিসাবের খাতায় কবুল করে নিন। আজরাইল পড়লেন ফাঁপরে। মানুষ যে ফেরেশ্‌তার চাইতেও চতুর হতে পারে এই হল তার নমুনা। কি আর করবেন তিনি। রূপোর খড়ম নবীজীর পড়ে রইল। নবীজী চলে গেলেন সশরীরে স্বর্গের আরাম প্রাসাদে।'

কানাই গুরুমশায় বললেন, 'বাহবা ! বাহবা !'

জীবন বাবাজী চুপচাপ। পৃথিবীর চাপের কথা বোধহয় তখনো তিনি ভাবছিলেন। সময় তো আসন্ন।

চা আর সরষের তেল মাখানো মুড়ি দিয়ে গেল জীবন বাবাজীর ষোড়শী নাতনী মন্দিরা। তাঁর সিঁথিতে সবেমাত্র সিঁদুর পড়েছে মাস দুয়েক হল। যৌবনবতী, চমৎকার চেহারার গঠনভঙ্গিমা মেয়েটির।

বাবাজী বলেন, 'মন্দিরা, সখি, তোমার বর এল, তাকে কি আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের কোণেই রেখে দেবে। ডাকো না বন্ধুকে। পুরাণ পড়ে শোনাক আমাদের। অনেক তো ল্যাঠা মাছ পুড়িয়েছে।' অর্থাৎ লেখাপড়া জানে।

নাত-বৌ পদ্মরাণীও এসেছিল সঙ্গে চা নিয়ে। সে বললে, 'মিন্‌সে ঘর থেকে বেরই হয় না কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে পালাবার ভয়ে।'

মন্দিরা বৌদির গায়ে চিমটি কাটলে।

বুড়ী প্রেমদা বললেন, 'ডেকে দে, বল ঠাকুর-মা ডাকছে।'

সুদর্শন একটি ছোকরা লাজনম্রভাবে এসে সবাইকে নমস্কার করে বসল।

জীবন বাবাজী কাপড় জড়ানো শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানা এনে সযত্নে তাতে একবার প্রণিপাত করে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড বার করলেন। ত্রিংশ অধ্যায়ের রাসলীলা পড়তে বললেন।

নাত-জামাইয়ের নাম অমল অধিকারী। সে পড়তে আরম্ভ করতে সবাই কান পেতে শুনতে লাগল।

মোহম্মদ বলে উঠল : 'বাঃ ! বাঃ ! চমৎকার ! সুন্দর গলা ! পড়ো ভাই জোর দিয়ে। লজ্জা কি ?'

মন্দিরা আর পদ্মরাণী এসে পানের বাটা নিয়ে বসল দোরগোড়ায়—একটু আড়ালে। মন্দিরার মা ছ্যাকছোঁক শব্দ করে রান্না করছে উঠোনের ওপারের

রান্নাশালে। তার বাবা আর দাদা গেছে কলকাতার শিয়ালদায় পান বেচতে।

আকাশের ছুটন্ত মেঘগুলো এবার ঝরে পড়তে শুরু করল। সামনের কদম্ব-শাখার ফুলভরা ডালগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে আছে।

হ্যারিকেনের আলোয় পুরাণ পড়ছে অমল। কেউ জাল বুনছে, জীবন বাবাজী আসন বুনছেন, মোহম্মদ গরুর মুখের 'জাল্‌তি' বুনছে, প্রেমদা পাট কাটছেন—সবাই শুনছেন মন দিয়ে।

অমল পড়ছিল, পড়তে পড়তে ভাবছিল এবার উঠে পালাবে। এমন কাণ্ডও পুরাণে থাকে! তবু সে মাথা গুঁজে পড়ে যায়। ধর্মীয় গ্রন্থ। উঠে গেলে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় পাছে, তাই সে যেন একান্ত বাধ্য। তাছাড়া মন্দিরাও শুনছে। [শুনুক, সমস্ত তরুণীরা রাধা হয়ে যাক, আর সব তরুণরা শ্রীকৃষ্ণ!]

অমল জোর দিয়ে পড়ে যায়:

"কামাতুরা রাধিকারে হেরি ভগবান।
নিশ্চল হইয়া রহে স্থাণুর সমান॥
কামবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে তাঁর।
রাধার বদন পানে চাহে অনিবার॥
হাতের মুরলী তার পড়িল ভূমিতে।
হাত হতে ক্রীড়াপদ্ম লুটায় ধূলিতে॥
পীতধড়া খসি যায় অঙ্গ হতে তাঁর।
শিখিপুচ্ছ লুটাইল ধুলার মাঝার॥
আবেগে ধাইয়া গিয়া কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিয়া ধারণ॥
প্রীতিভরে ঘনঘন করি আলিঙ্গন।
বুকে মুখে বারে বারে করিল চুম্বন॥
রাধিকাও কৃষ্ণে করি গাঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বনে চুম্বনে তাঁর ভরিল বদন॥
তারপর ভগবান রাধিকার সনে।
রতির মন্দিরে যান আনন্দিত মনে॥
চন্দন চর্চিত সেই স্থান মনোহর।

রত্নময় দর্পণাদি শোভিছে বিস্তর ॥
কর্পূর তাম্বুল আদি সেথায় বিরাজে।
মনোহর শয্যা শোভে মন্দিরের মাঝে ॥
কৃষ্ণেরে রাধিকা করে তাম্বুল অর্পণ।
মনোসুখে কৃষ্ণ তাহা করিল ভক্ষণ ॥
কৃষ্ণের চর্বিত পান খান রাধা সতী।
পুষ্পশরে জর্জরিতা হইল যুবতী ॥
অনন্তর রাধিকারে করিয়া গ্রহণ।
শয্যায় শয়ন করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
তারপর নানাভাবে করিল বিহার।
বিপরীতভাবে কত করিল শৃঙ্গার ॥
শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ করিল চুম্বন।
প্রতি অঙ্গে রাধা অঙ্গ করে আলিঙ্গন ॥
দুজনেই কামরণে দক্ষ অতিশয়।
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্তি নাহি হয় ॥
নানামূর্তি ধরি সেথা কৃষ্ণ সনাতন।
ভিন্ন ভিন্ন গোপী সাথে করিল গমন ॥

হঠাৎ উঠে পড়ে দৌড় মারলে অমল। তার বিষম লজ্জা পাচ্ছিল যখন বুড়ো জীবনকৃষ্ণ মিটমিট করে হাসতে হাসতে বুড়ীর দিকে তেরচা চোখে তাকাচ্ছিলেন। হাসিও পাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার দ্বারা তৃপ্তি না হবার পরও আবার ভিন্ন ভিন্ন গোপীদের কাছে যাওয়াতে। ভগবান রতিক্লান্ত নন!

অমলের সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগল মন্দিরার। সে 'ছি ছি' বলে দিলে বৌদির গায়ে ঠেলে ফেলে। বৌদি বললে, 'আঃ! মরণ! মিন্‌সে কি রাধা ভুলে গোপী ধরতে চায় নাকি?'

মন্দিরা আর অমল ঘরের মধ্যে এসে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

মন্দিরা বললে, 'আচ্ছা, কি মজার জিনিসই না পড়ে এলে গো!'

অমল তাকে ধরে চুম্বন করতে থাকলে মন্দিরা পাগল হয়ে গেল যেন। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঠাকুরমা এসে ঘরে ঢুকতেই তারা ছিটকে সরে গেল।

'কই গো, কি হচ্ছে সব? ও অমল ভাই, বলি পালিয়ে এলে কেন?'

মন্দিরা বেরিয়ে আসতে আসতে বুড়ীকে এক ধাক্কা দিয়ে মুখঝাম্টা মেরে বললে, 'যাও বুড়ী, নাতজামাইকে নিয়ে ফুর্তি করো।'

প্রেমদা বললেন, 'আমার কি আর ফুর্তির বয়েস আছে লা?'

অমল বললে, 'ঠাকুরমা, ঐ জিনিস পড়বার জন্যে অধমকে ডেকেছিলেন?'

'কি জিনিস ভাই?'

নাতজামাইয়ের গা ঘেঁষে বসলেন প্রেমদা।

অমল বললে, 'একালের উপন্যাসে ও-রকম লিখলে জেল-জরিমানা উভয় দণ্ড অবধারিত।'

'কেন, রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে কি এমন খারাপ জিনিস দেখলে ভাই?'

'খারাপ নয়। বরং বাস্তব। একেবারে আমার আর মন্দিরার মতন—সাধারণ মানুষের মতন।'

'মানুষের কথাই তো, মানুষের আত্মার কথা, মনের কথা, দেহসুখের কথা। সব ওতে আছে। শুধু তোমাদের মতন একটা জিনিস নেই।'

অমল লেখাপড়া জানে। সাহিত্য করার বাতিকও তার সামান্য সামান্য আছে। সে বুঝতে পারলে বুড়ীর কথার মূল্য আছে। একটা জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেই বিপদ। শুধু পেট অথবা শুধু যৌন ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য করলে তার আবেদন হয়তো সাময়িকভাবে চড়া সুরে বাজতে পারে কিন্তু তা মানুষের সার্বিক রূপ নয় বলে কিছুদিন পরেই বিস্মৃতির খাদে নেমে যেতে বাধ্য।

হঠাৎ তার মনে হয় আধুনিককালের সাহিত্যে যে যৌনচিন্তা বেড়েছে তার কারণ আছে। যেসব পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যিকরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গকে ভাল করে জানা হয়নি, তাই মূলধন হিসাবে যৌন ব্যাপারকে আঁকড়ে ধরেছেন তাঁরা আর তা নগরকেন্দ্রিকও বটে। তাই অতৃপ্তির সার্বিক ক্ষুধা দেশের মন হতাশ্বাস করে ফেলেছে।

মোহম্মদ গাজির পুরাণ পাঠের পুঁথিপড়া ঢলানী সুর শোনা গেল। অমল সে সুরে মুগ্ধ হল। উঠে গিয়ে বৈঠকখানার দোরগোড়ার অন্ধকারে ধানের বস্তার ওপরে বসল। মন্দিরা সেখানে এসে দাঁড়াল। দু'জনে হাতে হাত রেখে পুরাণপাঠ শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে গেল।

জীবন গোস্বামী বললেন, 'অমল উঠে পালাল, সে ভেতরের যে রস তা বুঝতে পারলে না। ওর ভেতরে প্রেমাত্মায় আত্মহারা হওয়ার সুখ আছে। আহা, কবে আমি সেই পরম কৃষ্ণাত্মায় লীন হয়ে যাব!'

রাত এগারোটার পর জীবন গোস্বামীর ছেলে আর নাতি ফিরে এল। কলকাতা থেকে মিষ্টি দই ফল এনেছে তারা।

লোকজন চলে যেতে সকলে মুখ হাত ধুয়ে আহারে বসলেন।

খেতে খেতে জীবন বাবাজী বললেন, 'এ বছর বাংলা দেশের পূজোর আনন্দ ভেসে গেল। সামনের বছরে দুর্ভিক্ষ না বাধে।'

তার ছেলে নন্দকিশোর বললে, 'হাওড়া হুগলী জেলার চরম অবস্থা। ২৪ পরগণারও অনেক অঞ্চল ডুবে গেছে। আমন ধানের ওপর গোটা দেশের নির্ভর, তাই যখন ডুবে পচে গেল, মানুষ খাবে কি? বাসে করে আসছিলাম, মাইলের পর মাইল আয়নার মতন চকচক করছে। ভগবানের কি অসীম দয়া!'

হঠাৎ অমল বলে বসল, 'ভগবান সত্যিই কি আছেন? না, মনগড়া? আমার মনে হয় ভগবান বলে কোনো বস্তু নেই। নিছক কল্পনা।'

শ্বশুর নন্দকিশোর বললে, 'সে ভগবানই জানেন।'

জীবন বাবাজী হঠাৎ রুষ্ট হয়ে গিয়ে নিজের পাতে জল ঢেলে দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বুড়ী নথ নেড়ে হাত-পা ঝেড়ে বললেন, 'সং! ভগবান নেই বলেছে তো অমনি বুড়োর মাথায় আগুন ধরে গেল! আর ভাত খাবে না!'

অমলও হাত গুটিয়ে নিলে। সে উঠে পড়ল। অগত্যা নন্দকিশোরও উঠে গেল।

জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী বললেন, 'এ বাড়িতে প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমি আর অন্নগ্রহণ করব না। লেখাপড়া শিখে যারা ভগবান ভুলে যায় তাদের পাপেই তো দেশ ভাসছে।'

অমল জামাকাপড় গায়ে দিয়ে বললে, 'প্রায়শ্চিত্ত করা মানে আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া—মুখ পবিত্র করা। এমন গোঁড়া রক্ষণশীল বাড়িতে আমি আর আসব না।'

মন্দিরা তার পায়ে জড়িয়ে ধরলেঃ 'ওগো তুমি আজ যেও না।'

সহমরণ

অগ্রহায়ণ মাস। ক্ষেতে পাকা ধান।

চাষীদের চোখে ঘুম নেই। এই হাড়-কনকনে শীতের রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে টোঙ বেঁধে ধান চৌকি দিতে হয়। নইলে এক রাত্তিরেই সব ধানের জটা ছেঁটে নিয়ে পালাবে চোরেরা। এত কষ্টের ধান, পরের ভোগে চলে গেলে সারা বছর অন্নকষ্টে বালবাচ্চারা আছাড় খাবে।

ধারালো বল্লম পাশে নিয়ে আলাউদ্দিন খাঁ হ্যারিকেন জ্বেলে সারারাত বসে বসে বিড়ি টানে তার ক্ষেতের টোঙের মধ্যে বউ ফুলমনের মিহি করে 'ধাগা' দেওয়া, ফুল তোলা নক্সী কাঁথা মুড়ি দিয়ে। মাঝে মাঝে কোনো কিছুর খস খস শব্দ পেলে সে হৈ মারেঃ 'ও হই—! কুন শালা র‍্যা ওখেনে!' টর্চ মেরে দেখে দুটো শিয়াল চলেছে কাটা বিচুলির পাইয়ের মধ্যে দিয়ে। কাঁকড়া খুঁজছে শালারগুলো। যেখানে কাঁকড়ামাটি উঁচু হয়ে আছে পা দিয়ে সেই মাটির চাঁই সরিয়ে ফেলে জলভরা গর্তের মধ্যে শিয়াল তার ল্যাজ ঢুকিয়ে দেবে, ভেতরে কাঁকড়া থাকলে চিপটে ধরবে দাড়া দিয়ে, আর অমনি এক টান মেরে ওপরে তুলে এনে দেবে এক কামড়।

কড়মড় কড়মড় করে কাঁকড়া চিবোচ্ছে শিয়াল দুটো। আলাউদ্দিন তাড়া দিলেও সরে না তারা। টর্চের আলোয় শিয়াল দুটোর চারটে নীলাভ চোখ জ্বলতে থাকে।

গতকাল রাতে মোড়লদের দশ বিঘের অনেক ধান 'ডগে' নিয়ে গেছে চোরে। আজ তারাও চৌকি দিতে এসেছে।

সকালে সাতটা 'জন' লাগার কথা আছে। স্যায়দালি, কানাই, রহিম, আহাদ, বন্দেআলি, গুলিরাম আর হাসেন বানু।

হাসেন বানুর রোজ দেড় টাকা। সে মেয়েছেলে। বাকি জনেদের রোজ এতদিন সকলেই দু-টাকা করে দিচ্ছিল। আর মুড়ি বিড়ি। আলাউদ্দিন বলেছে, 'ধান তোলার ক-দিন তোদের আড়াই টাকা করে রোজ দোব বাবারা। গোলমাল করিস নি। নতুন চালের দাম পাঁচ সিকে করে কেজি হয়ে গেছে। এ বছর ভাদ্দর মাসে বিষ্টি হল, ধান রুইতে অনেক দেরি হয়ে গেল। চাষ হবার তো আশা ছিলই না। বীজতলায় সব 'গাঁট' হয়ে গেল। তাও যা ফলেছে তাতে

বিঘেয় চার-পাঁচ মণের বেশি হবে না। অন্য বছর তবু ছ-সাত মণ করে হয়। এ বচ্ছর রোজ বাড়ালে কি হবে।'

কিন্তু চাষীদের কথা ক্ষেতমজুর জনেরা শুনতে চায় না। শুনতে চায় না যে এ এলাকাটা বাড়তি ফসলের অঞ্চল নয়। যেখানে প্রচুর বাড়তি ফসল ফলে সেখানের চাষীরা ধান তোলার মরসুমের ক-টা দিন বাড়তি রোজ দিতে পারে।

তবু শুনলে না ওরা। সন্ধ্যার সময় কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের সাথে ওরা মিছিল করে গতকাল চিৎকার করে গেছে: 'ক্ষেত-মজুরদের চার টাকা রোজ দিতে হবে।' 'চার টাকা রোজ না দিলে কেউ কাজ করবে না, মাঠের ধান মাঠেই পচবে।' 'যে চার টাকার কম কাজ করবে সেই দালালকে হালাল করো।'

আলাউদ্দিন তো নিজেও কমিউনিস্টদের এতকাল ভোট দিয়ে এসেছে, কিন্তু এদের এই প্রস্তাব সে মানতে পারছে না। কালই পার্টির নেতা হাতেম আলীর সঙ্গে তার বচসা হয়ে গেছে। সব চাষীদেরই এক কথা। চার টাকা দিতে পারব না।

রিয়াজ সেখ বলেছে, 'তিন টাকা দিতে পারি, তবে 'জনমজুর' আমি বাছাই করে নেব। বাজে দুর্বল লোকদের আমি কাজ দেব না। তারা কোথা কাজ পায় করুক। নইলে কেউ দশ পণ বিচুলি কাটবে আবার কেউ এক কাহন কাটবে, সবাইয়ের রোজ সমান হবে কেন?'

জনমজুর কানাই বলেছে, 'তোমার হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান সেখের পো?'

রহিম বলেছে, 'তোমার নিজের 'প্রোডাকশন'-করা ছেলেমেয়েগুলো কি চাচা সবাই মেজাজে, বুদ্ধিতে, কাজে, লেখাপড়ায়, ভোজনে, কলহে সমান?'

আলাউদ্দিনও বেশি কথা-কাটাকাটি করতে চায় নি। সে জানে ক্ষেতমজুরদের কত অভাব। দিনান্তেও ওদের ভাত হয় না। পাঁচ-সাতটা প্রাণী খেতে ওদের প্রত্যেকের সংসারে—দু-টাকা রোজ দিলে চলে কি করে? তাও দামকড়ির জন্যে রোজ সন্ধ্যায় ওরা ঘ্যানঘ্যান করে, মোড়লের তোয়াজ করে বাঁধা ক্রীতদাসের মতন। কিন্তু তাদেরও যে উপায় নেই।

রহিমটা ওদের সরদার। খানিকটা লেখাপড়া জানে। সে বলে, রিয়াজ চাচা তো পঞ্চাশ-ষাট বিঘে জমির মালিক, নামাজ পড়ে, রোজা করে, কিন্তু রোজের দাম দেবার সময় জনেদের এমন কোঁৎ পাড়ায় যে রক্তআমাশা বেরিয়ে পড়ে। হজরত মহম্মদ আমাদের রসুল, তাঁর কথা কি মনে নেই? তিনি কি বলেন নি যে 'মজুরের কপালের ঘাম শুকোবার আগেই তার মজুরী মিটিয়ে দাও।'

ভোর হতে আলাউদ্দিন জনেদের বাড়ি বাড়ি গেল। সবাই এক কথা বলেঃ 'চার টাকা রোজ দিতে হবে।'

হাসেন বান্নুও সেই কথা বললে। বললে, 'কি করব দাদা, আমি যদি যাই ওরা মারবে, ঘরে আগুন দেবে।'

আলাউদ্দিন বাড়িতে চলে এল। তার বউ ফুলমন বললে, 'যাও তুমি ধান 'গল্‌টাও' যেয়ে। আমি ছেলেমেয়ে লিয়ে যেয়ে বয়ে বয়ে আনব। রান্নাখাওয়া থাক্, তা বলে কি মাঠের ধান ঘরে উঠবে নে।'

তাই গেল আলাউদ্দিন তার বড় ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে। তার ধান গলটাতে শুরু করতেই রহিম কানাইরা ছুটে এল। তারা বললে, 'না, তোমার কাজ করা চলবে না। আমাদের কাজ না করিয়ে যে নিজেরা করবে সে হতে দেব না। আমরা কি কলা চুষব?'

আলাউদ্দিন বললে, 'এ তো মহা অন্যায় কথা! আমার জমি আমি ক্ষেতে খাটতে পারব না এ আবার কেমন বিধান? আমার তো মাত্তেরে দশ বিঘে জায়গা। যাদের পঞ্চাশ বিঘে জায়গা তাদের তোমরা বয়কট কর।'

গলায় লাল রুমাল বাঁধা আরো শ-দুই জনমজুর এসে ক্ষেত থেকে 'নড়া' ধরে আলাউদ্দিনের বাপ-বেটাকে টেনে রাস্তায় তুলে আনলে।

সবাই বলতে লাগল, 'ধানে হাত দিয়েছ কি প্যাঁদানি খেয়েছ। চার টাকা রোজ দাও আমরা তোমার ধান গোলায় তুলে দিয়ে আসব। বাছাধনরা চালাকি পায়া হ্যায়?'

আলাউদ্দিন কোনো প্রতিবাদ না করে তখন চলে এল মোড়ের দিকে। সব চাষীদেরই এক অবস্থা। কলহ বচসা চলেছে মোড়ের মাঝে। এর পর পেটাপিটি মারামারি লাগবে। খুনখারাবি হবে।

মাঠের ধান মাঠে পড়ে রইল। জনমজুররা গলায় লাল রুমাল বেঁধে হাতে লাঠি সড়কি বল্লম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ শোনা গেল সোবেদার সরদারের ক্ষেতের ধান সব জনমজুররা নাকি জোরসে তাদের নিজেদের বাড়িতে বাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সোবেদার সরদার জোতদার লোক। দোতলা পাকা বাড়ি তার। সে বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছে ক্ষেতে। গুলিগালা চালিয়ে লোকজন জখম করতেই জনমজুরেরা থানা থেকে পুলিস এনে তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে সোবেদারের বাড়ি চড়াও হয়েছে। তার ধান টাকা পয়সা লুঠ হচ্ছে। সোবেদারকে মেরে ফেলেছে।

ক্ষেতের ধান ক্ষেতে পড়ে রইল।

রাত্রে চৌকি দিতে আসে সবাই। জনমজুরদের দিন চলে না। একদিন রাত্রে রহিম এল আলাউদ্দিনের কাছে। বললে, 'বিড়ি দাও দাদা, আজ তিনদিন খাওয়া নেই। এই সাতদিন কাজকাম বন্ধ। হাঁড়ি সিকেয় উঠেছে। তুমি এক কাজ করো। বলো যে চার টাকা করে দিচ্ছি। আর তিন টাকা করে দাও। আমরা পার্টিকে বলব চার টাকা দিচ্ছে। ল্যাঠা চুকে যাক।

আলাউদ্দিন হাসলে। বললে, 'তা হয় না। মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না। তোমরা বরং পার্টির মিটিংয়ে আবার প্রস্তাব নাও যে চার টাকা নয়, তিন টাকা করে রোজ দিলেও হবে। আর আমরা কারখানার মতন আট ঘণ্টা করে খাটব। মুড়ি-বিড়ি নেব না।'

রহিম বললে, 'তা পারব না। সকালে সাতটা থেকে দুপুর বারোটা। আর বিকালে দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই তো আট ঘণ্টা আমরা খাটছি। দুপুরে দু-ঘণ্টা ছুটি। মুড়ি-বিড়ি চিরকাল যেমন দিচ্ছ দিতে হবে। পার্টিতে আবার নতুন করে তিন টাকার প্রস্তাবের কথা তুললে আমাকে জোতদারের দালাল বলে সবাই নিন্দে করবে। পার্টি থেকে বার করে দেবে।'

'দেখছি তোদের নীতি হল, খেতেও দিবি না, খাবিও না। এতে গোটা রাজ্য জুড়ে হাহাকার বাধবে। আর ছোট ছোট চাষীরা যারা এতদিন তোদের পার্টিতে ছিল তারা সরে যাবে। ক্ষেতমজুর আর কতজন? তোরা আট ঘণ্টার যে হিসেব দিলি সেই মতন কি কাজ করিস? বেলা আটটার সময় কাজে লাগিস, এগারোটার সময় উঠে যাস। মাঝখানে তিনবার 'জিরেন' মেরে বিড়ি টানিস। আবার বিকেলে তিনটেয় কাজে লাগবি আর সাড়ে চারটে বাজলেই গায়ে গামছা দিয়ে উঠে আসবি। দরদটা উভয় ক্ষেত্রে দেখা দরকার।'

রহিম চলে গেল।

পরদিন চাষীরা মিলিত এক বৈঠকে তিন টাকা রোজ দেবার প্রস্তাব দিলে। কিন্তু কেঁচে গণ্ডুস করা যায় না। জনমজুররা তাতে অপমান বোধ করবে। ইতিমধ্যে তাদের হাঁড়ি জ্বলার এক নতুন ফন্দি তারা বার করেছে। চুরি করতে শুরু করেছে সবাই মিলে। প্রাণে বাঁচতে তো হবে!

হঠাৎ সংবাদ এল ক্ষেতমজুরদের পার্টি ভেঙে গেছে। তাদের মধ্যে দলাদলি মারামারি বেধেছে। অনেক লোকই তিন টাকা রোজ নিয়ে কাজ করতে চায়।

রহিম, কানাই, হাসেন বানু, আহাদ এরা আলাউদ্দিনের কাজে লাগল এসে।

দুপুর পর্যন্ত ধান গলটানো চলল। বিকালে ধান বয়বার সময় অন্য একদল ক্ষেত-মজুর এসে বাধা দিলে। ফলে লাঠালাঠি।

আলাউদ্দিন তার বল্লম চেপে ধরলে শের আলির পেটের ওপরে। আলাউদ্দিনকে নিরস্ত্র করার জন্যে তার বউ ফুলমন কোমর জড়িয়ে ধরলে। 'ওগো মেরে না গো…'

মেয়েমানুষকে ছিটকে ফেলতে পারলে না আলাউদ্দিন। সেই তার বাধা হল। হু-হু করে ঝড়ের মতন ধানগুলো তার ক্ষেত থেকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে সবাই। রহিম কানাইরা পর্যন্ত। একি তাদেরই যুক্তি! মগের মুলুক পেয়েছে!

এক বল্লম মেরে রহিমের ভুঁড়ি বার করে দিলে আলাউদ্দিন, কানাইকেও জখম করলে। তারপর সে হঠাৎ হাসেন বান্নুর হাতের কাটারীতে ঘায়েল হল। তবু গলা-কাটা হাঁসের মতন সে সারা মাঠে রক্ত ছড়িয়ে ছুটতে লাগল। ফুলমন প্রাণ-ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল। স্বামীর এই দশা দেখে সে আর থাকতে না পেরে ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে ধরে বসালে। কাপড়চোপড় রক্তে ডুবে যেতে লাগল। গলার নলী কেটে গেছে আলাউদ্দিনের। সে মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

রাত নামল তারপরেই। ফুলমন কাঁদতে লাগল মরা স্বামীর লাশ কোলে নিয়ে। তার ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। রহিমও মারা গেছে। মাঠের ধান মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রইল। তার গায়ে রক্ত…রক্ত…রক্ত !!

হোগলা বন : জলভাঁটি জলে ভাসা জীবন

লক্ষ লক্ষ তলোয়ার মাটি ফেঁড়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে লক-লক করছে, আলো পিছলে দিয়ে ঝলমল করে উঠছে, ঢেউ খেলিয়ে দোল খাচ্ছে সাগরের জলের মতন।

লখাইয়ের মা বলে, 'তওরাল-বন।'

আসলে হোগলা বন। বাদা অঞ্চলের ভাষায় 'হোঁকোল বন'।

সুন্দরবন অঞ্চলের সেই এক হোগলা বনের মধ্যে এক দঙ্গল বাগদি তিয়োর ডাহুক পানকৌড়ির মতন ঝোড়া কাঁধে নিয়ে 'জল-ভাঁটি', 'দুর্গাবাড়ি', 'দু'পাটি মাছ'

খুঁজে বেড়ায়। ভীষণ কালো মজবুত তাদের চেহারা। লখাইয়ের পাঁচ ছাওয়ালের মা অথচ সাত দিন পরে পরে একবার সিঁথিতে একটু 'খেলোল' কাঠি দিয়ে সিঁদুর না ঠেকালে তার নিটোল আর তাগড়াই বুক দেখলে কার বাপে বুঝতে পারে ও মেয়ে পাঁচবার পাঁচকলসী খুন ভেঙেছে! বালিহাঁসের মতো একবার ডুব মেরে উঠলেই একেবারে চকচকে! বয়েসের পায়ের ছাপ পড়ে নি তার গতরের আচোট মাটিতে।

হোগলা বনের মধ্যে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মেয়ে-পুরুষগুলো কলবল করে কথা বলছিল। হাত-চালিয়ে 'জল-ভাঁটি' অর্থাৎ শামুক সংগ্রহ করছিল সবাই। কুলপো কাঁটায় উরু ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তলার জলে মাঝে মাঝে জল-ডুমুর হলুদ-ফুলভরা কাঠশোলার গাছ। জলসংলগ্ন সেই গাছের গায়ে শামুক বসে থাকে। জলে একটু নাড়া পেলেই শামুকগুলো মুখ ছেড়ে দিয়ে তলায় তলিয়ে যায়। মাঝে মাঝে নরম পানকৌটিগাছ স্থতি শাপলা রক্ত শাপলার গাছ। পদ্মবন। শালুক অর্থাৎ শাপলার মূল, ভেউট বা ভেঁট তোলে মেয়েরা। 'দুর্গাবাড়ি' হল গেঁড়ি, 'দু'পাটি মাছ' হল ঝিনুক।

হঠাৎ লখাইয়ের মা চিল্লে ওঠে, 'ও মাগো! পায়ে মোর কি চিপ্‌টে ধরেছে! দেখ না লো মাগীরা! উঃ! বড্ড কামড়াচ্ছে।'

মাগীরা সবাই খিল-খিল করে হাসতে থাকে। মাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো পাঁচকালা চৌকি হাতে ছিদাম এগিয়ে এসে লখাইয়ের মায়ের কোমর থেকে ডোবা পায়ের তলায় হাত ডুবিয়ে কতক্ষণ হাতড়াতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে হাসি-মস্করা ঢলাঢলি শুরু হল।

লখাইয়ের মা একবার বলে উঠল, 'দেখ, মিনসে আবার কোথায় হাত দেয়!'

ছিদাম বললে, 'শালা, চেংড়া মাছ!' বলে সে ইয়া বাগাতোক গায়ে-শ্যাওলা-জমা পুরোনো একটা গলদা চিংড়ি দু'হাতে জলের মধ্যে থেকে তুলে আনলে। বড় বড় দাড়া মেলে মাছটা ছিদামের হাতে চিপটে ধরতে লাগল। লখাইয়ের মা এক ঝাপটা মেরে মাছটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঝোড়ার শামুকের তলায় লুকিয়ে রাখল। শামুকের ধারালো মুখ লেগে হাত কেটে গেল। সেখানটা চুষতে লাগল লখাইয়ের মা।

ছিদাম বললে, 'দেখলে কাণ্ড!'

নয়না বললে, 'তরকারী দিস মাসি।'

লখাইয়ের মা মাছটার উদ্দেশে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বললে, নজর লাগবে বাবা, থু-থু! থুড়ি!'...

দূরে ঝপ-ঝপ করে কি যেন শব্দ হচ্ছে না?

সবাই চুপ। কান পেতে থাকল।

ছিদাম বললে, 'বাঘ!'

সবাই তাড়াতাড়ি এক জায়গায় সরে এল। ঝোড়ার তলা থেকে দা বার করলে। রূপোর মত ধারালো হেঁসো বার করলে লখাইয়ের মা।

ছিদাম, পীরু, দুলাল, গোবিন্দ—সবাই চৌকি সড়কি হাতে নিয়ে দাঁড়াল। গোবিন্দর কাঁধে হাত দিলে অবিবাহিতা সোমত্ত মেয়ে ডালিম।

হঠাৎ সবাই দেখলে একাই একটা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে লখাইয়ের বাপ আসছে জল ভেঙে ঝপ-ঝপ করে শব্দ তুলে হোগলা বনের মধ্যে দিয়ে।

পীরু হেঁকে বললে, 'দুস শালা! তুই এসচিস, সাড়া দিবি তো, মোরা মনে করি বাঘ! সড়কি ছুঁড়লেই শালা টের পেতিস! জেলখানা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলি বউয়ের খোঁজে?'

লখাইয়ের বাপ কাছে এল। সবাইকে একচোখ দেখলে। বড় বড় গোঁফ রেখেছে সে। মাথায় কোঁচকানো বিরাট এক স্তবক চুল। ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে দিলে সকলকে। তাড়ি খেয়ে নেশায় চুর হয়ে এসেছে। চোখ দুটো কুঁচের পানা লাল। লখাইয়ের মাকে বললে, 'চল শালী, ঘরে চল!'

'তুই যা মিনসে, মুই ইক্ষুণি যাই বলে। আধ ঝোড়া জলভাঁটি হয়েছে 'সক্কেলে'। তিনটি ছাওয়ালের 'রাজকাঁড়ে' দিতি কুলোবে নি!'

'তুই চ' তো। ট্যাকা লেইচি। চাল কিনিস। কাঠার 'মংস' লেইচি, গামছায় বাঁধা আছে, দাবার খুঁটিতে বেঁধে টাঙিয়ে রেখে এইচি, কুন শালা না লিয়ে পালায়। চল্ তুই—'

লখাইয়ের মায়ের হাত ধরে টান দেয় তার জেল-ফেরত ইয়া তাগড়াই চেহারা মন্দমানুষ হরিপদ।

ভীরুর মা বুড়ী বললে, 'যা না লা বউ, কদ্দিন পরে মানুষডা এল। যা, ঘর যা।'

লখাইয়ের মা পদ্ম তার ঝোড়ার মধ্যে থেকে গলদা চিংড়িটা বার করে ছিদাম ঠাকুরপোকে বললে, 'লিয়ে লে তোর মাছ, মোদের নাকি 'মংস' এনেছে মিন্সে।'

হরিপদ হঠাৎ মাছটা কেড়ে নিলে। চোখ রাঙালে।

ছিদাম হাসলে। বললে, 'না বৌদি, তুই লে। তোর পা থেকে মুই ছাইড়িছি বটে, তোরই পাওনা।'

খেঁকিয়ে উঠল হরিপদ, 'তবে? মাগীর আসনাই!'

পদ্ম বললে, 'ঢ্যামোন মিনসের কথা শোন্!'

হরিপদ পদ্মর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে হোগলা বনের আড়ালে চলে এল। জল পার হয়ে ডাঙায় উঠতে আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। তার আগেই হরিপদ জড়িয়ে ধরে পদ্মকে। শামুকের ঝোড়া নিয়ে বেসামাল পদ্ম। গালাগালি করে।

'মাতাল মিনসের আর তর সয় নে। খালভরাটা যেন বুনো ভাল্লুক। ওলাউঠো, হি-হি-হি, আরে এই তুই ঘর চ' এগ্‌গে—বলি অ্যাদ্দিন ছেলিস কি করে?'

'তুই?'

'মুই!' হাসলে পদ্ম। তার ছ্যাঁচে-গড়া সুন্দর কালো মুখে, সাদা-সাদা দাঁতে আর চোখ ছুটোতে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। তারপর ঝোড়া মাথায় তুলে নিয়ে হঠাৎ ছুট মারলে পদ্ম। হরিপদও ছুটল তার পিছনে। নেশায় সে টলছিল। হোগলা বনে জড়িয়ে গিয়ে বার-ছুই পড়ে গেল। হোগলা গাছের তলোয়ার-ধার লেগে কেটে গেল খানিকটা। সে পড়ে গেলেই পদ্ম খিলখিল করে হাসতে লাগল। হরিপদর ইচ্ছে করতে লাগল ওর নাড়ীভুঁড়িটা বার করে দেয় ডাণ্ডার এক হুড়ো মেরে। যেমন বার করে দিয়েছিল বদমাস গোকুল গায়েনের। শালাকে মেরে ফেলে ছু'বছর জেল খেটে এল। পাঁচ বছরের সাজা ছিল। জেলখানার এক বিখ্যাত ডাকাত বুদ্ধি দিলে, আপীল কর। আপীলে তার বেকসুর খালাস হয়ে গেল।

পদ্ম আর হরিপদ জল ছেড়ে দুজনে ডাঙায় উঠল।

হরিপদর পায়ে বেড় দিয়ে হেঁতো জোঁক ধরেছে দেখে পদ্ম শিউরে উঠল। বিরাট লোম-অলা কালো মোটা চামড়ার হেঁতো জোঁক! ছাড়াবে কি করে! হাত দিয়ে টানলে হড়কে যায়।

হরিপদ বলে, 'দাঁত দিয়ে ধর শালী! 'অক্ত' খেয়ে মোটা হয়েছে। শালা একপো অক্ত খেয়েছে বোধহয়। ধানপাতা থাকলে তাই দিয়ে ধরা যেত। দাঁত দিয়ে ধর—টেনে তোল!'

'ওয়াক্ থুঃ। ছি! মোর ঘেন্না করে!'

'তবে হেঁসো দে, কেটে দিই।'

কেটে দিতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল। যত বেগে জোঁকটা রক্ত টানছিল সেই রকম বেগে রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল।

এখন উপায়! হরিপদ চেষ্টা করতে লাগল আঙুল দিয়ে খিমচে জোঁকটার দু'খণ্ড মুখকে টেনে তুলতে। কিন্তু রক্ত লেগে আরও হড়হড়ে হয়ে গেছে। তোলা গেল না।

অগত্যা বাধ্য হয়েই পদ্ম দাঁত দিয়ে কামড়ে জোঁক টেনে তুলে ফেলে দিলে। গালে তার নোনা রক্ত ভরে গেল। থু-থু করে থুথু ফেলতে ফেলতে মুখে জল দিয়ে এল ভিজে কাপড় চটপটিয়ে।

রক্ত তখনো গড়-গড় করে বার হচ্ছে। জোঁক যতটা রক্ত খেয়েছিল ততটা আরো বার হবে। এক মাসেও আর ঘা ভাল হবে না। কেবল চুলকোতে থাকবে।

ওরা দুজনে মাঠ পার হয়ে চলেছে।

জল শুকোনো ধু-ধু ক্ষেত। জাল কেটে ঘাস জন্মাচ্ছে ছত্রাকার হয়ে মাঝে-মাঝে। মাটিতে নুন ফুটে গেছে। সর্বত্র লাল-লাল বাচ্চা কাঁকড়াদের গর্ত। মাঝেমধ্যে হরকোচ আর বনঝামা, সোনাকাঁটার ঝোপ। গুলঞ্চ লতা জড়ানো গুয়ে বাবলা গেঁয়ো, কল্কে ফুলের গাছের জঙ্গল। বহুদূরে বাগদিপাড়া। ছোট ছোট ছিটেবেড়ার ঝুবড়ি। তালপাতার ছাউনি। বর্ষাকালে যখন চারদিক ডুবে যায় তখন যাতায়াতের একমাত্র বাহন হল তালগাছ থেকে তৈরি করা ডিঙি।

ওরা দুজনে ঘর ফিরে এল। লখাইয়ের মায়ের পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথম দুটো কলেরায় মারা গেছে। বাকী তিনটে কচ্ছপের মাংস নিয়ে উলঙ্গ ধুলোমাখা চেহারায় মাটির দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে আছে। বাপকে দেখে তারা ভয় পেলে। হরিপদ ছেলেমেয়েদের ধরতে যেতেই তারা ভয়ে কেঁদে উঠল। পদ্ম একটা গামছা পরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'তোদের বাপ রে, বাবা হয়, ভয় কি!'

ছেলেমেয়ে তিনটে মাকে জড়িয়ে ধরলে। বড়টাকে পদ্ম বললে, 'ঝোড়ার জলভাঁটিগুলো ম্যাচলার জলে রাখ। মরে যাবে। আজ 'মংস'-ভাত 'আঁধা' হবে।'

'ভাত 'আঁধা' হবে মা?' বড়টা শুধোলে।

'হাঁ।'

'কতদিন ভাত খাই নি মা?'

'কি জানি বাবা, মোর কি মনে আছে! চার-পাঁচ চাঁদ হবে। শুধু শামুক, গেঁড়ি, ঝিনুক, তাল, কচু, শাকপাতা খেয়ে আছি মোরা। পয়সা কোথা পাব যে চাল গম কিনব? চাল-গম ভদ্দর 'নোকে'রা খায়—বড়নোকরা খায়।'

হরিপদ ট্যাঁক থেকে ভিজে-যাওয়া নোটগুলো বার করলে। পঞ্চাশ টাকা। জেলখানায় থাকতে কাজ করত। দিনে ছ'আনা করে রোজ পেত। সেই জমানো টাকা। গাড়িভাড়া আর তাড়ি খেতে দু-তিন ট'কা বেরিয়ে গেছে। আর মাংস কিনতে দু'টাকা। চারবার করে গুণে দেখে, দু-কুড়ি পাঁচ টাকা আছে।

নোটগুলো রোদে শুকোতে দেয় হরিপদ। কচ্ছপের মাংস কুঁচোতে বসে পদ্ম। তার আর একটাও শাড়ি নেই যে ছেঁড়া ভিজেটা আজড়ে পরবে। খাটো গামছায় তার বড়সড় চেহারা ধরে না। বুক বেরিয়ে থাকে, সুডৌল, সুগোল, যুবতীদের মতন। হরিপদ তাকিয়ে থাকে। পায়ের জোঁক-ধরা ক্ষতমুখটাতে চুন লাগিয়ে দিয়ে ন্যাকড়া জড়ায়। ছেলেমেয়েদের খুচরো দু-চারটে করে পয়সা দিয়ে বললে, 'যা তোরা, দোকান থেকে কিছু কিনে খা যেয়ে।'

মাঠ পার হয়ে দোকান অনেক দূর। ছেলেরা যেতে পারবে না। তাই হরিপদ টাকা নিয়ে চাল আর বাজার-হাট করতে চলে গেল।

ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে। একটা মোটা শাড়ি কিনে এনেছে ছ'টাকা দিয়ে। পদ্ম খুশী। রান্না করে। তারা ঠিক জানে না আজ আবার কতদিন পরে পেট পুরে ভাত খেলে। খেয়ে উঠেই তারা শুয়ে পড়ল খেজুরপাতার চাটাইয়ে। এত খেয়েছে যে কেউ আর নড়তে পারছে না। আড়াই কেজি চালের ভাত আর এক কেজি মাংস খেয়ে ফেলেছে পাঁচজনে। তিনটে বাচ্চা আর দু মেয়ে-মদ্দতে।

ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে হরিপদ পদ্মকে কাছে টানে।

পদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীকে সোহাগে আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আর কতদিন চলতে পারে। মোটা 'গাব-দানা' (রেড়ির বিচির মতন) চাল, শামুকের তরকারী খেয়েও মাস-দুই পরে হরিপদর হাত খালি হয়ে যায়।

আবার শুধু শামুক খাওয়া শুরু হয়। দূরে আবাদ অঞ্চলে চাষের ক্ষেতে জনমজুরি করবার জন্যে যাবে হরিপদ। ছিদাম, পীরু যুক্তি করে রোজই তাল-ঝোপের মধ্যে বসে। কিংবা দশ মাইল উত্তরে ভদ্রপল্লীতে ডাকাতি করতে যাবে কিনা সে কথাও তোলে হরিপদ। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

পদ্মর কাছে আসে ডালিম। গোবিন্দ ওর মনের মানুষ। পদ্ম-মাসি যদি

ডালিমের সঙ্গে দু-কুড়ি টাকার মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারে তাহলে একটা শাড়ি বখশিশ দেবে গোবিন্দ। ডালিমের দিকে চোখ পড়ে হরিপদর। কিন্তু কাকা বলে মেয়েটা। পদ্ম আর ডালিম উঠোনে বসে ইঁটের ওপরে শামুক রেখে কাটারি দিয়ে ঘা মেরে-মেরে ভেঙে পোঁটাটুকু হাঁসছানাদের দিয়ে মুটিটুকু কেটে নিয়ে চুবড়িতে রাখছিল। সেইগুলো শিলে রগড়ে ঘষে নিয়ে হলুদ মাখিয়ে ধুয়ে এনে নুন দিয়ে জল দিয়ে ভটভট করে উনোনে চড়ানো মাটির হাঁড়িতে ফোটাতে থাকে ঘণ্টা-খানেক ধরে। তারপর সিদ্ধ হলে পিঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে কষে নিয়ে আর একটু ফুটিয়েই নামিয়ে নেয়। আঁশটে গন্ধে চারদিকটা ভরে যায়। তারপর মাটির শানকিতে অথবা টিনের খোরায় ঢেলে নিয়ে খেয়ে নেয়। পুরুষরা ঝাঁপা-ভরা তাড়ি খায় তার সঙ্গে।

ছিদাম এক ভাঁড় গাঁজা ফোটা কড়া তালের তাড়ি এনেছিল। শামুক রান্না হলে তাকেও খেতে দিয়েছে পদ্ম। খেতে খেতে গল্প করে হরিপদ আর ছিদাম।

ছিদাম বলে, 'কলকাতা কি রকম র‍্যা হরিদা ?'

'সে এক রকম! থালি পাকা ঘর-বাড়ি আর গাড়ি-ঘোড়া। মেমসাহেব বাবু বিবিরা ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জামাকাপড় দেখলে বোঝা যাবে তাদের কারুর টাকাকড়ির অভাব নেই। সবাই বাবু! মেয়েদের কি পরীর মতন চেহারা মাইরি! বগলকাটা জামা। নাই-বার-করা ফাঁকা পেট! আর মাত্তর দু'কড়া নিচেই আছে মাইরি—!'

পদ্ম একটা শামুক ছুঁড়ে মারে হরিপদকে—তার কথা শুনে।

'কলকাতা কুন্ দিকটাতে হবে ?' শুধোয় ছিদাম।

'ঐ 'ওত্তর'-পুবে। 'আগাশ' সাদা হয়ে আছে যিদিকে।' হরিপদ উত্তর দেয়।

'মোকে একদিন লি-যাবি ?'

'যাবি ? তাহলে সেই পাথরপিতিমের দিকে যেয়ে ভদ্দরলোক বা জোতদারদের ক্ষেতে ক্ষেতমজুরি করে সুযোগ বুঝে তাদের ঘরে ডাকাতি করে যেতিন ধরা পড়ি তাহলে কপালে জেল লেখা থাকলে কলকাতা দেখা মিলতে পারে।'

'তবে চল, কালই দল বেঁধে পাথরপিতিমের কাজে যাই।'

সত্যই পরদিন সব কজন পুরুষই দূর পাথরপ্রতিমার দিকে চলে গেল বড় বড় চাষী। জোতদারদের চাষের জন-মজুরি খাটবার জন্যে। গোবিন্দ শুধু যায় নি। তার বাপ কোথা থেকে তাইচুং ধান চুরি করে আনতে তারই চাষ করেছে।

নাবালডাঙা জমিতেই চায়েন হয়ে ধান ফলেছে। কাঠায় আড়াই মণ ধান হবে। ধান যেন বিছিয়ে দিয়েছে। দশকাঠা জায়গাতে যা ধান হবে তাতেই ওদের সম্ বছরের খোরাকী হয়ে যাবে। হরদম জল বইছে গোবিন্দ। ডালিমও তার সঙ্গে জল বইছে কলসী কাঁখে নিয়ে। সে নাকি আর তার মা-বাবার কাছে যাবে না—ঝাঁটার বাড়ি হরদম মার খেয়েও।

গোবিন্দর বাপ অখলে বুড়ো হাসে। ঠিক আ৻ে, থাক্। এক বছর বাদে-বাদে বামুন ঠাকুর আসে। সামনের মাসেই আসবে। তখন বিয়ে হবে।

পদ্ম শামুকের মুটি চিবোতে চিবোতে অন্ধকারে আঁচল ঝাপটা মেরে জ্বরতপ্ত তিনটে ছেলের গায়ের মশা তাড়াতে তাড়াতে উদাস মনে দেওয়াল হেলান দিয়ে ভাবতে থাকে কবে মিনসে আবার ফিরবে। পেটে যে তার আবার একটা বাচ্চা এল! লোকটা যদি না ফেরে, গতর ভারী হলে এই অবোলাদের নিয়ে সে কি উপায় করবে? হোগলা বনের মধ্যে যদি তাকে কেউটে সাপে কাটে, বাঘে নিয়ে যায়, বাচ্চাদের কি হবে? এই জ্বর গায়ে বাচ্চারা পড়ে আছে, এক ফোঁটা বার্লি নেই—চিকিৎসা নেই।…

হঠাৎ একদিন ছিদাম এল।

পদ্মকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বৌদি তুই কাঁদবি নি বল—হরিদা আর পীরু জোতদারর বন্দুকের গুলি খেয়ে মারা গেছে। তল্লাটের চাষী লোকরা জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করলে। খুব কাটাকাটি মারামারি হল। হরিদা আর পীরুর লাশ 'পুলুস' নিয়ে গেছে।'

মাথা কুটে কুটে পদ্ম কাঁদতে লাগল। ছেলেদের জ্বর। লোকটা আর কক্ষনো ফিরবে না। তার হাত ধরে হোগলা বন থেকে টেনে ঘরে আনবে না।

ছিদাম জ্বরতপ্ত ছেলেগুলোর কপালে হাত দিয়ে দেখলে একবার। তারও হাত জখম হয়েছে। দুটো টাকা নিয়ে পদ্মর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বাড়িতে চলে গেল ছিদাম।

পদ্ম বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল সারারাত। তার পেটে আর একটা বাচ্চা এসেছে। চিরকাল এবার তাকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শামুক খেয়েই থাকতে হবে। জলভাঁটির মতন চিরকালই তারা হোগলা বনের জলে ভাসতে থাকবে।

তারাপদ ধাড়া

গহিন রাত। রাতচরা পাখিটা ডাকছে ক্রমাগত : চাউর—চাউর—চাউর ! চাউর —চাউর—চাউর !…

পাকা গাব আর বটফল খেতে খেতে মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করছে বাদুড়-গুলো। কোয়াক—কোয়াক—দীর্ঘ লয়ের কম্পিত স্বর তুলে আকাশপথে উড়ে চলে যায় মানিকজোড় পাখি।

শিয়াল ডাকে হুয়া-হুয়া স্বরে। শশাক্ষেতে তারা গড়াগড়ি খায় আর পিঠে শক্ত নোড়ার মতন শশা ঠেকলেই উঠে পড়ে হাঁক করে কামড় বসায়। বাঁশের চেলাকলের দড়ি টেনে বাবুরাম মালিক বিকট শব্দ তুলে শিয়াল তাড়াতে থাকে ক্ষেতের টোঙের মধ্যে বল্লম হাতে নিয়ে বসে বসে।

তারাপদ ধাড়ার তিন সেলের টর্চের আলো পড়ে বারকতক তার বেগুন-বাড়িটার ওপর দিয়ে। বেগুন, বরবটি, শশা, মুলো, কফি, সিম, কলা, আলু—শত রকমের চাষ তারাপদর। ভীষণ চুরি হচ্ছে বলে তারাপদ নিজে চৌকি দিতে আসে রাত্রে।

সে হাঁক মারে, 'বাবুরাম আছিস ?'

'হাঁ গো দাদা !'

পাশের ডাঙায় এল একবার তারাপদ। টর্চ ফেলতেই দেখলে কয়েকটা সজারু মানকচু খাওয়া ফেলে রেখে মানুষের সাড়া পেয়ে পালাচ্ছে ঝুমঝুম করে শব্দ তুলে। আট-দশ কেজি করে বড় বড় মানকচু, খাবলে খাবলে খেয়ে ফেলেছে তিন-চারটে।

তারাপদ বলে, 'দাঁড়াও শালারা, কাল তোমাদের মজা দেখাব ! কলাগাছের টুং কেটে ফেলে রেখে গেলে শালা তোমরা কাঁটা ফুটে জখম হয়ে থাকবে। টানাটানি করলেই কলাগাছ গড়িয়ে গায়ে চাপবে। ভীষ্মের শরশয্যা হবে শালা সজারুদের। কাঁচা মানকচু খাস, শালা তোদের গালও কিটোয় নে !'

বাবুরাম বলে, 'তারাদার ক্ষেতে চোর, 'সজারু', ইদুর, 'ইউচিংড়ি' আর পোকামাকড় লেগেছে আর আমার আখক্ষেতে লেগেছে শালার বুনো শুয়োর ! আখের তেউড়গুলো শালারা মুখের হুদোর দিয়ে ধুনে ফেললে ! একটার ভুঁড়ি ফাঁসাতে পারলে শালার মাংস চাট করে খাই ! যা মজা না, মাইরি !'

তারাপদ একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধারায়। টোঙের মধ্যে বসে, কোমরটা চাগিয়ে তুলে।

বাবুরাম বলে, 'নারকোল কটা দিলে না হাঁ দাদা?'

'কত দাম দিবি?'

'পঁয়তাল্লিশ টাকা। পেড়ে নোব গেছুড়ে দিয়ে।'

'তেমন ছোবড়া নিবি। শালা, ছোবড়াই ছ টাকা শ। ছোবড়া পিষে এখন নারকোল দড়ি, বোলেন, গদি, ব্রাস, আরো কত কি হচ্ছে। কলকাতায় একফালি নারকোল দশ পয়সা। কুড়িটা ফালি তুলতে পারলেই দু'টাকা। তার মানে দুশো টাকা পড়তা। তুই তো পঁয়তাল্লিশ টাকা নারকোল কিনে আমতলার হাটে বেচে আসবি সত্তর টাকা করে।'

'কাটা-ফাটা আছে, কতো পচে যায়, কতো সাইজে মেলে না, জল মরে যায়। তারপর গেছুড়েদের রোজ, দুটো মুসলমান মেয়ে নারকোলের বস্তা বয়—তাদের রোজ, সাঁড়াশী মেরে আমি ফেঁড়ে দিই, না হলে লহরজান পা ফাঁক করে বসে চেলা করে, সাঁড়াশী মেরে। তাদের রোজ আছে।'

'তুই লহরজানকে নিয়ে যাই কর আমার বলে টাকা চাই। পঞ্চান্ন পর্যন্ত দিতে পারি। গতকাল শ-দুই নারকোল লববাবুর বাগান থেকে আমার চুরি করে নিয়ে গেছে রাত্তিরে। সিঁদেল চোর জুটে বড় জ্বালাতন করছে। দিনের বেলা চা-দোকানে গাঁজা টানে, তাস পেটে, রেসের টিকিট কেনে আর রাত্রে কার কাঁটাল, কার কলা, বেগুন, পেঁপে, পটল তুলে নিয়ে পালায়।'

ঝিঁঝি ডাকছে ঐকতানে।

কররররর শব্দ তুলে একটানা ডাকছে ঝোপজঙ্গল আর উলুকাশের বনটার মধ্যে কেউটে বোড়ারা।

আকাশে তারার ধুতরো ফুল ফুটে আছে যেন। দীর্ঘ ছায়াপথটা পাড়ি দিয়ে গেছে দিগ্বলয়ের ওপারে।

সপ্তর্ষির তারাগুলোর নাম মনে করে একবার তারাপদ। কবে সেই ক্লাস এইটে না নাইন-টেনে পড়েছিল সে। আই-এ পাস করে চাষবাস নিয়ে পড়ে রইল সে। চাকরি করে নি বলে কত লোক তাকে টিটকারি করত। কলেজে পড়বার সময়েই সে অবসর মতন বিয়াল্লিশ হাজার ইঁট কেটেছিল একাই। সেই ইঁটে ঘর হয়ে গেল। বাপকেলে মাত্র পাঁচ বিঘে ধানজমি, তিনটে পুকুর আর বিঘে তিনেক ডাঙাজমি ছিল তাদের। বাবা মারা যায় তাকে তার মায়ের কোলে

শিশু রেখে। নিজের চাষ তুলে হাল বেচত সে। পরের ক্ষেতে হাল করতে যেত। লোকে বলত, 'তারাপদটা লেখাপড়ার মর্যাদা আর রাখলে না।' মনে মনে হাসত সে। তার একটা প্ল্যান ছিল। সে অমানুষিক পরিশ্রম করবে। মাটির সঙ্গে লড়াই :করবে। তবে বোকার মতন নয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য নিয়ে। ভাগচাষের জমি করলে বছর সাতেক। তারপর ধান, পাট, উলু, কলা, নারকোল, বাঁশ, নানান ফসল বেচে টাকা জমিয়ে কয়েক বিঘে জমি কিনে ফেললে। পাকাবাড়ি গেঁথে ফেললে দোতলা।

লোক তো অবাক। তারাপদ অঙ্ক কষে বলে দিতে পারে এক বিঘে জমিতে কত সার দিলে কত মাদায় কত করে আলু হলে কত মণ বা কুইণ্টল আলু হবে। তার মুলোর গাড়ি, কপির গাড়ি, বেগুনের বস্তা বোঝাই গাড়ি যায় হাটে-বাজারে। পানের মোট যায় শিয়ালদায়।

এখন তারাপদ ধাড়া লক্ষপতি লোক।

তবু পৌষ-মাঘ মাসের মোষের-শিং-নড়া হাড়-কনকনে শীতের মাঝরাতে এসে দেখ তারাপদ দমকল বসিয়ে কপি ক্ষেতে, মুলো ডাঙায় জল পাইয়ে দিচ্ছে নালার মুখ কেটে, কোদাল ধরে জল-পেয়ে-যাওয়া ভাটির মুখ বন্ধ করে।

লোকটা যেন রাতচরা। নিদ নেই, ঘুম নেই।

দশ-বারোটা জন কাজ করছে তার নাগাড়। তার সঙ্গে খেটে এঁটে ওঠে কার বাপের সাধ্যি! ফরসা ছ'ফুট লম্বা হাড়-পাকা জোয়ান চেহারা। বল্লম হাতে নিয়ে দাঁড়ালে ভয় করে। তেরিয়া মরদ। তারাপদ শুধোয়, 'বাবুরাম, তুই কি ডাঙায় এখন থাকবি?'

'বাড়ি যাব দাদা, ক'রাত ঘুম নেই। গা-মাথা যেন ঘুচ্ছে।'

'না, লহরজান ঘোরাচ্ছে?'

'কি যে বলো দাদা!'

'মেয়েটার তাগড়াই চেহারা মাইরি! ভাতারের ঘর করে না কেন?'

'বর নাকি খোঁড়া। বিড়ি বাঁধে—উপায় নেই। মাথার তেল, পেটের ভাত দিতে পারে না ঠিক মতন।'

'ঠিক মতন আর কোন্ মেয়েকে কে দিতে পারে বল? যাহোক, দেড় টাকা রোজে তুই একটা মক্কেল মেয়ে পেয়েছিস বটে। শালা, কালো আবলুস চেহারা! কোদাল পেড়ে পেড়ে গতর যেন পাথর হয়ে গেছে। রাত্রে এই টোঙে শশা-চৌকি দিতেও আনতে পারিস লহরীকে!'

'তা জানো দাদা, বললেই থাকবে, ওর মা-বাপের আমার ওপরে এমন বিশ্বাস না দাদা, কি আর বলব !'

হাসতে লাগল তারাপদ। বললে, 'পেটে বাচ্চা হলে কি করে বার করে দেয় লহরজান ?'

বাবুরাম বললে, 'সে আর কি বেশি ভাবনার ? তবে দাদা আমি ওসব পাপ কাজে যাই না, ঘরে কি আমার বউ নেই ?'

তারাপদ বলে, 'সে তো শালা ছেঁড়া কাঁথা, কত হাজারবার আর গায়ে দিবি ? নবাব, মহারাজ, ধনীরা তাই হাজার ধনি রাখেন, মনে নতুন বল পান। কর্মে অনুপ্রেরণা পান। ভেবে দেখ, একটা বউকে নিয়ে কোনো ভদ্দরলোক যদি পঞ্চাশ বছর 'ইয়ে' করে তো তার মধ্যে কোনো রুচি থাকে কিনা ! একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ভালবাসা থাকে বড্ড জোর বছর পাঁচেক। তারপর থোড়-বড়ি-খাড়া—খাড়া-বড়ি-থোড় ! এর নাম সংসার ! সমাজকর্তারা সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। তা না করলে আমাদের মা-বাবা কে জানাই মুশকিল হতো ! প্রবৃত্তির কাছে ক্রীতদাস হলে বাবুরাম, শালা তুই ছুঁচো হয়ে যাবি। আর কাম জিনিসটা যত ফেনাবি সাবানের মতন ফেনিয়ে ফেনিয়ে তোকে সাফ করে দেবে !'

বাবুরাম নাকমলা, কানমলা খেয়ে জিব কেটে দিব্যি গেলে নিজের সাধুত্বকে বার বার সমর্থন করে। তারপর সে টোঙা ছেড়ে চলে যায় বাড়িতে। বাড়িতে ও আজ যাবেই। শুধু বউকে দেখাবার জন্যে যা ডাঙায় এসেছিল খানিকটা, পাছে বউ বলে বসে, 'যুবতী শালীকে দেখে যে ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতে আজ একেবারেই বেরুলে না গো !'

বাবুরামের শালী এসেছে। যুবতী কুমারী শালী। আজ রাত্তিরে তার ঘরে না গেলেই নয়। একটা মাত্র ঘর। পাশাপাশি একটা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকবে বউ আর শালী। তারা দুজনে ঘুমিয়ে পড়লে কোনটা বউ আর কোনটা শালী ঠিক করতে পারবে না বেচারা বাবুরাম ! শালা, দে গরুর গা ধুইয়ে !

তারাপদ হাসে।

বাড়িতে চলে আসে সেও।

ডাক শুনে তার বউ পারুলরাণী এলো চুলে সাপের মতন বেড় পাকাতে পাকাতে হাই ভাঙতে ভাঙতে এসে দোর খুলে দিলে।

টলে টলে এসে আবার খাটের ওপরে শুয়ে পড়ল। তার নাকে সুড়সুড়ি দিলে সে বিবক্ত হয়। হাসে।

বলে, 'কি হল আজ তোমার বলো তো ?'

'আজ আমার বোধহয় শেষ রাত !'

ধিড়ফিড় করে উঠে বসল পারুল। স্বামীকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'কেন ? কি হয়েছে ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা আতঙ্ক যেন। খুন-জখম কিছু হবে। হয় আমি মরব, নয়তো…'

'নয়তো ! কে !'

'জানি না।'

চুপচাপ বসে রইল তারা কিছুক্ষণ জড়াজড়ি করে। পারুল চুম্বন করতে লাগল অনর্থক। শোয়াতে চাইল তার বুকের ওপরে। কিংবা বিছানায়। লোকটা মন খুলে কথা বলে না কোনো সময়। চারিদিকে শত্রু। জমির মামলা। কাউকে মানে না তারাপদ। একাই একশো। কেউ তর্কে তার সঙ্গে পারে না। ভোটের বাবুরা এলে সে যে দলই হোক ভীষণ রেগে উঠে তর্ক করে। তাদের অপমান করে। এক পয়সাও কোনো দলকে সে চাঁদা দেয় না। ঠাকুর-দেবতা মানে না। পারুলের মনে হয় হয়তো আজ তাদের বাড়িতে ডাকাত পড়বে কিংবা ডাঙাতে চোর আসবে জানতে পেরে অস্ত্র নিয়ে তারাপদ ঘোরাঘুরি করছে কেবল রাত জেগে।

বললে, 'ওগো, তুমি শুয়ে থাকো, আজ কোথাও যেও না। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে গো !'

'মাগকে নিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ে থাকব আর আমার ডাঙার ফসল চুরি করবে শালারা রোজ ? কাল শনিবার আছে। শ্যামগঞ্জের মিলের বাজারে মেলা আনাজ বিক্রি হবে। সেই আনাজ না যোগান দিতে পারলে চোরেদের আজ রাত্তিরে বড় লোকসান ! যাই আমি, ডাঙায় যাই।'

পারুল কিছু না বলে শুধু স্বামীকে ধরে একবার টানলে।

তারাপদ তাকে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে।

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছে অকাতরে। পারুলের বুকের যৌবনে এখন ভরা দুপুর। নিতম্বের ডৌল বেশ গুরুগম্ভীর এবং আকর্ষণীয়। তবু তারাপদ চোখ ফেরায়। পারুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দোরের আগল বন্ধ করলে তবে তারাপদ চলে আসে ডাঙার দিকে। আদৌ টর্চের আলো মারে না সে। জমাট অন্ধকার। গাছপালা, আকাশ, জল সব

আবছা দেখা যায়। সাপের ভয় প্রতি পদে। ঘাসবন। সরু আলপথ। সামনে পগার। পগারের জলে খুঁটি পোঁতা। খুঁটির মাথায় বরবটি, পালা ঝিঙের ছাদলা। ছাদলার নিচে বিস্তর বরবটি আর ঝিঙে ফলে আছে। একহাত করে লম্বা হয়েছে প্রত্যেকটা। গাছগুলো সার পেয়ে ভীষণ সতেজ হয়ে ফসল দিতে শুরু করেছে।

তারাপদ হঠাৎ যেন মানুষের নড়াচড়া বুঝতে পারলে। জল নড়ে উঠল। কে যেন বরবটি আর ঝিঙে তুলছে না!

টর্চ মারলে সে। বেগুনবাড়ির মধ্যে তিনজন। পগারের জলে একজন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কোঁচকানো ঢেউতোলা। কালো, তার মতোই খাড়াই চেহারা। লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলে। গৌর সামন্ত।

ঝাঁ করে তার পেটে বল্লম বসিয়ে দিলে। 'বাবা গো!' বলে চিৎকার করে উঠল গৌর সামন্ত। বল্লমটা ধরে ফেলেছে সে। টর্চটা পড়ে গেল জলে—হাত থেকে খসে। জোরে হাঁক মারলে তারাপদ যখন দেখলে বেগুনবাড়ির মধ্যে থেকে চোর তিনজন তাকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসছে।

'ছুটে আয় সব। ঘিরে ফেল। এক শালা পড়েছে। সাবাড় করে দিইচি। জয় মা কালী!'

তারাপদর আকাশ-ফাটানো হাঁক শুনে গ্রামের সবাই জেগে গেল। চারদিক থেকে হৈ মেরে চিৎকার করে সাড়া দিলে তারা।

লোক তিনজন আর না এগিয়ে অন্ধকারে উলুমাঠ ভেঙে দৌড় দিলে।

গৌর সামন্তকে ডাঙায় গায়ে চেপে শুইয়ে ফেলে দিলে তারাপদ অসুর বিক্রমে। টেনে বল্লমটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ঘ্যাচ করে গাঁথলে গৌরের দেহে। তবু গৌর বল্লম টেনে নিয়েই ছুটে এসে ধরলে তারাপদকে। লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে আবার গাঁথলে, আবার গাঁথলে, আবার গাঁথলে সে বল্লমের হাতখানেক ফলাটা! মানুষ মরে কি অত সহজে! লোকটা গোঙাতে লাগল। শুয়োরের মতন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে শব্দ তুলতে লাগল শুধু তারাপদ। টর্চটা কোথায় পড়ে গেল জলের মধ্যে? পা দিয়ে একবার দেখলে। পেলে না। সমস্ত শরীর কাঁপছে থর-থর করে। উত্তেজনায় এবং ভয়েও। লোকটা তখনো ঝাঁকাচ্ছে।

'বাবারে মা গো…'

'শালা! রোজ, বাবাকেলে মাল পেয়েছ!…বাবুলাল-হীরু-চক্রধর—এদিকে চলে এস।'

আলো নিয়ে লোকজন এল।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

মরে গেছে গৌর সামন্ত। ডাঙার পাড়ে, ছাদলার কোলে তাকে টেনে তুলে দিলে তারাপদ। রক্তে এককোমর পগারের জল লাল হয়ে আছে তখনো। সতেরো জায়গায় খুঁচেছে কেবল গৌরের দেহে তারাপদ। সাদা দাগ ফ্যাক-ফ্যাক করছে। শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে গেছে।

তারাপদ ভাবছিল। এখন উপায় ?

লোকটার কোঁচড়ে চারটি বরবটি আর ঝিঙে। উপরে একটা বস্তায় ভরেছিল চারটি। লোকজন সেখানে পাহারা দিতে থাকল। তারাপদ বাড়িতে চলে এসে গা-হাত ধুয়ে নিয়ে জামাকাপড় পরল। পারুল বললে, 'কি হয়েছে গা ?'

'তোর মাথা! ট্র্যাঙ্ক খোল, টাকা বার কর। হাজারখানেক টাকা দে তাড়াতাড়ি। থানায় যাব।'

টাকা নিয়ে সাইকেলে চেপে তক্ষণি থানায় চলে গেল তারাপদ।

পাহারাঅলাকে ত্নটো টাকা দিয়ে ভোররাত্রে থানার বড়বাবুকে ডেকে তুলে সব কথা বললে তারাপদ।

বড়বাবু বললেন, 'আপনি নিজে কোনো লোককে মেরে তাকে চোর সাজিয়েছেন, এমনও তো হতে পারে!'

'আজ্ঞে না স্যার। আমার ফসল রোজ চুরি যেত। আজ চৌকি দিতে যেয়ে এক শালাকে ঘায়েল করেছি। মারা গেছে। বাকি তিনজন পালিয়ে গেছে।'

'সাক্ষী আছে ?'

'আজ্ঞে না, আমি একাই ছিলাম।'

'এই তো মুশকিল! খুনের কেস উল্টে আপনার ঘাড়ে চাপতে পারে। রাহী লোককে অথবা আপনার শত্রুকে মেরে আপনি চোর সাব্যস্ত করবার জন্যে কিছু ফসল গুঁজে দিয়েছেন—এমনও তো হতে পারে ?'

হাত চেপে ধরলে তারাপদ: 'বড়বাবু, আমি মিথ্যা বলছি না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আইনের ব্যাপার তো। হয় এক আর মামলা সাজানো হয় অন্যভাবে। সাক্ষী ঠিক করুন গিয়ে। আর টাকা লাগবে।'

'কত স্যার ?'

'হাজার পাঁচেক। না হলে কাল সকালেই আপনি অ্যারেস্ট হবেন। দালাল কেষ্টদয়াল থাকে আপনার পাশের গাঁয়েই। সে আপনার টাকা-পয়সা আছে জানে বলে গৌর সামন্তর পক্ষ নেবে। সাক্ষী সমেত আপনাকে আসামী দাঁড় করিয়ে

গৌরের ভাই বা বউ যে কেউ থাকুক তাকে-দিয়ে আজই কেস করে অ্যারেস্টের পরোয়ানা বার করে দেবে। কোর্ট-কাছারি তার নখদর্পণে।'

তখন হাজারখানেক টাকা—যা তারাপদ নিয়ে গিয়েছিল—গুঁজে দিলে বড় দারোগার হাতে।

বড়বাবু তা মন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে গুনে দেখলেন। সিগারেট ধরালেন। চিন্তা করতে লাগলেন যেন। হঠাৎ বললেন, 'ঠিক আছে, কনসিডার করলাম, তিন হাজার দেবেন।'

'না, স্যার, দু হাজার।'

'পাঁচশো দিতে হবে কেষ্টদয়ালকে। সে যে কেস আনে আমাকে দেয়। এক্ষুণি তার কাছে চলে যান। সকালেই আমি পুলিস নিয়ে নিজে যাচ্ছি। সাক্ষী ঠিক রাখুন তিন-চারজন। তাদের কিছু টাকা দিয়ে দেবেন। শুধু সঙ্গে ছিল—চুরি করতে দেখেছে এই বললেই হবে।'

তারাপদ কেষ্টদয়ালকে ডেকে নিয়ে এল। খুন দেখালে। কেষ্টদয়াল বললে, 'বাঃ! ঠিক করেছেন। শালা, মানুষ কত কষ্টে ফসল ফলাবে আর ফুঁকে গালে তুলবে এরা।'

গৌর সামন্তর বউ খবর পেয়ে ছেলে কোলে নিয়ে এসে বুক চাপড়ে, মাথা কুটে কাঁদছে। ছেলেটা কাদা-ধুলো মেখে কাঁদছে গড়াগড়ি খেতে খেতে।

কেষ্টদয়াল গৌরের বউকে বললে, 'কাঁদছ এখন! ভাতার রোজ 'আত্তিরে' বড্ড উপায় করে আনত না? উপায় বেরিয়েছে তো?'

'পাজীর পা-ঝাড়া' দালালকে তারাপদ সশ্রদ্ধায় এনে বৈঠকখানায় বসিয়ে ডাব, মুড়ি, গুড়, নারকোল খেতে দিলে। পাঁচশো টাকা দিলে।

তখন কেষ্টদয়াল দয়ার অবতার হয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বললে, 'কোন্ শালা আপনার কি করতে পারে করুক তো দেখি!...'

বড় দারোগা এসে রিপোর্ট নিলেন। বাবুরাম, হীরু, চক্রধর আর ইসমাইল সাক্ষ্য দিলে। দারোগা পুলিসদের খেদমতবাদ তারাপদর পেটে ভাত পড়ল সেই বিকেলে। গৌর সামন্তর লাশ চালান গেল থানায়।

তারাপদর কিছুই হল না আর। টাকা গেল শুধু হাজার পাঁচেক।

আর তার ফসল চুরি যায় না কোনোদিন। তাকে দেখলে সবাই নমস্কার করে।

তারাপদ ধাড়া একটা মানুষ বটে। যে নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়েছে। যে নিজেকে বাঘের মতন লড়াই করে বাঁচাতে পারে।

লখিন্দর-নিয়তি

ঘন সবুজ হোগলা বন। এক-বুক জল, ভরা-ভাদ্দরে। ডিঙি বেয়ে লগি ঠেলে চলে লখিন্দর মাইতি। খুব সন্তর্পণে। চারদিকে উলু মাঠ, ফুলে ফুলে সাদা কাশবন। আসমান-দোলা লতা ভরা বট-পাকুড় গাছ, বন-জঙ্গল চারদিকে। নামাল জমিটা প্রায় একশো বিঘের মতো। হোগলা, গড়গড়া ঝড়া আর শোলা বনে ভরা। কেউটে খরিশের নিরাপদ আশ্রয়।

হলুদ-হলুদ শোলার ফুল আর ছোট ছোট তেঁতুলপাতার মতন সবুজ পাতায় বিচিত্র শোভাময় জলজঙ্গল। কাঠ-শোলার গাছে নানান পাখির কাকলী। শালিক, গাঙশালিক, মাছরাঙা, ধান-খইরি, জলপিপি, কাদা-খোঁচা, ডাহুক, শামুকখোল, মানিকজোড় পাখিরা শব্দ তুলে হুহু করে উড়ে পালায় মানুষের সাড়া পেলে। অবিকল কেউটের মতন ফণা তুলে জলে ভাসে পানকৌড়ি। হঠাৎ জলে ডুবে গিয়ে, অনেক দূরে উঠে উড়ে পালায়।

লাল তারার মতন দুপুরে-ফুল ফুটে আছে চারদিকে। নির্মল নীল আকাশে সাদা দুধের মতন মেঘের চূড়া দূর কবরডাঙার শ্বেত-শিমূলের ডালপালা ভরা দিগন্তে দুপুর-রোদে যেন হাসছে। এদিকে মোল্লাদের পানবরোজ, ওদিকে ভাগাড়েদের উলু-মাঠ, তার ওপারে ধানবন, হাজরাপাড়া,– চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ।

শোলার বনটার মধ্যে ডিঙি ঠেলে আসতে আসতে লখিন্দর মাইতি দু'বার থমকে দাঁড়াল। সারাদিন মাছ খেয়ে মোটা মোটা গেঁড়িভাঙা কেউটে আর জল-ঢোঁড়া সাপ শোলা গাছের ডালপালায় উঠে জড়িয়ে পড়ে চক্ষু মুদে ঘুমোচ্ছিল। সাড়া পেয়ে চিক্‌চিক্ করে জিব বার করে। লখিন্দর 'চৌকি' ডাক করলে সড়াং করে জলে পড়ে গিয়ে ডুবে ডুবে কোথায় পালিয়ে যায়। লখিন্দর গজগজ করে: 'যা শালারগুলো, এবার উলুমাঠে উঠে যেয়ে গর্তে ঢুকে পড়। মা মনসার দোহাই!'

শোলা বনের মধ্যে একটা বিল আছে। সেখানেই মাছ শিকার করতে এসেছে লখিন্দর। মালিকদের এই বিল থেকে মাছ চুরি করে অনেকের সংসার চলে বর্ষাকালটা।

লখিন্দর দেখলে বিলের চারদিকে ছিপ পুঁতে জাওলা দেওয়া আছে। দুটো

ছিপে মাছ লেগে হুড়োমুড়ি করছে। কেউ কোথাও নেই। ডিঙি ঠেলে ওপারের দিকে গেল লখিন্দর। ওপাড়ার মেয়েরা শামুক, কলমিশাক, শাপলা, ভেঁট তুলতে আসে। পুরুষরা আসে মাছ মারতে। বঁড়শিতে পুঁটিমাছ গেঁথে 'টানা' দিয়ে ভেকৃটি (ভেকুট) মাছ শিকার করতে। এখন কেউ নেই। কার 'জাওলা' কে জানে!

লখিন্দর একটা জাওলা-ছিপ টেনে তুলে আধ কিলোখানেক ভেকৃটি মাছটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার যেমন ছিল ছিপটা পুঁতে দিলে। অন্য 'ছিপটায় গেঁথেছে নিশ্চয়ই বড় মাছ। জলের নিচে তোলপাড় করছে মানুষ দেখে ভয়ে। একটু টেনে তুলতে দেখলে, 'আরে ব্যাস! শালা, বেরোদ্দ পদ্ম-গোখরো! থাক্ অমনি। ছেড়ে গেলে ঘায়েল করতে পারে।' চৌকি দিয়ে গাঁথলে ছাড়ানোও এক ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া যাদের ছিপ, দেরি হলে এসে দেখে ফেলতে পারে। তখন ঝগড়া গালাগালি করবে। মুখখিস্তি করে মা-মাসি উদ্ধার করবে, অথচ তুমি অপরাধী বলে একটা 'আধ্না' কথাও বলতে পারবে না।

লখিন্দর মাছটাকে গামছায় জড়িয়ে বেঁধে রেখে ডিঙি ঠেলে আবার দক্ষিণ-দিকের উলুমাঠের কোলের দিকে চলে এল।

পাঁচ টাকা করে দিলে আধ কিলো মাছে আড়াই টাকা হবে। যাহোক, ফকোট্‌সে এমনি এমনি উপায় হয়ে গেল আজ এসে পড়েই!

ভগবানের নাম জপ করে পাঁচ 'কালা'র তীক্ষ্ণধার চৌকিটা কপালে ঠেকিয়ে নিয়ে তার লম্বা বারো হাত সরু বাঁশের ছড়টা বাগিয়ে ধরে শোলা বনের সীমান্ত থেকে বিলের জলের দিকে তাকিয়ে রইল লখিন্দর। ভেকৃটি-মাছ ভাসে শাপলা পাতার নিচে, জলডুমুর, শোলার ডালপালার আড়ালে, ওৎ পেতে। একটা কাঠি পেলে ভেকৃটি-মাছ স্থির হয়ে জ্বলন্ত চোখ মেলে ভেসে থাকবে শিকারের আশায়। সামনে কোনো কিছু চারা মাছ এলে গপ্ করে ধরে গিলে নেবে। সেই বড় শাল-মাছটার ঝাঁক এগিয়ে আসছে! চড়বড় চড়বড় করে শব্দ করছে আঙুলসমান বাচ্চাগুলো। হাজারখানেক বাচ্চা। পাঁচ-ছ' হাত জায়গা জুড়ে আসছে। ছুটে চিংড়ি মাছ ধরতে এল বিরাট বড় শাল-মাছটা। কেজি পাঁচেক হবে। বিড়ালের মতন বড় বড় চোখ। হাঁড়ির মতন মাথা। দেখলে শালাকে ভয় করে। লোকে তার গায়ের সিঁদুরে-রেখা দেখে বলে ঠাকুরের শাল! জলা-জাঙাল শুকিয়ে গেলে কোথায় যায় কে জানে! আবার বর্ষায় ডোবায়, বিলে, জলা-জাঙালে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর গায়ে কত লোক চৌকি, খোঁচ মেরেছে, কেউ রাখতে পারে

নি। শুধু চৌকিতে বড় বড় টাকার মতন আঁশ গেঁথে উঠে আসে। কালো বাবলা কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে মাছটা। মাদী মাছটা বড়। মদ্দাটা একটু ছোট মতন। সব মাছেরই তাই হয়। শালটা বার দুই ফুট দিলে বিরাট মুখ তুলে। মাছটা লখিন্দরকে দেখতে পেয়েছে। তবু যেন গ্রাহ্য করে না। ও-পাড়ার মেয়েরা ওকে দেখলে ভয়ে জল ছেড়ে উঠে পালায়। শাল মাছ নাকি তেড়ে এসে কামড়ায়।

লখিন্দর মনে মনে হাসলে। আস্তে আস্তে ডিঙি ঠেলে ঝাঁকটা যেদিকে ঘুরে সরে যাচ্ছে সেদিকে এগোলো।

বড় মাদী শালটা ভাসতেই চৌকি ছুঁড়তে গেল। শোলা গাছে জড়িয়ে যেতে রাগে গাছটাকে মড়াৎ করে মুড়ে ভেঙে দিয়ে আঙুল কামড়ালে আফসোসে। তারপর আবার তাক করলে। 'জয় মা কালী' বলে ছুঁড়ে মারলে চৌকি! ঠিক মাছের পিঠে নয়, নরম পেট লক্ষ্য করে মেরেছে। মারতেই এক ঝট্‌কা মেরে লখিন্দরকে দিলে মুখ গুঁজে টেনে ফেলে। চৌকিটা টেনে নিয়ে যেতে চায়। জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। নিচে ঝাঁঝ ঘাসে পা পড়তেই গায়ে যেন তার কাঁটা দিয়ে উঠল। অহেতুক অজানা করালকুটিল শ্যাওলাপচা কালো জলের ভয়। মাছটাকে চেপে ধরে রইল লখিন্দর। তারপর ঘায়েল হতেই টেনে তুললো। সত্যিই তো বিরাট বড়! কেজি পাঁচেকের কম নয়। গতকাল সারা বেলা শালা যেন 'নিশি'তে পাওয়ার মতন তাকে ঘুরিয়েছে। একটা মাছ মারতে পারে নি।

মাছটার পেটের পাশে চারখানা ফলা গেঁথেছে মোক্ষম। টেনে ছাড়িয়ে নিতেই মাছটা ল্যাজের সাপ্‌টা মারতে লাগল। তালগাছের খোলের সরু ডিঙিটা দেয় বুঝি উল্টে। মাছটা জোরে চেপে ধরে লখিন্দর। কী ভীষণ গুঁড়ি গুঁড়ি ধারালো দাঁতের রাশি মুখের মধ্যে! গামছা দিয়ে সেঁটে বাঁধে সে মাছটাকে। রক্তে গামছা হাত ডুবে যায়। তবু কত রক্ত জলে ভেসে গেছে।

আবার ডিঙি ঠেলে দক্ষিণে চলে এল লখিন্দর। জাওলার সাপটা তখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে ব্যস্ত।

শাল মাছ আবার সবাই খায় না। তিন টাকা কেজির বেশি কেউ দাম দেবে না। তাহলে পাঁচ কেজি হলে পনেরো টাকা দাম। কার মুখ দেখে আজ সকাল হয়েছিল তার! বোধহয় ছেলে বলরামের। চার বছরের ছেলে, এখুনি বাপের মতন মাছ মারার নেশা! একটা কঞ্চির মাথায় খেজুরকাঁটা ঢুকিয়ে ব্যাঙ গেঁথে বেড়ানোয় তার কি আনন্দ।

আর ভাসা মাছ দেখতে না পেয়ে বিড়ি ধরালে লখিন্দর। গুলিভাঁড় থেকে জ্যান্ত পুঁটিমাছ বার করে নিয়ে বঁড়শিতে গেঁথে ছিপ ফেলতে শুরু করলে। জলের মধ্যে পুঁটিমাছটা রুপোর মতন চকচক করে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ দেখার পর একটু সরে এসে যেই না শাপলা পাতাটার নিচে ফেলেছে, খট্ করে ধরল পুঁটির টোপটা কিসে! নিশ্চয় ভেক্‌টি। তারপর ডোরে টান পড়ল। হেঁচা মারছে। একটু আলগা পেলেই এক চক্কর মেরে গাংাসির ধারালো করাত দিয়ে ডোর কেটে দেবে। মারলে সঙ্গে সঙ্গে জোরে এক টান। উঠে এল একটা বুড়ো বেলেমাছ! নরম নধর সোনালী রঙ। বেলেমাছ বড় ভালবাসে বলরাম।

জলা-জঙ্গলের রানীর মতন হঠাৎ সেখানে উত্তর দিকের হোগলা বন ভেদ করে যেন উদয় হল উপেন হাজরার বউ। ডিঙি ঠেলে এসে জাওলা দেখেই তার চক্ষুস্থির! বড় মাছ মনে করে সেও জাওলা তুলে ভয়েই চিৎকার করে উঠল: 'ওরে বাবারে! একি গো মাইতি ঠাকুরপো!'

'কি গো বৌদি! সাপ নাকি?'

'হ্যা গো! আজদাহা! ছাইড়ে দে যাও না মাইরি, লক্ষ্মী ঠাকুরপো, তোমার দুটো পায়ে ধরি।'

কিন্তু যাবে কি লখিন্দর! ও যে মাছ দেখতে পেলেই ধানাইপানাই শুরু করবে। একটা না দিলে মালিকদের বলে দেবে। তারা গাল দেবে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করবে।

তবু গেল লখিন্দর। গেল অন্য কারণে। উপেন হাজরার বউ কালিন্দী দাসীর চেহারাটা যেন আদিবাসী মেয়ের মতন। সরু কোমর, ভারী নিটোল গঠন। নারকোল মালার মতন গোলাকার তুঙ্গ দৃঢ় দুটো বুক। চোখ দুটো সাদা সাদা। একপিঠ কোঁচকানো এলো চুল। কালিন্দী লগি ঠেলে হোগলা বন, শোলা বন ভেঙে আসে, শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে যায়—পরিশ্রম করে—তাজা শরীর। ওর স্বামী উপেন হাজরা খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে কাঠের গাড়ি থেকে কাঠ পায়ে পড়ে গিয়ে কাঠ সাজাবার সময়ে। ওকেই সংসার চালাতে হয়। রক্ষে যে ছেলে-পুলে নেই। দুটো-একটা ছেলে হয়েছিল নাকি সেই প্রথম দিকে—তারপর তার মদ্দমানুষটাই রুগ্ন হয়ে গেল—আর ছেলেপুলে!

লখিন্দর এসে হাতে চৌকিটা নিয়ে কালিন্দীর ডিঙিতে আসতে চাইলে। কেননা ওর ডিঙির পাশে ডিঙি ভেড়ালেই মাছ দেখতে পাবে। তাই হাত বাড়িয়ে বলে, 'ধরো, পড়ে যাব।'

হাত বাড়িয়ে দিলে কালিন্দী। চোরা হাসি তার চোখে।

লখিন্দর ওর হাত ধরে নিজের ডিঙি থেকে আলতোভাবে কালিন্দীর ডিঙিতে এল। ডিঙিটা তালগাছের। গোড়ার দিকটা মোটা, ডগাটা সরু। সব সময় টলটল করে। একটু এদিক ওদিক ভর বেশি পড়লেই জল উঠে ডুবে যাবে। লখিন্দর নিজে ইচ্ছে করে দোল দিলে কিংবা কালিন্দী পাছা হেলিয়ে এক পায়ের ভর রাখলে একদিকে কিনা ঈশ্বর জানে, লখিন্দর একেবারে সামনাসামনি জড়িয়ে ধরলে কালিন্দীকে। হাত থেকে চৌকিটা পড়ে গেল জলে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। দুজনেই হাসছে। ডিঙি টলমল টলমল করছে।

কালিন্দী বললে, 'এই মিনসে! দ্যাখো কাণ্ড! যায় বুঝিন উল্টে!'

'তুমিই তো দোল দিচ্ছ! ধজিটা ধরবে তো লা…'

সাপটা এবার বিষম বিক্রমে ঝেড়ে উঠে বঁড়শির আঁকড়ি খুলবার জন্যে ডোরের দড়িতে পাক দিয়ে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ লখিন্দর বেহায়া বুনো ভল্লুকের মতন কালিন্দীর মুখে মুখ দিয়ে মধু খেতে শুরু করতেই তার পিঠে চিমটি কেটে দিলে কালিন্দী। আর হাসতে হাসতে বসে পড়ল। শুয়ে পড়ল সে। লখিন্দরও। ডিঙির টলমলানি বন্ধ হল বটে কিন্তু কালো জলে ঢেউ কাঁপতে লাগল।…

সাপটার হঠাৎ মুখ ছিঁড়ে গেল!

ছাড়িয়ে ফেলেই সে ডুব মারল বিলের ঝাঁঝঘাসে ভরা আঁধার কালো জলে। বুড়বুড় করে বুজ্‌কুড়ি তুলে ওপারের দিকে চলে গেল নিরাপদে।

কালিন্দী কিছুক্ষণ পরে উঠে বসে মাথার এলো চুল হাতে পাক দিয়ে বাঁধতে লাগল উদোম বুকে। বললে: 'এ কি করলে তুমি ঠাকুরপো! পাপকাজ করলে তো?'

'পাপ!' হাসলে লখিন্দর: 'নরকের আগুনটা দেখতে পাচ্ছ নাকি? পাপ! শালা গরিবদের জীবনে সব কিছুতেই পাপ। তুমি যদি পাপ মনে করো তবেই পাপ। দুজনেই যদি চাই, পাপ কোন্ শালা বলে?'

কালিন্দী বললে, 'উপেন হাজরা জানতে পারলে কি মনে করবে! ধরো তোমার বউ যদি উপেন হাজরার সঙ্গে এমনি করে?'

লখিন্দর বললে, 'তার সে সাহস নেই। পাপ করে সাহসীরাই। তারা জীবনকে ভোগ করে। মরেও হঠাৎ বাঘের মতন পাঁচদিন পরের ঘাড় মটকাতে মটকাতে হঠাৎ একদিন তার নিজের ঘাড় মটকে যায়।'

বলতে বলতে নিজের ডিঙিতে লাফ দিয়ে চলে আসবার সময় হঠাৎ হুড়মুড় করে জলে পড়ে গেল লখিন্দর।

'হরি—হরি! হরিবোল হরি!' হাততালি দিয়ে বসে বসেই যেন নাচতে লাগল কালিন্দী। খুব আমোদ পেয়েছে সে।

লখিন্দর উঠে পড়ে বলে, 'গা যেন শালা কাঁপত্তেছে এখনো। তুমি না বৌদি—মাইরি, সব শালা, ইয়ে মানে…'

পরনের গামছাটা মুঠো করে নিংড়াতে নিংড়াতে বেলে আর ভেক্‌টি মাছ দুটো দিয়ে দিলে কালিন্দীকে।

কালিন্দী খুব খুশি। বললে, 'বেলেটা নিয়ে যাও তোমার ছেলের জন্যে।'

কারা যেন ওদিকে কথা বলছে না? কান পেতে শুনলে দুজনে। মোল্লারা বোধহয় পানবরোজে আসছে।

কালিন্দী বললে, 'মালিকরাও মাছ-চৌকি দিতে আসে। পালাই চলো।'

লখিন্দর হাত তুলে ইশারা করেই চকিতে শোলা বনের মধ্যে দিয়ে হোগলা বনের গভীরে চলে এল। কালিন্দীও চলে গেল ডিঙি ঠেলে তাদের পাড়ার দিকে।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। মালিকরা দেখতে পেলে সড়কি ঝেড়ে পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিয়ে হোগলা বনের মধ্যে পুঁতে রেখে যেতে পারে।

খালের মধ্যে এসে তীরবেগে ডিঙি ঠেলে একেবারে বাড়ির ঘাটে এসে পৌঁছে ডাক দিলে লখিন্দর: 'বলরাম! কইরে আমার বাপধন?'

বলরাম বাপের সাড়া পেয়ে ছুটে এল। তার মাও এল। লখিন্দরের হাঁক শুনেই বুঝতে পেরেছে মিনসে আজ মাছ বাগিয়ে এনেছে সুনিশ্চিত।

মাছ নিয়ে উঠে এসে বলরামের মাথায় তুলে দিতে সে বললে, 'ওলে বাপলে! ছালা বল মাছ!'

মাছ দেখে কিন্তু আতঙ্কিত হল মন্দাদরী। বললে, 'ও মুখ-লুকুনে মিনসে, তুমি শেষকালে এই মাছ মেরে আনলে! কোনো অমঙ্গল হবে না তো? বাড়ির মধ্যে আর নিয়ে এস না। যাও, বেচে এস গিয়ে।'

বেলেমাছটা হাতে নিয়ে মহাখুশিতে নাচতে লাগল ন্যাংটা পুঁটে বলরাম।

শাল মাছটা গামছায় বেঁধে নিয়ে পাকা রাস্তার মোড়ে গেল লখিন্দর। মাছটা দেখার জন্যে সবাই ভিড় জমালে।

প্রবোধ মালিক বললেন, 'লখিন্দর মাইতি মাছ শিকারে ওস্তাদ। তা বাবা

কোত্থেকে মাছটা বাগানো হল শুনি! এ মাছ তো কেউ আর মারতে পারে না—তুই শেষকালে মারলি! তোর ভাল হবে না। কে ও মাছ খাবে?'

লখিন্দর বললে, 'কেউ না খায় আমার নিজের পেট তো আছে। ফেলা তো যাবে না? সব শালমাছের চাকা-চাকা চোখের মতন দাগ থাকে। পিঠের ওপর দিয়ে লাল রেখা থাকে।'

'ঐ লাল রেখাই তো মারাত্মক। লাল মানেই সাবধান-চিহ্ন। যে সব বোড়া সাপের—যেমন শিয়রচাঁদা, কালনাগিনী—গায়ে বা মাথায় লাল সিঁদুরে দাগ থাকে, সে ছুঁলে কারও বাপের সাধ্যি নেই বাঁচায়!'

প্রবোধবাবুর ওপরে চটে যায় লখিন্দর। বলে, 'তুমি যাও তো বাপু, আমার খদ্দের ভাগাতে হবে না। তোমার বিল থেকে মাছ মারিনি।'

একজন খদ্দের মাছটার দরদস্তুর করে। মুদিঅলা হাসমদ্দি জমাদার। বলে, তিন টাকা করে দিতে পারি। হয়তো আন্, পাল্লায় চাপাই—নগদ দাম নিয়ে নে।'

'না বাপু, চার টাকা। পাঁচ টাকা করে চিংড়ি মাছ বিক্রি হচ্ছে। এ অঞ্চলে যত মাছ ঘুনি-আটলে বা গঙ্গা থেকে পড়ে, সব বাসে করে ভোরবেলাতেই কলকাতায় চলে যায়। মাছ পাবে কোথায়? দশ টাকা বড় চিংড়ি। এগারো টাকা ইলিশ।'

হাসমদ্দি চলে গেল। আবার এল। আবার সেই একই কথা। লখিন্দর শেষে বাড়িতে খাবে জানিয়ে মিছে ভান করে চলে যেতে গেলে হাসমদ্দি মাছটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দোকানের কাঁটা-পাল্লায় তোলে। চার কেজি সাড়ে সাতশো। সাড়ে তিন টাকা করে কেজি দরে হিসেব করে দাম ফেলে দেয়। ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে। বারো পয়সা কম। কিছু আর বললে না লখিন্দর।

চাল ডাল আলু আনাজ কিনে নিয়ে চলে এল সে। ছেলের জন্যে কয়েকটা ফুলুরী কিনে নিয়ে বাড়িতে চলে এল। সারা বিকেলটা ঘুম দিয়ে কাটালে।

পরদিন সকালে একবার চৌকি নিয়ে ধানবনের দিক থেকে বিফলমনোরথে ফিরে এসে খালের ঘাটের গোড়ায় দেখলে কিসে যেন পাকনা মারছে জলের মধ্যে! কোন বড় মাছ নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই বড় রুই বা কাতলা!

তাক করে-করে হঠাৎ গায়ের জোরে ঝেড়ে দিয়ে জোরে চেপে ধরে রইল সে কতক্ষণ। মাছটা জোরে পাক খাচ্ছে। চৌকি যেন ঝোনা মেরে মেরে ছাড়িয়ে ফেলতে চায়। রক্তে উপরের ঘোলা জলটা লাল হয়ে গেছে।

চৌকি টেনে তুলেই হঠাৎ চিৎকার করে ডুকরে বুকে চাপড় মেরে কেঁদে উঠল লখিন্দর : 'বাবারে আমার বলরাম! বলরাম রে! তোকে আমি গেঁথেছি। হায় কপাল!…' লখিন্দর আছড়ে বসে পড়ে কাদা-মাটিতে মাথা কুটতে লাগল।…

তার মা ছুটে এল খবর শুনে। দৃশ্য দেখেই খালধারে ছেলের কাছে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল 'আমার বলরাম' বলেই। মন্দাদরী টিউওয়েলে জলের জন্যে গেছিল নাকি। ছেলেটা রোজ যেমন ব্যাঙ মারার বা মাছ ধরার খেলা করে খাল ধারে এসে তেমনি আজও এসেছিল। কে জানত সে জলে পড়ে যাবে! আর ঠিক সেই সময়ে লখিন্দর ঘাটে এসে মাছ মনে করে তার ছেলের দেহের ওপরেই পাচফলার ধারালো চৌকি ঝেড়ে বসলে!

পুত্রের লাশ দাহ করবার অধিকার পেল না লখিন্দর অঞ্চলপ্রধানের হাতে-পায়ে ধরা সত্ত্বেও। তিনি বললেন, 'আমি জলে ডোবার রিপোর্ট দিলেও আমার বা তোমার ওপরে শত্রুতা করার লোক ঢের আছে। মালিকদের বিলে চুরি করে মাছ মারতে তারা শাসিয়ে গেছে, শালাকে এবার দেখব।'

অগত্যা থানায় বলরামের লাশ চালান গেল। লখিন্দরও স্বীকার করলে মাছ মনে করে তার ছেলেকে চৌকি দিয়ে গেঁথে মেরেছে।

অগত্যা লখিন্দরের পুত্রহত্যার দায়ে জেল হল। লখিন্দর শুধু কপালে করাঘাত করে বললে, 'সেই ভাল! আমার জেল কেন, মরণ হলেই ভাল ছিল!'

মন্দাদরী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল : 'ওগো, তুমি ঐ শালমাছ মেরে কি অভিশাপে পড়লে গো! ওগো আমার কি হবে এখন গো!'

কালিন্দী দাসীও চোখের জল মুছতে লাগল গোপনে : 'ঠাকুর, আমার ঠাকুরপোর সর্বনাশ করলে কোন্ পাপে!'

দৌলত মিয়া ও পাহাড়ী যুবতী

'বাবু, একটা বিড়ি দিবি ?'

'বিড়ি আমি খাই না।'

'ছিগারেট ?'

'তা খাই। নেবে ?'

'দিবি !' খুব উৎসাহ বোধ করে পাহাড়ী উপজাতীয় মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ধরল। সিগারেট দিতে মেয়েটি বললে, 'শিলাই ?'

ফোঁ করে কাঠি জ্বেলে কালো যুবতী চেহারার মেয়েটি তার হাতের রঙিন চিত্তির আঁকা তালু আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ফাঁকা ছোট একটা স্টেশন। লোকজন নেই। কার্তিক মাসের শেষ দিক। কুয়াশায় চারদিকটা ঘোলাটে—প্রায় অদৃশ্য।

স্টেশন মাস্টার বললে, 'রাত বারোটায় একটা ট্রেন আসবে—তার আগে নয়। পথে গণ্ডগোল। ট্রেন আটকে ডাকাতি করছিল। ধরা পড়েছে।'

ছোট একটা ওয়েটিং রুম। একটা বেঞ্চিতে আমি বসে আছি। কি কুক্ষণেই না সভা করতে এসেছিলাম ! এখন সেই রাত বারোটা পর্যন্ত বসে থাকো !

একটা বালব্ জ্বলছে ঘরের মধ্যে। ম্যাড়মেড়ে আলো। ময়লা কাঁথার মধ্যে একটা লোক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল। মেয়েটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটাকে ঠেলা মেরে মেরে তুললে। আধখানা খাওয়া সিগারেট টানতে দিলে তাকে। মুখে ধরে দিলে। কারণ হাত নেই লোকটার। একটা হাতের কনুই থেকে কাটা। অন্য হাতটা কব্জি থেকে। লোকটার মুখের আদল দেখে মনে হল বাঙালী।

লোকটা বললে, 'এরই মধ্যে হিম পড়ে গেল বাবু—দোরটা বন্ধ করে দাও।' মেয়েটাই উঠে দোরটা বন্ধ করে দিলে।

'আপনি কোথা যাবে বাবু ?'

'কলকাতায়।'

'আমরাও যাব।'

'তোমার নাম কি ?'

'দৌলত মিয়া।'

'হাত কাটল কি করে ?'

'সে বাবু অনেক কথা।'

ঘড়ি দেখলাম, মোটে ন'টা পনেরো। ঠায় তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। অথবা……

'সারারাতও এখানে কাটতে পারে বাবু। শালার 'টেরেনে'র কোনো ঠিক নেই।'

'তাই বটে! দোকানপাট, ভেণ্ডারও সব বন্ধ। কেন বল তো ?'

'সন্ধ্যায় এখানে খুব মারামারি হয়েছিল। দুটো দল খুব একচোট লাঠিবাজি করেছিল। বোম-পট্কা পড়েছিল। পুলুস ধড়পাকড় করে নিয়ে গেছে। তাই সব দোকানপাট বন্ধ। ইস্টিশন মাস্টারও এতক্ষণে ঘুমোচ্ছে।'

'আমাকে বলেছেন রাত বারোটায় গাড়ি আসবে।'

'ও শালা বুড়োর ঐ 'রহম' আশা দেওয়ার কথা। আমাকে বলেছে রেলের পাটি তুলে ফেলেছে। সে সব বসালে তবে।

'ডাকাত ধরা পড়েছে নাকি!'

'হঁ। তারা রেলের পাটি তুলে রেখেছিল।'

নিরাশ হয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তি-অবসাদ, যেন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। সন্ধ্যার পর মিটিং শেষ হল। সামান্য কিছু মিষ্টি খাইয়ে ছেলের দল রিকৃসায় করে এই স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করে চলে গেল। হাতের ফুলের মালাটার দিকে মেয়েটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। সেটিকে দূর করে ওর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল। ঠেলে সরিয়ে রেখে আমি একটু আড় হলাম। ব্যাগের মধ্যে শতখানেক টাকা আছে। তা নিয়ে আর এক রকমের ভয়।

মেয়েটার চেহারা ভাল। তবে চোখের কোলে কালি। মুখে যৌনক্ষুধা প্রকট। মেয়েটা ফুলের মালাটা হাতে নিয়ে একবার গভীর শ্বাস টেনে শুঁকল। তারপর 'আঃ!' করে খুশীর শব্দ করল মুখ থেকে। আবার মালাটা রেখে দিলে।

দৌলত মিয়া বললে, 'হাত দুটো না গেলে আমি কি আর এই 'অবস্থায়' পড়ে থাকি বাবু ? থোকা চারশো টাকা মাইনে পেতাম। জাহাজে বড় 'মিস্তিরি' ছিলুম। কত চোরাই-মাল সাপ্লাই করতুম জাহাজ থেকে। রেডিও, ঘড়ি, টাইপ-রাইটার, ক্যামেরা কত কি! হরদম বিলিতি মদ খেতুম। আর 'রাণ্ডী-মাণ্ডী' করে পয়সা ওড়াতুম। শেষে আমার মামু এসে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে শালা মোর সাদি দিয়ে দিলে। ছোটবেলায় মা বাচ্চা রেখে মারা গেলে মামুর বাড়ি

থাকতুম। মামুর বাড়ি থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করে ধরা পড়ে মার খেয়ে সেই যে আঠারো-বিশ বছর বেলায় শহরে পালিয়ে এনু আর যাইনি। পয়লা হোটেলের খানসামার কাজ করতুম খিদিরপুরে। চুরি করে বেশি 'গোস্ত' খেয়েছিনু বলে হোটেলঅলা একদিন মারলে। আমিও শালা পানির জগ ছুঁড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে দে ছুট! তারপর হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এক ঝালাই কারখানায় কাজ করনু এক বচ্ছর। সে কাজ ছেড়ে পেটভাতায় মোটর কারখানায় কাজ শিখতে এলুম রাজাবাজারে। সেখানে এক বুড়ো জাহাজী মিস্‌তিরির সঙ্গে দহরম-মহরম হল। সে আনলে ডকের কাজ শিখতে। এ-জাহাজ সে-জাহাজে কাজ। কাজে আনন্দ পেলুম। বুড়ো মদ খাওয়াতে শেখালে। তারপর মিস্‌তিরি হয়ে গেনু মুই। তিন বচ্ছর বাদে বড় মিস্‌তিরি 'ইন্তেকাল' করলে (মারা গেলে) আমি তার 'পোস্টো' পেয়ে গেনু। তখন ভাল একটা বাসা নিইচি। একজন কাওয়াল আমার বাসায় থাকত। তার কাছেই কাওয়ালী গান শিখি। একদিন মামুর বাড়ি গেনু হঠাৎ সেরপাঁচেক মেঠাই নিয়ে। তারা খুব খুশী। মামু রোজগার করছি শুনে সাদী দিয়ে দিতে চাইলে। আমিও মত্ দিনু। কেননা বাইরের বেউশ্যে মাগীতে সুখ নেই। সব সময় শালা বড় 'ডেনজার'। কতবার সোডার বোতল ফেটেছে মাথার ওপরে। একটা নয়চা যুবতী মেয়ের টাট্‌কা 'যৈবন' পাবার আশায় মামুর হাতে দুশো টাকা তুলে দিয়ে এনু। মামু দিনক্ষণ ঠিক করে মৌলবী ডেকে সাদি পড়িয়ে দিলে। তিনদিনের কনে এল মামুর বাড়ি। দেখা হয়নি তার শরীল মুখ। তারপর সে বাপের বাড়ি চলে গেল। ফের মাসচারেক বাদে বউ আনতে গেলুম মুই। বউ এনে এক রাত মামুর বাড়ি রইনু। বউটার নাম আক্‌লিমা। বড্ড লজ্জাটে। ঘোমটা খোলে না।'

কথা শুনে দৌলতের সঙ্গে মেয়েটি হাসতে লাগল।

আমি ওদের দুজনকে আবার সিগারেট দিলাম। নিজে ধরাবার পর খালি বাক্সটা ফেলে দিলাম দূর করে।

দৌলত মিয়া সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে জুত হয়ে একটু বসল। মেয়েটা গুরু নিতম্ব হেলিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল, আড়চোখে তাকাতে তাকাতে। ওর গায়ে একটা লাল কুর্তো, একেবারে খাটো। পরনে একটা নীল রঙের ছাপা শাড়ি। মাথার চুলগুলো খোঁপাবাঁধা।

দৌলত মিয়া বলতে লাগল, 'বউ বড্ড লজ্জাটে। কিছুতেই মুখ দেখাতে চায় না। নানীকে বললুম, নাক চোখ নেই নাকি? চাপা খোলে না কেন? নানী

বললে, বাসায় 'লিয়ে' যেয়ে চোখ ফরসা করে দেখিস। দুটো 'লয়', চারটে চোখ আছে। যাই হোক একটা কালো রঙের 'সিলিকে'র বোরখা ঢেকে আমার 'পরিবার'কে নিয়ে তো শহরে আসব বলে বেরুলুম। রেল ইস্টিশনে টিকিট কেটে জয়নগর থেকে সোনারপুর জংশনে গাড়ি বাঁধল। বউ কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, 'পানি খাব।' আমি তাড়াতাড়ি একটা দোকান থেকে সোডা পানি এনে দিতে সে বোরখার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই শালা, আর ফুরোয় না। বললাম, তাড়াতাড়ি করো, গাড়ি ছেড়ে দেবে—ঘণ্টা বেজে গেছে। তারপর বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেণ্ডারে দিয়ে ছুটে আসতে গেলাম। 'টেরেন' গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ কিসে ধাক্কা লাগল। হাতলটা ধরেও ধরতে পারলুম না শেষ কামরাটার। পড়ে গেলুম তলায়। হাত দুটো কখন কেটে গেল জানিনি। পড়বা মাত্তেরেই আমি মনে করেছিনু মরে গেছি। জ্ঞান হল হাসপাতালে, দুদিন পরে। বউ কোথা জিজ্ঞেস করতে নার্স মেয়েরা হাসতে লাগল। বোরখা ঢাকা সেই বউ আমার সাতশো টাকার সোনার গয়না নিয়ে কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না। তারও মা-বাপ কেউ ছিল না। মামুর বাড়ি মানুষ। তার মামুরাও খোঁজ পায়নি। আমার 'অবস্থা' দেখে সবাই আফসোস করতে লাগল। দিনকতক মামুর বাড়িতে রইলুম। তারপর তারা দূর-ছি করতে লাগল।'

'মামী বললে, 'ভিগ মাগো যেয়ে। বোজ রোজ কে বসিয়ে খাওয়াবে।'

'তাই ভিক্ষে করতে বেরুলুম। পথে চলতে চলতে খুব কাঁদলুম। আমার চারশো টাকার চাকরি—নতুন বোরখা ঢাকা গয়না মোড়া বউ—সব কোথায় চলে গেল! তারপর পথ থেকে পথে।...'

আমি শুধোলাম, 'তা এই মেয়েটি কে? কোথা থেকে জোটালে?'

দৌলত মিয়া তার মুলো হাতটা দিয়ে মুখটা একবার মুছলে। বললে, 'ওর নাম পিয়াসী। ওদের একটা মাগীর দল ছিল। একটা বুড়ো ঢোলক বাজাত আর ওরা নাচ-গান করত। বুড়োর নাতনী পিয়াসী। আমি ওদের গান শুনে বললুম আমাকে তোদের দলে ঠাঁই দিবি—কাওয়ালী গাইতে পারি। আমার কাওয়ালী শুনে ওরা খুব আদর করলে। পিয়াসীও গাইতে পারে খুব ভাল। বাজাতে পারে। নাচতে পারে। আমার কাওয়ালীতে বেশ উপায় হতে লাগল। যখন আমি ওদের দলে ভিড়ি তখন সবে পিয়াসীর 'যৈবন' এয়েছে। ওর 'যৈবনে'র দিকেই মানুষের লক্ষ্য। ভদ্দরলোকরা গান শোনে বটে, কিন্তুন শালা ওর

দিকেই চেয়ে থাকে !'

পিয়াসী চিত হয়ে শুয়ে হাতের একটা ধাক্কা দিলে দৌলতকে। তার শরম লেগে গেছে ওর কথায়।

'তা সত্যি কথা বলতে কি বাবু, পিয়াসী শুনলে হয়তো চটে যাবে—আজ বলছি একটা মস্ত পাপ আমি করেছিনু।'

কৌতূহলী চোখে পিয়াসী তাকাল দৌলত মিয়ার দাড়িভরা গুরুগম্ভীর মুখটার দিকে।

দৌলত বললে, 'গাছতলায় আমরা একদিন ঘুমুচ্ছিলাম। পিয়াসীর সঙ্গে তখন আমার দেহের মিল মনের মিল হয়েছিল। যুক্তি করেছিলুম দুজনে পালাব। দুজনের আলাদা উপায় বেশি হবে। সুখে থাকব। তিনটে 'যৈবন' যাওয়া আধ বুড়ীদেব আমরা টানব কেন? আর আমি নিজে ভাবলুম—এই বুড়োটাকেই আগে সরানো দরকার। কি করে মারব ভাবতে লাগলুম। গাঁয়ের সেই নির্জন মাঠে রাত্তিরে হঠাৎ বুড়োর গলাটা পা দিয়ে চেপে ধরে, কাপড় চেপে মেরে ফেললুম। শালার বুড়ো জ্বরে ভুগছিল। কাহিল চেহারা। তবু বার দুই যে রকম গাঁক গাঁক করে উঠেছিল ভয়েই আমার ...'

পিয়াসী বললে, 'হারামী!' তারপর সে একদিকে বেঁকে বসে রইল।

দৌলত মিয়াও শুয়ে পড়ল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে। এগারোটা বেজে গেছে।

পিয়াসী কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

দৌলত বললে, 'শুয়ে পড়। নিদ যা। টেরেন আজ আসবে না।'

সিগারেটও নেই।

দোর খুলে বাইরে এলুম। চারদিকে কুয়াশা। একটু দূরে একটা আলো, অনেক শ্যামা পোকা জমেছে তার চারপাশে।

পিয়াসীও বাইরে এল। দাঁড়িয়ে রইল আলো-আঁধারিতে।

পিয়াসী কাছে এসে বললে, 'একটা টাকা দিবি বাবু?'

আমি দ্বিধায় পড়লুম। যেন শুনতে পাইনি এমন ভান করলুম। সে আবার বললে, 'ফুলের মালাটা তুমার বউকে দিবে?'

'না। তুমি নিতে পার।'

'আমারে দিবি বাবু তুই?'

'হ্যাঁ।'

'একটা টাকা দিবি?'

'দৌলত মিয়া কিছু বলবে না ?'

'না।'

'দোব। তোরা গান শোনা তবে। গাড়ি আসবে না।'

ঘরের মধ্যে দুজনে ঢুকে পড়লাম আবার।

পিয়াসী ঢোলক কোলে নিয়ে বাজাতে শুরু করলে আস্তে আস্তে। তার হাতের সবুজ লাল চুড়িগুলো দুলতে লাগল।

দৌলত বললে, আপনি কি করো বাবু ?'

'কিচ্ছু না।'

'ব্যবসা আছে ?'

'না।'

'তবে পুলুসের লোক নাকি ?'

'তাতে ভয় কি ?'

'না, ন্যাংটোকে আবার বাটপাড়ের ভয় কিসের !'

পিয়াসী বললে, 'বাবু গান শুনবে। তুই গা রে মরদ।'

দৌলত মিয়া গান ধরলে। কাওয়ালী গান। ঢোলক বাজাতে লাগল পিয়াসী। চমৎকার গায় দৌলত মিয়া। অপূর্ব গলা। মেয়েটাও গাইল। রাত একটা পর্যন্ত আমি তাদের গান শুনলাম। দুটো টাকা দিলাম তাদের। খুব খুশী হল তারা।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। আলোটা নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওরা নিচে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছে। বাইরে পোকামাকড় ডাকছে।

ওরা কি যেন বলাবলি করছে ফিস ফিস করে।

সন্দেহ হল। আমি ঘুমোলে দুজনে চেপে মেরে ফেলতেও তো পারে ? টাকাগুলো নিয়ে পালাবে। পিয়াসীর ঠাকুরদা বুড়োটাকেও তো মেরে ফেলেছিল।

তবু ঘুমোবার ভান করে নাক ডাকতে লাগলাম।

হঠাৎ ঘণ্টা বাজতে লাগল।

ট্রেন এল তিনটের সময়। আলো জ্বেলে দিলাম। ওরা অঘোরে অচেতনভাবে পড়ে ঘুমোচ্ছে। পিয়াসী একখানি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে আছে দৌলত মিয়ার। দৌলত মিয়ার কব্জি থেকে কাটা হাতটা পিয়াসীর গায়ে পড়ে আছে।

অপূর্ব দৃশ্য !

জগতে বোধহয় ওরাই সুখী।

তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে হবে। ওদের আর ডাকলাম না। চলে এসে ট্রেনে উঠলাম। শুধু ওদের তুজনের গায়ের ওপরে রেখে এলাম রজনীগন্ধার মালাটা।

আঁধারের প্রাণীরা

চারটে আণ্ডা বেচে এক টাকা দিয়ে এক কেজি আটা কিনে এনে জল দিয়ে গুলে নিয়ে খোলাচি পিঠে করতে বসেছিল শের আলীর বউ লতিমন বিবি। প্রায় সোমত্ত হয়ে-ওঠা মেয়েটা পাড়ার পাঁচজনের বাঁশবাগান থেকে বাঁশের খোল কুড়িয়ে এনে রেখেছিল ঝাঁকা ভর্তি করে—তাই দিয়ে উন্নুনে জ্বাল দিচ্ছিল সে। কালো কোকিলের মতন মেয়ে—'ভাবোন' করে কলকাতার মেয়েদের পানা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরেছে। পেট-বার-করা বগ্‌লী একটা 'বেলাউজ' গায়ে দিয়েছে, কপালে এঁকেছে একটা শুকতারা, মুখে ঘষেছে মায়ের গম বেচে কিনে আনা হিমানী-পাউডার। মেয়েটার নাম তোতামন। তোতামন এত সাজগোজ করলেও ঠোঁট তুটো শুকিয়ে তার কুল-আঁটি। কাল সকাল থেকে তো কারো কিছু পেটে পড়ে-নি। কাল সকালে ট্যাড়োস ভাতে তুটি ভাত খেয়ে লতিমন পাঁচ কেজি চালের বুচ্‌কি নিয়ে শহরে গিয়েছিল। গ্রামের হাট থেকে একটু কম দামে চাল কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করে সেই টাকায় খিদিরপুরের ডক এলাকা থেকে চোরাই গম কিনে এনে গায়ের মানুষের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে সে। সঙ্গে যায় তার ছোট জা নূরখাতুনও। নূরখাতুন ধড়িবাজ মেয়ে, মুখের বচন শুনলে কাঁচা কাঠে আগুন ধরে যায়। তার চোখের চাউনি দেখলে আর বাসের কণ্ডাকটাররা ভাড়া চায় না। লাস্ট বাসে ফেরার সময় যখন সমস্ত যাত্রীরা উপশহরটাতে নেমে যায়, গ্রামের অন্ধকার নির্জন পথে কণ্ডাকটাররা বড্ড জ্বালাতন করে গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মাত্র হেডলাইটটা জেলে রেখে। ডালকুত্তার মতন যেন ছিঁড়ে খায় মদ-গেলা মদ্দামানুষগুলো। ভাড়ার ক-আনা পয়সার জন্যে শুধু নয়, চাল-গমটা তুলে দেয় ছাদে—কিংবা সীটের তলায় বাক্সর ভেতরে।

ছ'টা ছেলে-মেয়ে যেন কাকের মতন হা-হা করে, মার পাশে বসে। কাল থেকে খায়নি সব। কড়া থেকে তুলতে না তুলতে 'আমাকে দে মা—আমাকে

দে মা, উ-শালা মোদো তো ঘোষেদের নারকোল চুরি করে খেয়েছ্যালো—অকে দিবি কেন বেশি ? তোতা তো রহমানদের চার কলসী পানি বয়ে এনে দিয়ে চাট্টি খুদ-চচ্চড়ি খেয়ে এয়েছ্যালো—মোরা কচি ছেলে কাল থিনে শুক্কে আছি—খালি আঁজলা আঁজলা করে পানি খেইছি—দে মা আর একখানা পিঠে, তোর পায়ে ধরি।'

'খা, তোরাই খা, আমার আর প্যাটে কিচ্ছু পড়াং দরকার নেই!' ঠুকে সব বসিয়ে দেয় লতিমন। পরনে তার একখানা মাত্র সায়া। গায়ে একখানা ছেঁড়া মশারীর টুকরো ফেলে বুকটা নামমাত্র আড়াল করা।

ছোট জা শঙ্খ-কাটা করাত চালানো গলায় তার কুঁড়ের দাওয়া থেকে বলে, 'অ্যা! ছোঁড়াগুলো যেন ভাগাড়ের শকুনি—গরু পড়েছে যেন! একটু আর সবুর সয় নে। মানুষটা কাল থেকে পুলুস গুহোর ব্যাটাদের খপ্পরে পড়ে তাদের কাছে রাত গুজরান করে এলো—একটু থাক—জিরোক—না খেঁকামেকি!'

মোদো তার ছোট চাচীকে বললে, 'তুই শালী চুম্মার! তুই বুঝিন দিস?'

'ছোঁড়ার মুখ ছ্যাখ। মুই তোর শালী?'

'হাঁ, তুই শালী, তোর মা শালী, তোর বাপ শালী!'

হা-হা হি-হি করে ছোড-চাচী হাসতে লাগল।

শের আলী খোঁড়া পাখানাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার বাঁশবন-ঢাকা অন্ধকারে ভুঁইকুঁড়ের দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে বসে রেডিওর গান শুনছিল আর ওদের রকম দেখছিল। তার কোনো কিছু বলার ছিল না। বউ তাকে 'বাপ' বলেছে তিন-তিনবার। কাজেই নাকি তালাক হয়ে গেছে। সে আলাদা থাকে। আলাদা শোয়। কিছু চাল-ডাল যোগাড় করে আনলে মেয়েটা রান্না করে দিত আগে—লতিমনের তাও বারণ হয়ে গেছে। বঁটি দিয়ে কুঁচোবে নাকি তাহলে মেয়েকে!

শের আলী কাঁচা বয়সেই চটকলের 'সারভিস' তুলে নিয়ে দিনকতক খুব খেলে-দেলে বউ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে। মাছ-গোস্ত দুবেলা, ভাত রমারম চলল। দোকানের দেনা শোধ হল। মদ আর তাড়ি গিলে এসে মারামারি করে খুনজখম হল পাশের বাড়ির ডাকাত চেহারার লোক সাহাদত আলীর হাতে। সাহাদত ছুটে এসে কপালে গাছকাটারী মারলে শের আলীর। ছুটে গিয়ে পুকুরে না পড়ে গেলে জবাই করে দিত। অথচ সামান্য ব্যাপার নিয়ে বচসা বাধল। ছোট বউ নাকি ঘোষেদের কাটা ধানের পাই থেকে এক চুবড়ি ধানের

শীষ কেটে এনেছিল। ঘোষেরা সাহাদতদের ক্ষেতের ধান দেখতে বলে গেছে। তাদের বাস্তর নিচেই জমি। ধান চুরির কথা বলতেই নূরখাতুন গালাগালি শুরু করলে। 'কুন আঁটকুড়ির বেটি বলে র‍্যা—মুই ঘোষেদের ধান চুরি করিচি! ঘোষেরা কি তাদের ভাতার হয়, না নাঙ (নাগর) হয়?' তারপর দু'বাড়ির মেয়েতে মেয়েতে পচাল গালাগালি—দুপুরে পুরুষরাও লেগে গেল। কুৎসিত চিৎকার, অশ্লীল কলহ।

শের আলী তাড়ি গিলে ঘরে ফিরে বললে, 'হাঁর‍্যা শালা, সাহাদত, তুই যেতি সাধু লোক হবি তবে তোর মাগকে লিয়ে রায়পুরের মেলা থেকে একসঙ্গে 'ফটক' (ফটো) তুলে ছেলি কেন রে শালা? লজ্জা করে না? মোর ভাই তোর বাপ হয় শালা—আয় না তোকে গাছকাটারী দিয়ে কুচোবো আজ।'

ঝগড়ার পরিণতি খুনখারাবী। হাসপাতাল থেকে ফিরে মাত্র কোর্ট দুই মামলা হবার পরই হঠাৎ গাঁয়ের মোড়লের পোষা গুণ্ডা সাহাদত একশো টাকা দিয়ে আপস-মীমাংসা করে নিলে। কারণ মোড়লকে এর মধ্যে জড়াবার জন্যে মস্ত এক দালাল ঢুকেছিল।

সেই টাকায় ঘরের খোলা কিনলে শের আলী। সারভিসের টাকা ফুরোতে আবার ঘরের খোলা বেচে দিলে সে। ঘরের চাল ফাঁকা, বদলি কাজে যেয়ে যেয়ে হঠাৎ একদিন নিজ-কাজ পাবার লোভে ইউনিয়নের বিপক্ষে কোম্পানীর দালালদের প্ররোচনায় পড়ে মার খেয়ে সে ঠ্যাং ভেঙে এসে পড়ল একেবারে 'হায় বাবা' হয়ে নতিমনের কোলে। ঘর ফাঁকা, শিয়ালে না বাঘরোলে কোলের তিন মাসের ছেলেটাকে রাত্রে তুলে নিয়ে পালাল। ঘর ফাঁকা, পেটেও দানাপানি নেই। কতদিন আর পেটের জ্বালা সহ্য হয়? শের আলীর ছোট ভাই কদম আলী গাছ ছাড়ানো কাজ করে, নারকোল পাড়ে—তারও কাজ নেই সব দিন। এক রাত্রে বাবুজান কয়ালদের গাছ থেকে নারকোল চুরি করার সময় ধরা পড়ে কদম বেদম মার খেয়ে জেলহাজতে চলে গেল। নূরখাতুনেরও কোলে তিন-তিনটে ছানাপানা। দু'জায়ে যুক্তি করলে চাল বেচতে যাবে শহরে। নইলে বাল-বাচ্চাগুলো মারা যাবে ভুখে। হাঁস-মুরগী আর বকরী ধাড়ী বেচে টাকা নিয়ে চাল কিনে কর্ডন পুলিসের চোখ এড়িয়ে তারা শহরে যেতে-আসতে লাগল। তাদের চলন-বলন পালটালো। পাড়ার মেয়েরা হাঁ করে তাদের কথা শোনে। শহরে নাকি কেউ কারু ধার ধারে না। মেয়েরা যাকে ইচ্ছে নিয়ে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকার বলে কিছু নেই সেখানে।

তারা মাঝে মাঝে আপেল বেদানা কিনে আনে। মাংস কিনে আনে। নূরখাতুনের গয়না হল। তার স্বামী জেল থেকে ফিরে এসে কিছুই আর করে না, শুধু ছেলেগুলোকে কাঁধে-কাঁখে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সারাদিন দেখাশোনা করে। সকাল বেলাতেই গরম ভাত চাট্টি খেয়ে নূরখাতুন আর তার বড় জা লতিমন বিবি ভাল রঙদার শাড়ি-বেলাউজ পরে, মুখে পাউডার হিমানী ঘষে, স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চালের বুচ্‌কি নিয়ে চলে যায়।

তারা পেশাদার হয়ে যাবার পর আর চাল-গমের পুঁজিও দরকার হয় না নাকি।

হঠাৎ সংবাদ ছড়ায় পাড়ার মানুষদের কাছে, লতিমন বিবি নাকি শহরের বাসস্টপের কাছে একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাতে একশো টাকা ছিল। সেই টাকা দিয়ে লতিমন বিবি একটা লোকাল ট্রানজিস্টার সেট রেডিও কিনে আনলে। নূরখাতুনের চেহারা ভাল, পাতলা সখির মতন দেখতে। তার কাছেই নাকি চাল-গমের খদ্দের লাগে বেশি। তাই ঘোষেদের দোকানে তার সোনার হার, পেটি, কলি বন্ধক যায় মাঝে-মধ্যে।

নবখাতুন বলে, 'রাজারও হাতটানা পডলে হাতী বন্ধক দেয়!'

গতকাল আর নরখাতুন যায়নি বড় জার সঙ্গে। তার শরীর খারাপ। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আরো কি সব নাকি ভয়ানক রোগ দেখা দিয়েছে। সুঁই ফুঁড়ে গেছেন ডাক্তার মানিক ভক্ত। সাবধান করে গেছেন যেন নূরখাতুনের ছোঁওয়া জিনিস কেউ ব্যবহার না করে—কেউ যেন এঁটো-কাঁটা না খায়।

লতিমন নবখাতুনের গোপন ব্যাধির কথা শুনে মনে মনে শঙ্কিত হয়। দু'তিন বছরের কুৎসিত অন্ধকারের চিত্রগুলো তার মনের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু পেট যে মহাকাল, সে যে কিছুই শোনে না।

উনুন নিভিয়ে এসে লম্ফের তেল শুকিয়ে গেছে বলে অন্ধকারে বসে থাকে খাওয়া-দাওয়া সেরে। জোনাকিরা আলোর জাল বোনে বাঁশবনের মধ্যে। কদম গাছটার ডালে অসংখ্য ফুল ফুটেছে—তার গন্ধে ম-ম করে চারদিক। ডাহুক ডাকছে ডোবাটার ওপারের বন থেকে। ছেলেরা কলহ করছে। বাদাবাদি করে কিনে আনা তাদেব রেডিওটাতে কদম জোর দিয়ে বিবিধ ভারতীর লোহালক্কড় বিক্রির গান আর বিজ্ঞাপন বাজাতে থাকলে লতিমন নিজের রেডিওটা বন্ধ করে দেয়।

মেয়ে তোতামন মায়ের গায়ের ঘামাচি মারতে মারতে শুধোয়, 'কাল কোথা

রাত ছেলি হা মা ?'

'গুহোর বেটা এক ব্যাটা ধরে তার 'কটোরে' (কোয়ার্টারে) লিয়ে গেল। মোর চাল কটা লিয়ে রান্না করতে বললে। খাসীর গোস্ত আনলে, মোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে যেয়ে। লোকটার দুর্জয় পাহাড়পানা গতর। ইয়া বড় বড় ঝাঁটার পানা গোঁফ !'

বলে খিল-খিল করে হাসতে থাকে লতিমন। লতিমনের খাটো পাতলা চেহারা। সাত-আটটা ছেলের মা তাকে দেখলে কেউই বুঝতে পারে না। যৌবন এখনো অটুট। মেয়েও মায়ের কথায় হাসে। একটা অন্ধকার কালো সড়ক তার চোখে পড়ে যেন। মা তাহলে টাকা বাগিয়ে এনেছে লোকটার কাছ থেকে। তাকে গাঁয়ের মোড়ল টাকা দেয় দুটো একটা করে। আর লোকটা তাকে···

লতিমন বলে, 'লোকটা হিন্দুস্থানী। বললে, দেশ-গাঁয়ে বউ-ছেলে জমি-জিরাত আছে। বলে, শহরে কম্ম করে জীবনটা বিরথাই গেল। তার তক্তাপোশে কি ছারপোকা বে বাবা ! সারারাত কি জ্বালালে !'

শের আলী বলে উঠল, 'ভাল ! ভাল ! 'নেকি'র (পুণ্যের) কাজ হচ্ছে !'

'তুই চুপ কর। তোর কথার কে ধার ধারে র‍্যা গোলাম। মুই কি অ্যাহন তোর কোলের মাগ আছি যে শাসাবি ? মোকে তুই খাওয়াস, না 'পেঁদাস' (পিন্ধন) যে বঁড়িয়া বঁড়িয়া বাত মারবি, এইসা দিন গুজার গিয়া ! আমাকে কি তুই 'তাল্লাক' (তালাক) দিবি, তোকে মুই তাল্লাক দিইচি 'বাপ' বলে—সাক্ষী রেখে। একেবারে তিন তাল্লাক—তুই মোর এখন বাপ 'সম্পক্কে'র—বাপের পানা চুপ করে থাক। তামুক টান ভুড়ুক-ভুড়ুক করে বুড়ো-হাবড়ার মতন।'

'বেরো মাগী তবে আমার ভিটে থেকে। এটা কি তোর বাপকেলে ভিটে ?'

'বাপকেলে লয় ? তুই তো মোর বাপ, তোর নামে বাস্ত !' বলেই হি-হি করে হাসতে থাকলে নূরখাতুনও লতিমনের হাসিতে যোগ দেয়।

'বাপ বলা তোর আজ ঘোচাবো রাতের বেলা, দাঁড়া !'

'আসিস না কাছে, জোড়া পায়ের লাথি মেরে তোর 'চাবালি' (দাতের পাটি) ছেড়িয়ে দোব তাহলে মুই।'

'আচ্ছা !' শের আলী উঠে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অন্ধকারে নেমে গেল। আস্ত অন্ধকারের প্রাণী যেন সে একটা !

খানিকটা পরে কি যেন হাতে করে এনে বসে-বসে খেতে লাগল অন্ধকারেই ;

চাবুস-চাবুস শব্দ করে ! পাকা কলার গন্ধ বার হচ্ছে।

ছেলেগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। মোদো মায়ের কানে-কানে বলে, 'শালা পাকা কেলো খাচ্ছে—একেবারে এক কাঁদি এনেছে। বোধহয় ঘোষেদের বাগান থেকে কাঁচা কেটে এনে বন-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ্যালো। আজ পাকতে এনে আমাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে। প্যাটে শালার 'পাগুল' হবে !'

মেয়েটা কাছে এসে তার পেট-কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পিঠে বার করে নিয়ে বাপের হাতে গুঁজে দিলে শের আলী খুশী হয়। এক ছড়া কলা পট্ করে ছিঁড়ে নিয়ে তার হাতে দেয়।

সে কলাটা এনে মাকে দেখায়। মা বলে, 'ফেলে দে। অর কেলা খেলে প্যাটে 'টাইফর' ব্যামো হবে। তিন-চার দিন প্যাটে অর কিচ্ছ পড়ে নে—স্থরমী বিবির কাছ থেকে 'আসাম' (ফেন) চেয়ে খেয়ে এয়েছে—আজ প্যাট ভরে থাক।'

আরো দু'ছড়া কলা অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয় শের আলী ওদের গায়ের ওপরে। ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নেয় কোঁতকোঁত করে।

তারপর সকলে শুয়ে পড়ে চট আর খেজুর পাতার চাটাই মেলে—ময়লা কাঁথা বিছিয়ে।

মশায় শের আলী সারা রাত ঘুমোতে পারে না। বসে-বসে গা চুলকোয়।

মশারীর ছেঁড়া জায়গাগুলো ঝাঁটা-কাটি গুঁজে সেলাই করে তার মধ্যে পড়ে ওরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

শের আলী রোজ ভাবে রেডিওটা নিয়ে পালাবে সে—বেচে দেবে কাউকে, পঁচিশ টাকাতেই। পঁচিশ দিন কোথাও কাটাবে—তবু তো পঁচিশ দিন একটু খেয়ে-দেয়ে বাঁচা যাবে।

কিন্তু লতিমন 'গান'টাকে মাথার কাছে নিয়ে শুয়ে আছে।

এক ছড়া কলা রেখেছে শের আলী লতিমনের জন্যে। অনেক লোভ সামলে, মনে একটা লোভ আছে আজ তাকে পাবার।

সবাই ঘুমোচ্ছে এখন অকাতরে।

ছোট বউ শুধু কাতরাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

যদি লতিমনেরও ঐ রকম হয়? কাউকে বলে, হাসপাতালে কাজ করি, কাউকে বলে, চাল বেচতে যাই—আসলে ওরা দুজনে বেহালায় এক কামরা ঠিকে ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছে। ভাড়া ঠিক নয়। কমিশন ব্যবস্থা আছে মাসির সঙ্গে। খদ্দের আনলেই তার এক টাকা। আর খদ্দেরের কাছ থিঙে

বখশিস আদায় করে নেয় কাকুতি-মিনতি করে। মদ খাইয়ে বেশি টাকা নেয়। কুলী-কাবাড়েরা নাকি টাকা দিতে না পেরে মার খেয়ে অপমান হয়ে চলে যায় প্রায়ই। সারা দিন ওরা শিকারের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ফেরার মুখে চাল গম মাছ আনাজ কিনে আনে। লতিমনের কোমরের তবিলে বাঁধা আছে অনেক টাকা। কুড়ি-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত!

আজ যা হয় হবে—লতিমনের কোমর থেকে হয় টাকা খুলে নেবে—নয়তো রেডিওটা। তারপর দে চম্পট কারখানার দিকে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোক্রমে দৌড়তে হবে অন্ধকারে। ধরতে পারলে বেদম মারবে ওরা। লতিমন বুকে বসে গলা টিপে ধরবে আর মোদোটা শুধু মুখের ওপরে ঘুষি চালাবে। একবার একটা মুরগী চুরি করে নিয়ে গিয়ে চাট করে পাশের গ্রাম থেকে তাড়ি খেয়ে আসতেই তাকে ধরে অমনি করে মেরে দাঁত ভেঙে দিতে সে রেগে-মেগে খুন হয়ে কেস করতে গেল পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে।

পঞ্চায়েতের বাবুরা তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। কেস নিলে না। বললে, 'বউ দাঁত ভেঙে দিলে কেস হয় না শের আলী। মাথা কেটে নিলে কেস করে যেও—বিচার করে দোব!'

শালাদের কথা শোন! মানুষ না বেল্লিক সব!

শের আলী গুড়ি মেরে গুড়ি মেবে লতিমনের বিছানার মধ্যে এগুতে শুরু করলে। লতিমনের কোমরের তবিলে হাত দিতেই সে জেগে গিয়ে খপ করে হাতটা চেপে ধরলে। বললে, 'কে তুই!'

'মুই রে, তোর শের আলী! এক ছড়া পাকা কেলা তোর জন্যে রেখেছি—খাবি? চেল্লাসনি, আল্লার কসম, তোর পায়ে ধরি।'

কলাটা নিয়ে মাথার ধারে রাখলে লতিমন। পাশ ফিরে শুয়ে বললে, 'চলে যাও, কেউ জানলে 'গোনা'র (পাপের) কাজ হবে!'

'কে আর দেখতেছে এখন! গায়ে নাকি ব্যথা, তোর পা টিপে দোব?'

লতিমন আপত্তি করলে না। এই দুর্বল অসহায় পাগল-ছাগল লোকটাকে তিরস্কার করতে এখন যেন বাধল। তার যেন কেমন এক রকম দয়া হতে লাগল আজ। পেটের ন্যাওটা ছেলেটার মতন যেন জালাতন করতে এসেছে।

শের আলী লতিমনের বুকে মুখ ঘষে ঘষে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট বউ নূরখাতুন অসহ্য যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছে শুনতে পেয়ে শের আলীর পিঠের ওপরে যেন আদরের হাত বুলোতে থাকে লতিমন।

ডাহুক ডাকতে থাকে গভীরে—করুরুরু—কোয়াক কোয়াক—কোয়াক কোয়াক!…

তালপাতার পাখা : ভালবাসার জলছবি

'তালতমালবনরাজিনীলা!…'

হাঁসনাচা, মায়াপুর, বাগানবেড়িয়া, মৌখালী, জামালপুর, চণ্ডীপুর, কাশীপুর কয়েকখানা গ্রাম জুড়ে শুধু তালবন। কালো কালো দীর্ঘ রেখা, মাথায় ছাতার মতো পাতা—অপূর্ব দৃশ্য! আমনধান চাষের উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে চারদিকের আকাশপটে শুধু তালগাছ আর তালগাছ! মাঝেমধ্যে নারকোল, সুপুরি, আম, কাঁটাল, জাম, জামরুলের বাগান। বাঁশ্‌নী, ভেল্‌কো আর তল্‌তা বাঁশের জঙ্গল। মাঠের মাঝে ভেড়িতেও তালগাছের সারি। খেজুর গাছ, বাবলা গাছ। মাঝে মাঝে ডোবা। শুকনো ডোবার মাঝখানে বাঁশ-জট্‌লাই অথবা কঞ্চির বোঝা দাঁড় করানো। কাছেই হুগলী নদী। বর্ষায় রাজ্যের 'ভেকুটি' (ভেকুট), বোয়াল, ভাঙন, পারশে মাছের 'ম্যাতা' বা ডিম আসে খালের নোনা জলে। ভাদ্র আশ্বিনেই ভেকুটি মাছের ঝাঁক ভাসে ডোবাগুলোয়। তখন বঁড়শিতে জ্যান্ত পুঁটি-মাছ অথবা চিংড়িমাছ গেঁথে ডোবা থেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরে উজাড করে ফেলে লোকজন—চুরি করে। তাই ডোবার মাঝখানে ডালপালা বাঁশকঞ্চি পোঁতা আছে—ছিপে ভেকুটি মাছ লাগলেই চোঁ করে টেনে নিয়ে গিয়ে জড়াবে ঐসব ডালপালায়। তখন আর মাছ তোলা যাবে না। তবু সাপের ভয় উপেক্ষা করে বর্ষায় এইসব ডোবা থেকে মাছ চুরি করে কত লোকের সংসার চলে।

হাঁসনাচার মাঠে দাঁড়ালে দেখা যাবে গ্রামের বড় মসজিদের মিনার—বিড়লাপুর জুটমিলের গলগল-করে-কালো-ধোঁয়া-উদ্গীরণ-করা বিরাট চিমনী, ক্যালসিয়াম কারবাইড ফ্যাকটরী আর মোড়লপাড়া মোল্লাপাড়ার খোলার ছাওয়া, টিনের ছাওয়া মাটির ঘর। এক আধটা পাকাবাড়ি।

হাঁসনাচা আর মায়াপুর গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে গেছে চওড়া কংক্রীটের বিড়লা বাহাদুর রাজপথ। পথের ধারে ধারে হিন্দুস্থানী, চুলিয়া, ওড়িয়াদের বাসাবাড়ি। বিরাট মোটা মোটা রুপোর মল পায়ে হিন্দুস্থানী মেয়ে—লাল কাপড় পরা—গায়ে-

হাতে উল্কির নক্সা—ফেন গড়াচ্ছে পথের ধারে। মাদ্রাসা আর হাইস্কুলের ধারের টিউবওয়েলে ভিড় জমে আছে মেয়েদের। পথের পাশে পাশে রাজ্যের চা-দোকান। বাইশ-কুটরীর বেশ্যালয়। কৃষ্ণচূড়ার রক্তরঙিন ফুলে ফুলে পথের দু-পাশ লাল। তাইচুঙ ধান ফলেছে বিস্ময়করভাবে কোথাও কোথাও, যেখানে জল আছে কাছেপিঠেয়। বিড়লা ডেয়ারী ফার্মের গরু-মোষের জন্যে খড় কিনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হিন্দুস্থানীরা মুসলমানপাড়াটা থেকে মাথায় করে। রজকেরা কাপড় শুকোতে দিয়েছে মাঠে। চা-দোকানগুলোতে তাস পিটছে রিকসাঅলারা। গাঁজা টানছে অন্য কেউ কেউ বা। হুরপরীর মতন সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কোম্পানীর সাদা অ্যামবাসাডর মোটরটা সাঁ করে বেরিয়ে যায়। চুস্তপ্যাণ্ট পরা চ্যাংড়া চাষীর বাড়ির বখাটে ছোঁড়ারা সুন্দরী মেয়েভরা মোটর আসতে দেখলেই টুইস্ট নাচ জোড়ে—শিস মারতে মারতে। এরা সব হিন্দী সিনেমার পরিণামফল—নয়া ফলশ্রুতি!

কিন্তু এত হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ তালগাছ কেন এইসব গ্রামগুলোয়? শীতের সময় তালপাতা কেটে নেওয়া হয়েছে সব গাছের। শিরোমূলে শুধু তীক্ষ্ণধার একটি করে পাতা আছে। বাকি সব পাতা গেল কোথায়?

মোল্লাপাড়ার মধ্যে এলেই দেখতে পাওয়া যাবে তালপাতার পাখা তৈরি করছে মেলা মেয়েপুরুষ হেঁসো, কাটারী, কাঁচি চালিয়ে। বাড়ি বাড়ি তালপাতার পাখার কারবার। গরমে যখন মানুষের প্রাণ 'আইঢাই' করে, হাতে চাই একটা তালপাতার পাখা। সেই তালপাতার পাখার কারবার হাঁসনাচা, মায়াপুর, মৌখালি গ্রাম জুড়ে। কুমারী, বিধবা, গরিব-বেওয়া, বউমানুষরা তালপাতার পাখা নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে 'কুসি' লাগিয়ে এনে আবার দিয়ে যাচ্ছে মাঠ পার হয়ে। সেইসব তৈরি পাখায় আবার রঙের তুলি টেনে ছবি আঁকছে কেউ কেউ। বাঁখারী চেঁছে কাঠি তৈরি করছে লোকজন। বড় মিস্ত্রি চকচকে ধারালো হেঁসো মেরে ভেজানো 'মুটি' কেটে 'সাইজ' করে দিচ্ছে। সবাইয়েরই 'ফুরোন' কাজ। হাজার-করা দাম।

পৌষ-মাঘ মাসে যখন ক্ষেত থেকে ধান উঠে যায়, কিছু লোক পাড়ায় পাড়ায় তালপাতা কিনতে আসে। পঞ্চাশ টাকা হাজার দরে তারা পাতা কেনে। পাতা মানে এখানে 'মুটি'। একখানা পাতা থেকে দুটো করে 'মুটি' বাঁধা যায়। গোটা পাতাকে মাঝামাঝি চিরে ফেলা হয়। তারপর মাথা-তলা ছেঁটে ফেলে কাঁচা পাতা দিয়ে জড়ো করে বেঁধে নিলেই 'মুটি' তৈরি হয়ে গেল। সকালে কাটার পর

বিকেলে 'মুটি' বাঁধার সময়েই পাতার সবুজ প্রাণ-অংশ শুকিয়ে যায়। বেশি পাতা হলে জ্যোৎস্না রাতে সেই কনকনে শীতে গামছা গায়ে দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে খোলা মাঠে বসেই কাজ করে লোকগুলো। অনেকেরই মুখে বসন্তের দাগ, গলায় তক্তি বা মাদুলি, পেটে পিলে-লিভার পোড়ানো চাকা চাকা দাগ, পরনে লুঙ্গি, ঝাঁপি মতন চুল, ঘষা কাঁচের পানা চোখ। দেখলেই বোঝা যায় এরা মুসলমান। বিশেষ এক ধরনের ভাষা এদের। একই গ্রামে, একই পাড়ায় বাস অথচ হিন্দু মুসলমানের ভাষার শব্দ ব্যবহার আলাদা। 'লুক্কে' (লুকিয়ে), 'পেলিয়ে' (পালিয়ে), 'কত্তেচে' (করতেছে), কাঁন্‌তেছ্যালো (কাঁদতে ছিল), 'আসাম, (ফেন), 'ভা দে' (ভাত দে), 'ওস্‌রা' (দাওয়া), 'এগ্‌নে' (আঙ্গিনা, আঙ্‌নে, এগ্‌নে, উঠোন), 'লউ' (রক্ত), 'যেতি' (যদি), 'লিয়ে' (লইয়া, নিয়ে), 'পানি-ঢালা' (জল গড়ানো), 'ভাত থসানো' (ভাত বাড়া), 'গোন' (পথ), 'ঠেঁটি' (আটপোরে কাপড়) 'কুর্তো' (খাটো ব্লাউজ) ইত্যাদি। গ্রাম্য মূর্খ মুসলমানদের ক্রিয়াপদ ব্যবহার বিকৃতভাবে অন্যরকম।

আতাহার মোল্লার দলিজে মেয়েমর্দ যারা পাথার কাজ করছে সবাই মুসলমান। এদের প্রকৃত ভাষা যা তা অনেকেরই পক্ষে দুর্বোধ্য। যেমন বড় কাঁচি চালিয়ে আরশাদ মণ্ডল কাজ করতে করতে বলছে, 'মাংস বললেই তো হবে না যাদু, তার ভিৎরে বহুৎ কিসমের নাম আছে। সিনা, টক্কর, রম্‌পোট, চেক্‌না, রেওয়াজ, রিপ, খিরি, দীল, কোল্‌জে, ফ্যাপ্‌সা, উজ্‌ড়ি, মগজ, রান, গুরদো, গর্দান—কত কি ! হিঁদুরা মোদের কথা শুনে হাসে—ওদের হরিজনদের কথা শুনবি? 'আঙা গড়ু' মানে 'রাঙা গরু, 'আন্নাঘড়' হল রান্নাঘর। ওজনকে বলে 'রোজন'। মোরা বলি পানের 'বোরোজ', 'অরা' বলে 'বরোজ'। মোরা বলি, 'পেলিয়ে' আয় চাচা 'লুক্কে' পড়, 'হাঙা'র ভিৎরে 'সেঁইধে' যা ! সিদনে লবুর খালা বলতে ছ্যালো 'অস্তুমায়ে' 'ছেরাবন' মাসে মোর ঝিকে লিয়ে যেতে এল মা মোর জামাইটা। কি 'সালুন' রাঁধি, কি 'সালুন' রাঁধি ভেবে মুই 'হাঙা'য় (মাচায়) উঠে দুটো 'আঙা' 'পান্নু' (পাড়লুম)।'

আরশাদের কথা শুনে মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। আরশাদ খুব কাজের লোক। কথা বলছে বটে কিন্তু কাঁচি চলেছে তার অত্যন্ত দ্রুতছন্দে। পাঁচ টাকা হাজারে সে মুটির মাথা গোল করে পেঁচিয়ে দেয়। কতকগুলো মেয়ে পা ফাঁক করে বসে পা দিয়ে সেই পাতাকে মেলে চেপে ধরে ঝাঁটা-কাঠি বা বাঁশের সলা দিয়ে ছুঁচ ফুঁড়ে সেলাই করে দেয়। পয়লা এককাঠি তারপর দু'কাঠি সেলাই ফোঁড়াই

দিতে হয়। পাড়ার মেয়েরা বারো আনা শ' হিসেবে যেসব তৈরি পাখায় তাল-পাতার কুঁচিকুঁচি নক্সা দিয়ে ফেরত দিয়ে যায়, সেইগুলোয় বিচিত্র ছবি আঁকে আতাহার মোল্লার ছেলে বর-জাহান। বর-জাহানকে দেখতে খুবই সুন্দর। শাজাহান বাদশার যুবককালের ছবি যেন সে। বর-জাহান যখন গান করে, পুঁথি পড়ে, বাঁশি বাজায় সবাই যেন মোহিত হয়ে শোনে। সে ছবিও আঁকতে পারে চমৎকার এবং বিচিত্রতর। কত লোকের দোকানের এমনি-এমনি সাইনবোর্ড লিখে দেয়। তার চোখ দুটো দীঘল, বিকশিত, দীর্ঘ পল্লব আর নীলাভ। নাকটা খাড়া, পাতলা, মসৃণ, তীক্ষ্ণাগ্র। চুল ঢেউ খেলানো, কালো, সতেজ। গায়ের রঙ পাকা গমের মতন। কণ্ঠস্বর খুব নম্র, স্পষ্ট, মার্জিত। সে মসগুল হয়ে একমনে তুলি টেনে নানান ফুল এঁকে যায় পাখায়। একটায় আঁকার সময় অন্যটায় কি আঁকবে ভেবে নেয়। গোলাপ, পদ্ম, জবা, মুকুল, ধানশীষ, খেজুর ছড়ি, লতাপাতা, মসজিদ-মীনার, ময়ূর কত কি! বাপের ধান-জমি, ডাঙা-জমি, বাগান-বাগিচা আছে, টাকা-পয়সা বা খোরাকীর অভাব নেই, তাই প্রথমটা অসৎ সঙ্গে ঘোরাফেরা করে ভাল করে আর পড়াশুনা করতে পারলে না বর-জাহান। এখন অনুশোচনা হয়। ক্লাশ এইটের ফাইনাল পরীক্ষায় সে ফেল মারলে অঙ্কে। গোপনে গোপনে সে নাকি আবার কবিতা লেখে। মা মারা যাবার পর অন্য মা এল সংসারে। তার মেজাজ গেল বিগড়ে। পাখার কারবারটার দেখাশুনার ভার চাপালে বাপ তার ঘাড়ে। ক্ষেতখামার বাগ-বাগিচা দেখাশুনা করে তার বাপ আতাহার মোল্লা। নতুন মা এসেছে তারই বয়েসী। তাকে মা বলে না বর-জাহান। মেয়েটা তার বুড়ো বাপকে পছন্দ করে না।

ডাগর মেয়ে ফুলজান কাজ করতে করতে খিলখিল করে হাসে—গরিব চাচা মতেহার মোল্লার মেয়ে সে। চাচা মামলা করে করে সব উড়িয়ে দিয়ে আজ দুর্দশায় পড়েছে। সোমত্ত মেয়েটার সাদি পর্যন্ত দিতে পারছে না। ফুলজান সুরেলা জেহেনে কোরআন শরীফ পড়তে পারে। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়েছে মাদ্রাসা-স্কুলে। অভাবের সংসার, তাই মায়ের সঙ্গে চাচাদের কাজ করে। বাপ নানান সমাজ-কল্যাণ করে বেড়ায়। বিড়লা কোম্পানীকে সে মিল অঞ্চলের পাশের সমস্ত ধানজমি বেচে দিয়েছে তার। কোম্পানীর অফিসে গেলে নাকি খাতির করে মূর্খ মানুষ হলেও চেয়ার দিত আগে। এখন আবার চাচার রঙ বদলেছে। ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে তার দহরমমহরম। জমি বেচে চাচা প্রায় এক লাখ টাকা পেয়েছিল কিন্তু খরচা হয়েছে নাকি তার লাখেরও উপরে। এখন যুক্তি

আঁটছে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা লড়বে কম টাকায় জমি কিনেছে বলে! তাকে নিয়ে একটা কবিতার বই লিখেছে বর-জাহান। ঐ পুঁথির মতন পয়ার ছন্দে। মাঝে মাঝে ফুলজান যখন কাজ ভুলে বর-জাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর বর-জাহান তাকালেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে মন দেয় তখন বর-জাহান তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে :

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'।
জমি নাহি বেচ চাচা সকলে বলিল॥
চাচা না শুনিল তারে আলীপুর টানে।
জমি বেচে টাকা ঢালে, দারোগাকে আনে॥
পোনামাছ ধরে দেয়, কিনে দেয় আণ্ডা।
তবু নাহি দারোগার মাথা হয় ঠাণ্ডা।
চাচার ডাগর মেয়ে ফুলজান নাম।
মোর মুখ পানে চেয়ে ভুলে যায় কাম॥

'হ্যেৎ!' বলে ফুলজান তার হাতের পাখা দিয়ে বর-জাহানকে ঝাপটা মারে। চাচী হাসে। বলে, 'বেশ তো বাবা, চাচার জন্যে 'যেতি' অত দুঃখ, তবে ফুলজানকেই তুই বে' কর না।'

বর-জাহান হাসে। বলে, 'আমার বাপ আমার বিয়েতে বিশ হাজার টাকার যৌতুক দাবি করে কত মেয়ের বাপকে ভাগালে আর তুমি কি বলছ চাচী? বাপ শুনলে তোমাদের কাজ বন্ধ করে দেবে। ফুলজান দেখতে ভাল, ঝিনুকের মতন চোখ, তিল ফুলের মতন নাক, দুধে-আলতা গোলা রঙ...'

'গাল দেব দাদা।'

'কি গাল দিবি?'

'জানি না, যাও!'

'মুসলমানের মেয়ে গাল দিতে শেখনি তুমি এখনো? তাহলেই তুমি পরের ঘর করেছ! শোনো, খালভরা, গোলাম, হাবামী,—ওই আরশাদ দাদুর ভাইপো জামাই 'অমৃত' পত্রিকায় 'পীরিনী বুড়ীর বিচার' লেখাটাতে মুসলমান মেয়েদের গালাগালির বহর যা দিয়েছেন!'

ফুলজান বলে, 'সেই মোড়লপাড়ার জামাই? আসিয়ার বর?'

'হাঁ।'

দুপুর হয়ে গেছে দেখে সবাইকে ছুটি দেয় বর-জাহান। সবাই খেতে চলে যায়।

ফুলজান শুধু একা বসে বসে ছবি আঁকে। তাদের রান্না হয়নি আজো। তার মা বর-জাহানের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে দোকানে আটা কিনতে পাঠিয়েছে ছোট ভাইকে।

বর-জাহান স্নান করে খেয়ে এসে দেখে ফুলজান একাই দলিজে বসে বসে লাল নীল সবুজ রঙ দিয়ে ফুল পাতা আঁকছে।

কাছে এল বর-জাহান। বসল তার কাছে।

ফুলজান তুলি টানা বন্ধ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে ম্লান একটু।

'খেতে যাবে না ?'

'কি খাবো ?'

মুখটা ম্লান, শুকিয়ে কুল-আঁটির মতো হয়ে গেছে ফুলজানের ঠোঁট দুটো।

বললে, 'এস, আমাদের বাড়ি দুটি ভাত খাবে।'

'না।'

'কেন ?'

'চাচী নিন্দে করে। বলে, 'আমি নাকি...'

'কি ?'

'তোমার সঙ্গে আছি !'

'আচ্ছা ! এসো। থাকাথাকি পরে হবে। আরে, এসো না।' হাত ধরে টানাটানি করলেও ফুলজান খেতে যায় না। শেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালায় সে নিজেদের বাড়িতে।

সন্ধ্যার পর আতাহার মোল্লা এসে বসে দলিজে। দীর্ঘাকার জালিদার টুপী মাথায়। লম্বা মৌচাকের মতন ঝোলা দাড়ি। গায়ে পীরহান। এসে বসে রোজকার মতন সে 'কাসাসল আম্বিযা' পুথিখানা খুলে সুর করে পড়তে থাকে। সবাই মন দিয়ে শোনে। একসময় বিচিত্র ফুল-আঁকা গেলাসে করে গরম দুধ কিংবা চা দিয়ে যায়, বর-জাহানের সৎমা। বর-জাহানকেও দেয়। জনেদের দেয় এক খুরি করে গরম চা।

রাত দশটা পর্যন্ত কাজ চলার পর সবাই চলে যায়। গা হাত ধুয়ে নিয়ে খেয়ে এসে বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে বর-জাহান। সে যেন বন্দী। কোনো সুখ নেই, শান্তি নেই তার মনে। পাখার পাইকের আসছে প্রতিদিন, টাকাগুলো নিয়ে নিচ্ছে তার বাবাজী। সৎমা'র সোনার গয়না গড়াচ্ছে। পাকা ঘর গাঁথা হচ্ছে তাদের। ফুলজানের আজ আর সারাদিন বোধহয় খাওয়া হল না।

চাচার গলা শোনা যায়, 'গরিবরা যেভাবে একজোট হয়েছে বড়লোকদের আর তারা রাখবে না। জমিজমা আর এক কাঠাও কেউ রাখতে পারবে না চাষীরা।'

চাচী বলে, 'এখন 'লেকচার' থামাও হুজুর। জমি তোমার নেই, অতো ভাবনা কিসের?'

তারপর চুপচাপ।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর মনে হল কে যেন কাঁদছে এসে বর-জাহানের দোরগোড়ায়। শুধু ফোঁস-ফোঁস করে নাকের শব্দ।

দোর খুললে বর-জাহান।

আশ্চর্য!

'ফুল! তুমি? এখন?'

'দাদা!—আমি আর খিদে সইতে পারছি না।' কেঁদে বুকে যেন ঢলে পড়ল ফুলজান বর-জাহানের।

বর-জাহানেরও চোখে জল এসে গেল। মাথায় তার হাত বুলোতে লাগল। মুখটা ধরে চুমু খেলে। ফুলজানের নোনা চোখের জলের ফোঁটা মুখে এল তার।

গাঢ়স্বরে বললে, 'এসো। আমার ঘরে মুড়ি কলা আছে খাও।'

ঘরের মধ্যে গেল ফুলজান।

টর্চ জ্বেলে মুড়ি বার করে দিলে তাকে বর-জাহান। কলা দিলে এক ছড়া। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় সে যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

বললে, 'ভাইটার জন্যে কিছু নিয়ে যাব।'

'সে নিয়ে যেও। তুমি এখন পেট ভরে খাও।'

'দু'দিন আমি কিছু খাইনি।' বলে সলজ্জ হাসলে ফুলজান।

'দুপুরে খেতে গেলে না কেন?'

'কি করে যাই, মা ভাই শুকিয়ে থাকবে!'

'তারা তো আটা কিনে এনে রুটি করে খেয়েছিল?'

'মা ভাইকে দু'খানা রুটি দিয়ে গা ধুতে যেতেই বুড়ো বাপ সব রুটি ক'খানা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছিল যে!'

'চাচীও তাহলে সারাদিন না খেয়েই আছে?'

'হাঁ!'

'তবে মুড়ি নিয়ে যাও। কিন্তু কাল মুড়ি নেই বললেই সৎমা বলবে, দান করা হচ্ছে গোপনে—'নেকি' (পুণ্য) হচ্ছে!'

'তবে থাক, চলে যাই।'

'আরে খাও।'

'না, কেউ দেখতে পাবে।'

'আচ্ছা ফুল, তোমাকে যদি আমি বিয়ে করি?

ফুলজান কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার অপরূপ রূপকুমার চাচাতো দাদার বুকে মুখ ঘষে।

একসময় মায়ের আর ভাইয়ের জন্যে মুড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় সে—নিজেকে এক রকম জোর করেই ছাড়িয়ে নিয়ে। তারপর আর বর-জাহান ঘুমোয় না। আড়বাঁশি বাজায় ফাল্গুনের মিঠেল হাওয়া-ভাঙা মাঠের মাঝখানে বসে। ফুলজান তার বাঁশি শুনে আর ঘরে থাকতে পারে না। মা ঘুমোলেই আবার সে পালিয়ে আসে বর-জাহানের কাছে।...

কিন্তু বাস্তবের স্বরূপ আলাদা।

আরশাদ মোড়লের সঙ্গে যোগসাজস করে মতেহার মোল্লা চটকলে-কাজকরা বাসায়-থাকা মসজিদের ইমামতী-করা এক ওড়িয়া মৌলভীর কাছ থেকে মাত্র শতখানেক টাকা নিয়ে এসে কন্যাদায়ের মহা আপদটা সেরে ফেললে হঠাৎ চট করে। শুভকাজে দেরি না করে মোল্লাজী মাত্র পাঁচটা টাকা নিয়ে সাদির পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ফুলজান কেঁদে-কেটে মাথা কুটে পাগল হয়ে গেলেও তাকে ধরে-বেঁধে 'ফুল-চড়ানি' শাড়ি-ঘেরা রিকসার মধ্যে পুরে সাধের 'খসমালয়ে' পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শুয়োর-গরু-চরা হিন্দুস্থানী-খোট্টা-ডেউকি-ভরা বাসাবাড়ির মধ্যে বুড়ো ওড়িয়া মৌলভীর ঘর করে দিন তিনেক পরে আবার ফিরেও এল ফুলজান।

বর-জাহান চুপচাপ। কেবলই মনে হয়েছে তার চাচাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দেবে একদিন। অথবা বাপের বন্দুকটা নিয়ে গুলি করে সাবাড় করে দেবে। কিন্তু ফুলজান যখন হঠাৎ ঘাটে দেখা হতেই তার মুখের দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'দাদা, একি হল! আমি মরে যাব। আমি গলায় দড়ি দেব।'—তখন সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেল বর-জাহানের চোখে।...

তালপাতার পাখায় ফুল আঁকতে আঁকতে কেবলই সে ভাবতে লাগল—কেন এমন হয়! এই গরমিল! জীবনটা ভর দুঃখ পেতে হবে ফুলজানকে! মতেহার চাচাকে একশো টাকা দিলে সে কি আর ওড়িয়া মৌলভী জামাইকে তা ফেরত

দিয়ে ফুলজানকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে? যে সাদি একবার পড়ানো হয়ে গেছে, তাকে আর নস্যাৎ করার সাধ্য আছে কার?

কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে আবার ফুলজানকে নিয়ে গেল তার পাকা-মাথা বুড়ো সোয়ামী। আর কয়েক দিন পরেই সে তার মিলের 'সারভিস' (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) তুলে নিয়ে ফুলজানকে নিয়ে চলে গেল কোন সুদূর বালেশ্বরে।...পাখি উড়ে চলে গেল!...

বাপ একটা কুৎসিত কালো মেয়ে যোগাড় করে অনেক টাকার লোভে বিয়ে দিতে চাইলে বর-জাহানের। বর-জাহান বেঁকে বসল। বাপ তেরিয়া হেঁকে বললে, 'ত্যাজ্যপুত্র করে বাড়ি থেকে তেড়ে দেব আমার কথা না শুনলে। যে ছেলে তার বাপ-মায়ের কথা শোনে না তার মরণ ভাল।'

বর-জাহানের ঝিনুকের মতন সুন্দর দুটো চোখ থেকে জল পড়তে লাগল টপ-টপ করে তার আঁকা তালপাতার পাখার ছবির ওপরে। ফুলের ছবিটার রঙ ছিটকে বিকৃত হয়ে একটা বুড়ো মুসলমান-চাচা অথবা বাবা কিংবা সেই ওড়িয়া মৌলভীর মুখের মতন হয়ে গেল। হাত দিয়ে ছিঁড়ে দুমড়ে বর-জাহান দূর করে পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে আরশাদ মোড়লের মুখের ওপরে।...

সোনিয়া

সতেরো নম্বর বাসাড়ে-লাইনঘরে ভারতের প্রায় সব প্রদেশের মানুষ তাদের আণ্ডা-গুষ্টি নিয়ে এসে সংসার পেতে বসেছে। চটকল কারখানার ছোটখাটো কেরানী-বাবু রমেন মিত্রই শুধু একক। চারটের পর কারখানা থেকে ফিরে লাইনঘরের গায়ে লাগানো 'টিউকল' থেকে বালতি ধরে জল বোঝাই করে মাথায় ঢেলে চন্দন সাবান মেখে স্নান সেরে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছিল, এমন সময় পাশের বাসার হিন্দুস্থানীর সোমত্ত মেয়েটা দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে কি যেন খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল।

রমেন শুধোলে, 'কি চাস রে সোনিয়া?'

সোনিয়া বেশ বাংলা বলতে পারে। বললে, 'বাবুজী, আপনার বঁটিটা লিব।'

'বঁটি কি হবে!'

'বাবা মাংস আনছে।'

'কিসের?'

'খাসীর।'

'তোর বাপের গায়ে তো পৈতে আছে দেখি, তোরা ব্রাহ্মণ?'

'না। আমরা ছত্রী আছি বাবু। আমরা মাংস খাই।'

বঁটিটা দেখিয়ে দিতে সোনিয়া সেটা নিতে এল। হাতে পায়ে ওর রঙের চিত্তির। কোমরে রুপোর চন্দ্রহার। চওড়া লকেটটা ঝুলছে সামনে—নাভির গর্তটার নিচের দিকে। পুরস্ত শরীরে খুব খাটো কুর্তো। পাতলা হলদে রঙের ছাপা শাড়ির মধ্যে দিয়ে বুকের চূড়া-উপত্যকা চোখে পড়ে। সোনিয়ার নিতম্ব ঈষৎ ভারী, চললে মনোরম দেখায়। রঙটা ওর কালো আর ফরসার মাঝামাঝি।

রমেন বললে, 'দেখি দেখি, আরে, তোর হাতে এ-সব কি এঁকেছিস?'

হাতটা ধরে দেখলে রমেন।

লজ্জায় হাসতে লাগল সোনিয়া।

'তোর সাদি হবে নাকি রে?'

লজ্জায় মাথা হেঁট করলে চিবুক তুলে ধরে রমেন। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দুটোতে যৌবনের সলাজ অপূর্ব এক মাধুরী খেলা করতে দেখলে।

'না বাবু, সাদি হবে কেন, এমনি!'

'বঁটি নিয়ে যাচ্ছিস, মাংস-রান্না দিবি তো?'

'হাঁ বাবু।'

'তোর বাপ কোম্পানীর পিয়ারের লোক। তাঁতের সরদার। খাসীর মাংস খাচ্ছে। তোর বাপের ওপরে অন্যসব লোকজনের রাগ।'

'জানি বাবু। বাপ বলে, কোম্পানী বেহার মুলুক থেকে আনছে। চাকরি দিছে। তার কথা না শুনে কি পারি?'

'মারা পড়বে একদিন। আমার কথা যেন বলিস না।'

'সোনিয়া—কা ভৈল রে—জলদি আও'···সোনিয়ার বুড়ী দাদি হাঁক পাড়ে।

সোনিয়া সাড়া দেয়, 'যাতা হ্যায় দাদি, তু মৎ চিল্লাও, মাওস দেখকর বহুৎ খুশ হো গিয়া বুঢ্‌টী দাদি!'

সোনিয়া চলে গেল।

ওরা থাকে রমেনের বাসার ডান-পাশে। বাঁ-পাশে থাকে রবি দাসের বউ

আর ছেলে। তার পাশে মাদ্রাজী পরিবার। সোনিয়াদের পাশে থাকে ওড়িয়ারা। সামনের লাইনে থাকে ক'ঘর ডেউকি আর ভাটিয়ারা।

চা হলে রমেন ডাকে সোনিয়াকে। মাঝখানে এক-ইটের গাঁথুনি দেওয়া মাত্র একটা পাঁচিলের ব্যবধান। সোনিয়া এলে রমেন বলে, 'তোর বুড়ী দাদির জন্যে একটু চা নিয়ে যা।'

একটা মগ নিয়ে আসে সোনিয়া। চা নিয়ে যায়। দুটো সন্দেশ ছিল তাও দিয়ে দেয়। দেবার পর সোনিয়ার হাতে চুমু খেয়ে দেয়। সোনিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখায় তার চোখের তীর হেনে।

রবি দাসের বড় বড় জুলপি-রাখা ছেলেটা এসে বলে, 'আপনার সাইকেলটা একটু নেব মামা?'

'কেন?'

'বাজার থেকে আসব একটু, মায়ের জন্যে ওষুধ কিনে আনব।'

সাইকেল বার করে নিয়ে চলে গেল ছেলেটা। তারপর এল রবি দাসের স্ত্রী।

বললে, 'ছেলেটা বড় জ্বালাচ্ছে, বলে, বলো না মা, আমার মাথা কনকন করছে, ট্যাবলেট কিনতে যাবার কথা বলে সাইকেলটা নিই মিস্তির-মামার।'

রমেন হেসে উঠল। বললে, 'বসো রমলা। রবির তো নাইট ডিউটি পড়ল আজ থেকে। তাস খেলাটা মাটি হল।'

'তুমি রান্না করবে না?'

'ঐ এক ঝামেলা! শুধু ভাত রাঁধব কিংবা রুটি করব। সোনিয়াদের খাসীর মাংস এনেছে নাকি, বাটি নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই এক বাটি দেবে—ব্যাস, ঐ দিয়েই হয়ে যাবে। রবি কি ঘুমোচ্ছে?'

'না। কোথায় বেরিয়েছে। তুমি ওদের মাংস রান্না খাবে?'

বিছানাটায় চিত হয়ে শুল রমলা। হাই ভাঙলে। আড়মোড়া দিলে। বললে, 'তোমার বিছানায় শুলে আমার শুধু ঘুম পায়, কেমন নরম নরম!'

রমেন কোনো মন্তব্য করে না।

চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে রমলা। রমলা একটু আলসে এবং মোটা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম যৌবনে ঐ একটি ছেলে হবার পর থেকে ও বাঁজা হয়ে গেছে। বয়সে বোধহয় তিরিশ হবে।

রমলা বলে, 'তুমি বিয়ে করবে না?'

'তুমি তো আছই, আবার কেন?'

'আমার মধ্যে আর কি আছে ?' হাসলে রমলা।

'যা আছে ঐতেই আমার মতন একজন গরিবের চলে যায়।'

—বলে রমলার কাছে এসে বসল রমেন। তারপর কাতুকুতু দিতে শুরু করলে রমলাকে। রমলা বালিশে মুখ চেপে হাসতে হাসতে ওর হাতটা সরিয়ে দিতে লাগল। শেষে দুজনে হাতাহাতি লেগে গেল। এবং আরো পরে এ ওকে জড়িয়ে ধরল। এ তাদের জীবনে নতুন কিছু নয়। দশ বছরের পুরোনো ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে রমলা 'বুকের ভেতর কনকন করছে' বলে চলে গেলে রমেন চুপ করে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বালে না। সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ গাধার চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

শিবমন্দিরে বিলম্বিত লয়ে ঘণ্টা বাজছে। রবির গলা শোনা যাচ্ছে, 'এই বাঁদর, মাথায় জল ঢাল! রমলা—রমলা!'

কি হল আবার রমলার ?

আলো জ্বেলে ছুটে বেরিরে এল রমেন।

রমলার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকে, তার চোখের বল দুটো বেরিয়ে পড়েছে। দাঁত লেগে গেছে।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে রমেন। কোম্পানীর গাড়িতে করে ওরা বাপ-বেটায় নিয়ে গেল কলকাতায়।

রমেন যেন নিজেকে অপরাধী ভেবে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ জড়ের মতন পড়ে রইল ঈজিচেয়ারে।

সরদার সীতারাম তেয়ারী এল বাসায়। তার গলা শোনা গেল। বেটা মদ খেয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে সে তার ভুঁড়িঅলা নির্বাক অন্ধ কালা স্ত্রীর ওপরে খুব তম্বিতাম্বা করেই আবার জুয়ার আড্ডায় চলে গেল। সারারাত হয়তো আর ফিরবে না। পড়ে থাকবে রাতের মোহিনীদের কাছে।

সোনিয়ার মা নির্বাক হয়ে গেছে। খড়ম দিয়ে নাকি মাথায় মুখে কানের ওপরে একবার খুব মেরেছিল তেয়ারী। রাত্রে আর তেমন কিছু দেখতেও পায় না।

সোনিয়া একসময় এক বাটি তরকারী এনে ডাকলে, 'বাবুজী!'

'কি রে, সোনিয়া! আয়। তরকারী এনেছিস—আমি তো ভাত-রুটি কিছুই করিনি।'

'রোটি এনে দিব ?'

'দে। তোদের কুলোবে ?'

'হাঁ।'

সোনিয়া জল গড়িয়ে এনে খাবার দিলে যেমন ঘরের বউ বা মেয়েরা দেয়।

রমেন বললে, 'আরে বাঃ! চমৎকার মাংস রান্না তো? কে রাঁধলে, তুই বুঝি ?'

'হাঁ বাবুজী।'

'তুই আমার বউ হবি ?'

'লাজ লাগে বাবু!'

'হয়ে যা। অনেক গয়না দোব। শাড়ি দোব।'

'আপনার বউ নাই ?'

'না।'

নখ খুঁটতে থাকে সোনিয়া।

রমেন বলে, 'তোর বর হবে দেখবি ইয়া মোচঅলা কোনো এক হিন্দুস্থানী!'

খিলখিল করে হেসে উঠল সোনিয়া।

রমেন ডাকলে, 'আয়, এখানে বস, খা আমার হাতের একগাল।'

'ইঃ!' লজ্জায় জিব কাটলে সোনিয়া।

হাত দিয়ে শাড়িটা ধরে টেনে কাছে আনলে তাকে রমেন। সোনিয়া বসল। মাংস রুটি গালে পুরে দিলে তার। সে লজ্জায় মুখ চেপে আড়ালে গাল নাড়তে লাগল।

'তোর দাদি, ভাই-বোনরা ঘুমোচ্ছে ?'

'হাঁ।'

'মা ?'

'সেও বি নিদ যাচ্ছে।'

'বাপ আসবে কখন ?'

'সে আসবে না।'

'কেন ?'

'সারা রাত জুয়া চালাবে। আর 'মাসিদের বাড়ি' থাকবে।'

'মাসিদের বাড়ি!' তুই তবে তো দেখছি বাঙালী মেয়ে হয়ে গেছিস? তবে তুই আজ রাত্রে আমার ঘরে থেকে যা। এই ভাল বিছানায় দুজনে শুয়ে থাকব-

থন। খাওয়ালি, শোবে কে?'

'এই যে, কলাটা!' বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়ে গেল সোনিয়া।

রাত তখন বোধহয় একটা।

চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে।

কুকুর আর গাধা-ঘোড়া-শুয়োরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কারখানার ঝমাঝম শব্দ হচ্ছে একটানা।

আজ রাতকাজ ছিল—রবি দাস ঘরে না থাকলে প্রায় সারারাত রমেনের কাছে থাকত রমলা। এককালে রমেন খুব ভাল ছেলে ছিল। দয়া, সহানুভূতি, আদর্শ পাপ পুণ্যের বোধ ছিল তার মধ্যে টনটনে। কিন্তু রমলা সব ভাসিয়ে দিলে। জীবনটা বরবাদ করে দিলে। তার ছেলেটা অজ্ঞান অচেতন হয়ে ঘুমোয়—সন্ধ্যার পর শোয় আর সকালে ওঠে।

কোম্পানীতে গরম আবহাওয়া। দামকড়ি বাড়াবার আবার জোর আন্দোলন হবে। রমেন গরিবদেরই সমর্থন করে। তাই তার চাকরি যেতে পারে বলে ম্যানেজার হুমকি দিয়েছেন। প্রকাশ্যে রাজনীতি করে না বটে রমেন তবু ওঁরা ঠিক লোক চেনেন।

হঠাৎ দোরটা খোলার অল্প একটু সাড়া হয় যেন। হয়তো কুকুরে নাড়া দিচ্ছে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ে রমেন।

সোনিয়া ঘরের মধ্যে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবে চলে যাবে কিনা।

কিন্তু···পায়ে হাত দেয় সে।

রমেনের ঘুম ভেঙে যায়। ডাকে, 'রমলা?'

হাত ধরে টেনে নিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল সে! 'একি, তুমি, সোনিয়া!'

সোনিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ। কাঁপছে সে শুধু ভীতু কবুতরের মতন। সে কি তবে প্রেমে পড়ে গেছে নাকি বাঙালীবাবু রমেন মিত্রের?

'কেন এলে তুমি সোনিয়া?' ক্লান্ত গলায় শুধোয় রমেন।

'আমাকে 'বিয়া' করবে?'

'পাগলি!' রমেন তাকে কোলে টেনে নিলে। বললে, 'হাঁ, তোমাকেই বিয়ে করব সোনিয়া! তুমি বড় ভাল!'

'তোমায় আমার বহুৎ ভাল লাগে বাবু! নিদ নাই আঁখে!...'

রমলা আর ফিরল না হাসপাতাল থেকে। গাড়িতেই নাকি সে হার্টফেল করেছিল। রমলার হার্ট দুর্বল ছিল। মাঝে দু'বার স্ট্রোক হয়েছিল। মরবার পূর্বে সে যেন জ্বলে উঠেছিল। দীপ্ত, সুডোল, স্বাস্থ্যবতী। আর দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

অথচ সোনিয়ার মধ্যে কি অপূর্ব স্নিগ্ধতা!

কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে তেয়ারীর চোখে পড়ে গেল। সোনিয়াকে ধরে বিষম প্রহার দিলে।

রমেনকে বললে, 'বাবুজী, আপলোক বহুৎ বুরা কাম করতা হ্যায়। দোসরা রোজ হামলোককা আখমে এইসা বুরা কাম যব আয়ে গা আপকা খুন নিকাল দে গা।'

কিন্তু সোনিয়া মাস কতক পরে রমেনকে জানালে যে সে নাকি মা হতে চলেছে।

বিপদ! ওকে কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়াও যাবে না—ওর বাপ জানতে পারবে। তখন সে তাহলে কি করে বসবে কে জানে!

রবি দাস কোম্পানীর অন্য কারখানায় চলে গেল।

আবার গণ্ডগোল লেগে গেল কারখানায়।

কারখানা বন্ধ।

হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল সীতারাম তেয়ারী।

সোনিয়া রমেনের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, 'বাবুজী, আমাদের কি হবে?'

তারা দেশে চলে যেতে চায়। চিঠি দিয়েছে তেয়ারীর ভাইকে। সোনিয়ার চাচা এসে সবাইকে নিয়ে যেতে চাইলে সোনিয়া যেতে চাইলে না। রমেনের কাছে নাকি থাকবে সে! তার সন্তানের মা হতে চলেছে যে!

সোনিয়া বললে, 'তুমি যে আমাকে বিয়া করবে বলেছিলে?'

'বলেছিলাম, কিন্তু আমি একজন ছাপোষা বাঙালী ভদ্দরলোক, আর তুমি হিন্দুস্থানী মেয়ে।'

'চোপ শয়তান! ভদ্দরলোক! আমি চাচাকে বলে দেব? ভদ্দরলোকের নিকুচি করে দেবে?'

রমেন বোকা বনে গেল। সোনিয়া গালে চড় হাঁকায় যে!

'বাপকে হারিয়েছি, মা থেকেও নেই, দাদি বুড়া, ভাইবোন ছোট। এখন আমার এই অবস্থা করলে—কি আমি করব শুনি?'

রমেন বললে, 'তোমাকে যদি নিই, এত বোঝা আমি বইব কেমন করে? তুমি দুশো কি তিনশো টাকা নাও।'

সোনিয়া বললে, 'চাচা ওদের সবাইকে লিয়ে যাবে, দেশে ক্ষেতি আছে—কাম করবে। বাবা জমি কিনে রেখে গেছে। তুমি শুধু আমাকে সাদি করে লাও—আমার ইজ্জত খেয়েছ। তোমার টাকা আমি লিব না।'

শেষ পর্যন্ত বুড়ী দাদির সঙ্গে কি যেন যুক্তি করলে সোনিয়া। চাচা বোকা-সোকা লোক। ক্ষেত-খামার দেখে দেশের, গরু-মোষ চরায়।

বুড়ী রাজি হল। তিনশো টাকা দিলে রমেন সোনিয়ার হাতে। কোনো ক্লিনিক থেকে ব্যবস্থা করে নেবে নাকি তারা। আসলে বুড়ীই সব করবে—সে নাকি জানে সে সব। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাগুলোও তুলে নিলে ওরা তেয়ারীর।

সোনিয়ারা চলে গেল।

যাবার সময় সে পায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবু, আমাকে মনে রেখো।'

রমেনেরও দু' গাল বেয়ে চোখের জল ঝরেছিল।

পাগলের মতো সেদিন সারারাত শুধু কত কি হাতড়ে বেড়িয়েছিল বাসার অন্ধকারে। এ-পাশের বাসায় রমলা নেই—ওপাশে নেই সোনিয়ারা। এখানে আর পড়ে থেকে কি হবে?

কিন্তু মাস পেরিয়ে গেল। জীবনটা বড় একা একা বোধ হতে লাগল। ঘরে ফিরে যাবে কিনা ভাবতে লাগল।

এখন তার বিয়ে করা দরকার বোধহয়।

কারখানার স্টাফ লাইব্রেরীতে সহকর্মী বন্ধু সত্যেন সরকারকে সে কথা জানাতেই সে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল। আর তার বোন শীলাকে দেখিয়ে বললে, 'একে তোর পছন্দ হয়?'

রমেন বললে, 'অপছন্দর কি আছে!'

যদিও সে জানত শীলার সঙ্গে কারখানার ম্যানেজারের অবাধ মেলামেশার

খবর সবাই জানে। কিন্তু এখন ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যায়।...শীলা লেখাপড়া জানে। সুন্দর করে কথা বলতে পারে। চমৎকার রোমান্টিক মেয়ে।

ঘন-ঘন কয়েকদিন সে রমেনের বাসায় আসতে লাগল। ঘরটা তার গুছিয়ে পরিপাটি করে দিলে।

শীলা বললে, 'আপনার চাকরি চলে যেত এই মাসেই। ম্যানেজার শুনেছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। তাতে খুশীই হয়েছেন। আমি আপনার জন্যে রিকোয়েস্ট করেছি। কথা দিয়েছেন বিয়ে হলেই আপনার পদোন্নতি করে দেবেন। আর স্টাফ কোয়ার্টারে একটা ফ্ল্যাট দেবেন।'

শীলা অদ্ভুত মেয়ে। সব দিকে তার চোখ। চুল আঁচড়ে দিতে দিতে দু-হাতে রমেনের মুখখানা করতলে পদ্মফুল ধরার মতো করে চুম্বন করলে। ওর মধ্যে একটা আর্ট আছে। কার্টসি আছে।

অতএব বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য! সোনিয়ার অভিশাপ যেন রমেনের গলায় ফাঁস হয়ে এসে পড়ল। শীলা চার-পাঁচ মাসের পোয়াতি! যেমন ছিল সোনিয়া! যার জন্যে তাকে বিয়ে করতে পারেনি। শীলা অপরাধ স্বীকার করলে। কোনো ক্লিনিকেও যেতে চাইলে না সে। তার নাকি ভয় করে। বাচ্চাও হল একদিন। সুন্দর ফুটফুটে খোকা। কিন্তু রমেনের নয় তো।

ভাল কোয়ার্টার। হাজার টাকার চাকরি। ম্যানেজার একদিন বাচ্চাটাকে দেখে তিনভরি সোনার একটা নেকলেস দিয়ে গেলেন। আর রমেনের নাক ধরে টেনে দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের জীবন! নিকুচি করেছে! ইচ্ছে করে রমেনের সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালায় সোনিয়ার কাছে।

সোনিয়ার কথা কেবলই মনে পড়তে লাগল রমেনের। তার মন খারাপ হয়ে গেল। মনের ভেতরে একটা বন পুড়তে লাগল যেন তার।

কে জানে এতদিনে সোনিয়ার কি হল। হয়তো সোনিয়া তার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে। কিংবা হয়তো মারেনি। স্বামী মারা গেছে বলে ছেলেটাকে রেখে দিয়েছে। মহুয়া গাছের ডালে কাপড়ের দোলনায় শুইয়ে রেখে দিয়ে তার বাবার ক্ষেতে পাকা সোনালী গম কাটছে।

কিন্তু কাল সোনিয়ার স্বপ্নকে ছিনিয়ে নেয়।

রমেন শীলার ব্যবহারকে বরদাস্ত করতে পারে না। ম্যানেজারের সঙ্গে তার ঢলাঢলি আরো বাড়ে।

কিছু ইঙ্গিত করলেই খিলখিল করে হাসে, চোখ বড় বড় করে। বলে, 'তোমার গ্রামের বাপ-মা যদি একটা কলা-বউ করে দিতেন, তুমি সংস্কার মেনে রক্ষণশীল হয়ে, দিব্যি জীবন কাটাতে, না? মডার্নিটি তোমার পছন্দ নয়। আমি ঐভাবে অবাধ মেলামেশার মধ্যে মানুষ। ম্যানেজার সম্বন্ধে কটাক্ষ না করে বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার। ছেলেটাকে পর্যন্ত তুমি ঘৃণা করো, আদর করো না। ঠিক আছে, আমি আমার মতন থাকি, তুমি তোমার মতন থাকো।'

তাই হল। শীলার সঙ্গে রমেনের দৈহিক, মানসিক সব সম্বন্ধই বন্ধ হল। শুধু বাইরের ভব্যতায় তারা রইল স্বামী-স্ত্রী মাত্র।

কাল গড়িয়ে চলল।

উইভিং ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেব হয়ে গেল রমেন। ম্যানেজার এটুকু উপকার করলেন তাঁর প্রেমিকার স্বামীর জন্য। যে স্বামী সব জানা সত্ত্বেও অভদ্রের মতন, ছোটলোকের মতন ব্যবহার করেনি কোনোদিন। শীলার ছেলে ইস্কুল থেকে পাস করে কলেজে ভর্তি হল। ছেলে যুবক হয়ে উঠল।

তার চাল-চলন দেখে আশ্চর্য হয় রমেন। সে কখনো রমেনকে বাবা বলে না। বিরাট জুলপী রেখেছে। চোঙা প্যান্ট পরে। বুড়ো ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা। ট্যুইস্ট নাচে তারা দুজনে শীলার সামনে। শীলা হাসে উল্লাসে।

রমেন তার যৌবনস্মৃতিকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শীলার ছেলেকে দেখলেই সেই স্মৃতিটা যেন হঠাৎ আগুনের শিখার মতন জ্বলে ওঠে।

শীলার ছেলে একদিন বললে, 'রমেনবাবু, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

রমেনবাবু! তবু রমেন হাসলে। বললে, 'বলো।'

'আমার বাবা কে?'

'কার বাবা কে, জগতের কেউ তা সঠিক জানে কি? মন জানে পাপ, মা জানে বাপ। তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো।'

'তাই করব।' রূঢ়স্বরে কথা বলে ছোঁড়াটা টগবগ করে ঘোড়ার মতন বেরিয়ে গেল রমেনের খাস-চেম্বার থেকে।

সেদিন বারান্দার একান্তে শীলাকে কাঁদতে দেখলে রমেন। শীলা কাছে এসে

বললে, 'খোকা আমার গলা টিপে ধরেছিল আজ, বলে আমার বাপ কে? আমি তোমার নাম করতেই 'মিথ্যে কথা' বলে হঠাৎ আমার গলা টিপে ধরলে। আমাকে মেরে ফেলতেই সে চেয়েছিল। তার পায়ে ধরে সত্যি কথা বলবার শপথ করতে তবে ছাড়লে। বলেছি, তোর বাপ ম্যানেজার শিবশংকর প্রসাদ। শুনেই সে দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগল। কতো কাঁদলে। শেষে আমাকে একটা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সে পাগলের মতন চলে গেল।...'

রমেন হঠাৎ যেন জীবনকে আবিষ্কার করলে। এই তো চাই! এমনিই তো হবার কথা! বিত্ত দিয়ে, বাইরের রংচং ভব্যতা দিয়ে ভেতরের গলদকে, নোংরামিকে কি ঢাকা যায়? তবুও শীলার ওপরে তার কেমন যেন একটা সহানুভূতি হল। সে যেন হঠাৎ কোনো নভেলের পাতা থেকে সমূর্তিতে বেরিয়ে এসেছে, মুখে তার কালির ছাপ। চোখে তার পাপীয়সীর কান্না।

শুধোলে, 'খোকার হঠাৎ ক্ষেপে যাবার কারণ?'

'ম্যানেজার শিবশংকর সাবধান করে নাকি বলেছেন ওকে, প্রীতি তোমার আপন বোন, তোমরা একই বীর্যে জন্মেছ, তাই তোমরা অবৈধ কিছু করবে না।'

'কিন্তু তবুও তো খোকা ম্যানেজারের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে আজ— ম্যানেজারকে জব্দ করবে বলে। সে এখন খুন, জখম, ব্যভিচার, অন্যায়—সব কিছুই করতে পারে। সে জারজ সন্তান। মা তাকে ঠকিয়েছে। বাপ তাকে ঠকিয়েছে। তার সামাজিক পরিচয় ঘৃণার বস্তু। সবাই তাকে দেখে ইঙ্গিতে হাসাহাসি করে। ম্যানেজার আমাকে ফোন করে বলেছেন, তোমার ছেলে মিঃ শেলী আমার মেয়ে মিস হেলেনকে নিয়ে নাকি বম্বের ট্রেন ধরেছে।—আমার ছেলে? আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে তিনি 'তা বটে' বলে ফোনটা রাখতে গিয়ে আবার বললেন, শীলার ছেলে, আই অ্যাম স্যরি, জারজ সন্তান!'

শীলা বসে পড়ে আলুলায়িত কেশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রমেন এসে নরম বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়ল। ঘুমের পিল গিলে সে অচৈতন্য হয়ে গেল, পাছে তাকে আর কিছু না শুনতে হয়।

পরদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

বড় সরদার হরিহর তেওয়ারী একটি বছর আঠারো বয়েসের সুন্দর ফর্সা দেহাতী ছেলেকে সঙ্গে করে এনে বললে, 'বাবু, একে কাজ দিতে হবে, বেহার থেকে এসেছে।'

রমেনের মাথার সব চুল পেকে গেলেও চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়নি। সে ছেলেটির আপাদমস্তক একবার দেখলে। তারপর যেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। সঠিক তার নিজের যৌবনের মূর্তি যেন!

শুধোলে, 'কি নাম তোমার?'

'লক্ষ্মীনারায়ণ।'

'বাপের নাম?'

ছেলেটি চুপ করে রইল। মাটিতে পা ঘষতে লাগল।

'বাপের নাম কি?'

'মেরা মায়ি বোলা হ্যায়, তেরা বাপ হ্যায় এক বঙ্গালী বাবু, উন্‌কা সাথ মেরা সাদী হোয়ি থি লেকিন বাবু সাদীকা ছে-মাহিনা বাদ মর গিয়া থা। মায়ি হামকো হাস্পেলিসে লেকর বেহারমে হামারা নানাকো ডেরামে চল আয়ি থি বঙ্গাল মুলুক ছোড়কে। নানাভি মর গিয়া থা এহি কারখানামে। মায়িকা চাচা হ্যায় মুলুকমে—ওভি জইফ বুঢ়া বন গিয়া—মায়ি-কা বহুত তথলিফ হোতা হ্যায়।'

'তোমার মায়ের নাম কি?'

'সোনিয়া।'

'বাপের নাম জানো?'

'রমেন মিত্র।'

রমেন মিত্র অবাক। তাকে নিয়ে কি বিধাতা নাটক লিখছেন? এমন অঘটনও ঘটাতে পারেন তিনি।

তেয়ারীকে সে চলে যেতে বললে। বললে, 'একে কারখানায় নয় তেয়ারী, আমার কাছে কাজ দেবো। আমার বাড়িতে থাকবে। ভাল মাইনে দেবো। ওর মাকে ও আনতে যাবে।'

তেয়ারী বহুত খুশী হয়ে সালাম জানিয়ে চলে যেতে লক্ষ্মীনারায়ণ তার জামার পকেট থেকে একটা বিবর্ণ ফটো বার করে দিলে। বললে, 'মায়ি বোলা হ্যায় এহি আদমী হামারা পিতা থা।'

রমেন বললে, 'আশ্চর্য! সোনিয়া আমার ছবি কখন নিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে চুরি করে, আমি তো তা জানতাম না!'

'আপনার ছবি?'

'হ্যা বাবা, আমি সেই রমেন মিত্র। তোমার বাপ। আমি মরে গেছি খবরটা মিথ্যে করে তোমার মা বলেছিল। আহা, অভাগী, সারা জীবন আমার জন্তে

কষ্ট করলে ! বিয়ে-সাদী করলে না। তুমি কিছু খাবে বাবা লক্ষ্মী ?'

লক্ষ্মীর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তাকে আবেগে পুত্র-স্নেহে পাগল হয়ে জড়িয়ে ধরলে রমেন। বাসায় নিয়ে এল।

শীলা চোখ তুলে তাকাতেই বললে, 'এ আমার ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ। সোনিয়ার ছেলে। সোনিয়া আর বিয়ে করেনি। আশ্চর্য সতী মেয়ে। আশ্চর্য প্রেমিকা। লক্ষ্মী, তুমি গা-হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া করো। ভাল জামা-কাপড় দিচ্ছি আনিয়ে। টাকা দেবো, রাত্রের ট্রেনেই তুমি চলে যাও বিহারে—তোমার মাকে নিয়ে এস।'

শীলা বললে, 'আমি কোথায় থাকব ?'

'ম্যানেজারের কাছে চলে যাও, তিনি রিটায়ার করে দেশে চলে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে চলে যাও।'

'তুমি অনুমতি দিচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

ট্রেন চলেছে বিহারের দিকে। লক্ষ্মীনারায়ণ মাকে আনতে চলেছে। ঝমাঝম—ঝমাঝম।...

রমেন ভাবছে : সোনিয়ার যৌবন এখনো কি জেগে আছে, নিশ্চয় আছে, চৌত্রিশ বছর বয়সে কি কোনো দেহাতী মেয়ে যৌবন হারায় ?

বেতাল-ভৈরব

'আমি স্বার্থপর মানুষের কোনো আইন মানি না শালা !'

কোমরের তবিল খুলে টাকা-পয়সা ঢেলে সাত বোঝা প্যাকাটির দাম ফেলে দিয়ে লম্বা কাপড়ের তবিলটা আবার কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নারকোলের বস্তা ক'টা ঠিকঠাক করে রেখে মানিক রায় গজগজ করতে থাকে : 'আমার বাপ ভগবানের নাম করত। আর গাড়োয়ান-পাইকেরদের ষ্যাখন খড়, উলু, নারকোল গুনে দিত, কম দিত, হুড়োত, মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাবার জন্যে হাজারটা দিব্যি গালত। দুধে জল দিত। কি মিষ্টি-মধুর মুখের বাণী ছিল মাইরি, শুনলে পাষাণ গলে যায় ! কিন্তু সেই লোক শালা ঘর-জ্বালানী কেসে অনুকূল মণ্ডল—দালাল—শালা

অত্যাচারী পাপিষ্ঠির পক্ষ নিয়ে 'সত্য বৈ মিথ্যা বলব না' বলে শপথ করে ডাহা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এল! একটা বিচার-সালিশী বসুক, ডাকো সেই বেণীমাধব রায়কে। চুলচেরা বিচার করে দিত নাকি আমার বাবা। কিন্তু আমি তার বড় ছেলে, তাকে আমি যতখানি জানি আর কোন্ শালা জানবে? যে আগে তাকে ডাকতে যেত সে অপরাধী হলেও বাবা কিন্তু তার পক্ষ নিত। গ্রামে সেটাই রেওয়াজ। চুল যা চেরে একেবারে উকুন বার করে ফেলে। বাবার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই, রোজ শালা তিন-চার বোতল করে চোলাই ঢালতুম গলায়, কিন্তু কোনোদিন বাবা আমাকে প্যাঁদায়নি। শুধু ছোটবেলায় একবার মেরে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল মান্নাদের তরমুজ চুরি করে এনেছিলুম বলে। মদ খেতুম, জোয়ান ছেলে, আমাকে না শাসিয়ে মাকে গালাগালি করত। মা ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালাত। কিন্তু মা কিংবা বাবা তো জানত না মদের নেশা কি জিনিস—একবার খেয়ে অনুশোচনা হলে ফের খেতে হবে। তবু বাবার কথা বলছি এই জন্যে যে, যে-লোকটার সমাজে এত সুনাম ছিল তার চরিত্র যদি এই হয়, তাহলে আমাদের তো কথাই নেই! আমাদের মতন হাঁড়িমারা হুনো বেড়ালদের চরিত্রের ছবি আঁকতে বেটা চিত্রগুপ্তই তো চিৎপাত! ভালটা কে শুনি? ওই বাইরে চকচকে! সবাই সাধু! শালা ইন্দ্র বাকুলী তার জীবনের প্রেমের গল্প বলছিল কাল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে মেয়ের পীরিতে সে হাবুডুবু খেলে অথচ বলে, তবে ভাই 'খারাপ কাজটা' করিনি। 'পবিত্র ভালবাসা' ছিল।—পবিত্র ভালবাসা কি জিনিস অধম তা ভাল বোঝে না। ইন্দ্রকে যেই বললাম, তাহলে তাদের সঙ্গে তোর মা-ছেলের সম্পর্ক ছিল? সে বেটা ক্ষেপে গেল।'

হা-হা করে হাসতে লাগল মানিক রায়। চাবুস চাবুস করে পান-চিবানো কালো দাঁত, রাঙা ময়লা ঝোলা ঠোঁট। খানিকটা ভুঁড়ি ঝুলছে পেটে। তলপেট বার করে ময়লা ধুতি পরা সেঁটে-সুঁটে। বড় বড় গোঁফ। দাড়ি কামানো। মাথায় বিশৃঙ্খল চুলের গোছা। চোখ দুটো কটা, রক্তাভ। মদের গন্ধ বার হচ্ছে মুখ থেকে ভকভক করে। ফরসা গোলগাল দোহারা চেহারা। ঘাম ঝরে পড়ছে এলো গা থেকে। মাথায় হাত বেঁধে বুদ্ধিতীক্ষ্ণ ট্যারচা চোখে একটা পায়ের ওপরে অন্য পা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানিক রায় কথা শুনছিল প্রহ্লাদ প্রামাণিকের। তাকে নাকি সুদাম মান্না ধানের বীজতলা না দিয়ে সব ঝড়া-ধানের চারা দিয়েছিল —তিন বিঘে জমি ঝড়া-ধান পড়ে বেবাক বরবাদ হয়ে গেছে।

মানিক রায় বলে, 'তা তুমি কি রকম বাবুচাষী, ঝড়ার গাছও চেনো না? ফাঁকি তো সবাই দেবে, জগৎটাই তো ফাঁকিবাজির আখড়া! তোমার চোখ নেই? তুমি শালা ঠকলে, তোমার নামেই তো কেস দায়ের করা উচিত। কেননা বোকা লোক। সংসারে অচল। লোকে কুমোরবাড়ি হাঁড়ি কিনতে গিয়ে বাজিয়ে দেখে—খ্যানখ্যান করে শব্দ উঠলেই তাকে রেখে দেয়। কেউ নেয় না। ফাটা হাঁড়ি। তুমি দেখেশুনে সোনা কিনে বেনে দোকান থেকে নেমে এসে হঠাৎ যদি আবার গিয়ে বলো, মশায়, দুলটা একটু দোমড়ানো, তারা হাসবে। বলবে, দেখে তো নিয়ে গেলেন। আপনি দুমড়ে ফেলেছেন খুলতে গিয়ে। বদলাতে গেলে 'বানী' বাদ যাবে বারো টাকা। সুদাম মান্না 'ধুত্তু' লোক। তার সমস্ত বাদা-জমিটাতে ঝড়া-ধান চারা জন্মায়, আর বীজতলার অভাব পডলে কারো, বাইরের লোক হলে হরদম বিক্রি করে দেয়। তা তুমি কি জমিতে যাওনি কার্তিক মাসের গোড়ার দিকে? ধান আশ্বিনের শেষে, কিংবা ডহর জমি হলে কার্তিকের প্রথমে ফুলে যায়। ঝড়া হয়েছে দেখলে ঝরে পড়বার আগেই টেনে টেনে শীষ উপড়ে নিতে হয়। ওর নাম 'কার্তিকে ফাঁকি'। কার্তিক মাসের শেষের দিকেই পেকে ঝরে পড়ে যায়। ধানের পিছনে বড় বড আধ-আঙুল সুমো।'

লোকটা বললে, 'বাদা-জমি, মাইলখানেক ঘন বন ভেঙে জল ভেঙে যেতে হয়। সেই নিড়েনের পর আর যাওয়া হয়নি। তা ধান-চারা আর ঝড়া-ধানের চারা কি চেনা যায়?'

মানিক রায় বললে, 'যায় বৈকি। পাতা, গাছের গোড়া দেখলেই চেনা যায়। ঝড়ার চারা তো একটু চওড়া মতো, ধারে ধারে শুঁয়াপোকার গায়ে যেমন কাঁটা থাকে, ছোট ছোট সুমো থাকে। অবশ্য ধানপাতাতেও করকরে ধার থাকে, নিড়েন দেবার সময় খালি গায়ে থাকলে গা কেটে যায়, ঘাম হলে জ্বালা করে, দুদিন পরে সেই দাগ ফুটে ওঠে। যাকগে, সুদামের কাছে যাচ্ছ এখন?'

'হাঁ। এইরকম করে কেন ঠকালে তাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।'

হাসলে মানিক রায়। হোমিওপাথি ডাক্তার সুধাংশুভূষণ পদ্মরাজ মশায়ের ডিস্‌পেনসারির বেঞ্চিতে এসে বসল।

ডাক্তার বললেন, 'আসুন মানিকবাবু। আপনার জন্যে একটু চা বলব কি?'

মানিক রায় বললে, 'বলুন। আমার কোনো কিছু খাদ্যেই নিরাসক্তি নেই। অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য সব খাই। মরবার ভয় 'পরাচিত্তে' করলেই হবে।'

ডাক্তারটি রোগা লম্বাটে কালো লোক। টুকরো টুকরো কাগজে সুগার ঢেলে গ্লোবিউল দিয়ে মুড়ে পুরিয়া পাকিয়ে দিয়ে আড়-ঘোমটা-দেওয়া মেয়েটার হাতে দিলেন। সবুজ শাড়ি-পরা মাঝবয়সী মেয়েটা গুরু নিতম্ব দোলাতে দোলাতে চলে গেল। বলে গেল, 'সন্ধ্যার সময় তুমি তাহলে একবার যাইও।'

মানিক রায় বললে, 'মেয়েটি কে ডাক্তার?'

'আমার এক গ্রাম-সম্পর্কিত খুড়ী। বড় দুর্দিন ওদের। কাকাটা পাগল হয়ে নানান রোগে জলে ডুবে মারা গেছে। খুড়ীর তিনটে বাচ্চা। এখন বিড়ি বেঁধে পেট চালায়। মেয়েটার বুকের দোষ আছে। ওষুধ খাচ্ছে মাস ছয়েক। সারছে না। টাকা-পয়সা দিতে পারে না।'

মানিক রায় বললে, 'একটা কথা বলব ডাক্তার! আমি আবার একটু 'মুখফোঁড়'। টাকা-পয়সা দেয় না, অথচ খুড়ীর বুকের ব্যথা সারাচ্ছেন ছ'মাস ধরে, এরকম সমাজসেবা বা দরিদ্রনারায়ণের ওপরে ভক্তি কি না দেখালেই নয়? আপনার এই পবিত্র খুড়ী-ভক্তিকে নিয়ে কিন্তু সবাই ঠাট্টা করে, নিন্দে করে। পদ্মরাজ হলেও আপনি ভাল ধর্মশাস্তর জানেন বলে চরমৌরীর আশ্রমে 'শাস্তর পাঠ' করতে নিয়ে যেত। এরপরও—আপনার বয়স হওয়া সত্ত্বেও—প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে বিতৃষ্ণা জন্মাল না কেন সেইটাই আশ্চর্য! আপনি ছেলেমেয়ের ঘরের নাতি-নাতনীর মুখ দেখেছেন। আর কেন?'

ডাক্তার সুধাংশু পদ্মরাজ বললেন, 'মানিকবাবু, একটা কথা শুনবেন? নিজে আমি কতখানি সাচ্চা বা ঝুটা সে একমাত্র ভগবান জানেন। মানুষ তার বিচার করতে পারে না। নিকট-আত্মীয়ার সঙ্গে প্রেম নিশ্চয়ই অবৈধ, কিন্তু আমি কি একেবারেই অধম?'

মানিক রায় বললে, 'মানুষ পশু ছাড়া কিছুই না। জ্ঞান যদি না থাকে পশু বৈকি। সেই জ্ঞানটা কতক্ষণ থাকে? আর জ্ঞানটা তরল কি কঠিন আমি এক্ষুনি পরীক্ষা করতে পারি। আপনি বাজি রাখুন। কেউ কেউ দেখেছে, আপনি দোরের পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মেয়েটির বুক দেখেন অনেকক্ষণ ধরে।'

'তা করি। বুকে ওঁর ব্যথা। ডাক্তারের এসব করার অধিকার আছে। রোগিণী কি আপনাদের কারো কাছে এ নিয়ে কোনো নালিশ বা অভিযোগ করেছে?'

'এই তো মুশকিল! ডাক্তার, এটা যে গ্রাম। যাক গে, সাবধান করে

দিলাম, বন্ধু লোক। লোকজন আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমাকে বলেছে, ওই ভদ্দরলোকটাকে আর বাড়িতে ঢুকিয়ে মেয়েদের 'তিকিচ্ছে' করাবেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে আপনাদের খুশী। আমি তো কারো পায়ে ধরছি না রোগী দেখাও, রোগী দেখাও বলে।'

মানিক রায় রেগে উঠল। বললে, 'পায়ে ধরছেন না ঠিকই, কিন্তু মাথায় চোট মারছেন। আমার বউকে আপনি দেখতে গেছিলেন, তার হল আঙুলহাড়া —আপনি তাকে শুইয়ে পেটে ব্যথা কিনা, বুকে দরদ কিনা—মায় স্বামীর সঙ্গে বিছানার সুখ কেমন হয়—এসব জিজ্ঞেস করেছেন। আপনি ভদ্দরলোক, আপনার সাচ্চা মনের খবর ভগবান জানেন। সমাজের আপনারা মাথা, এই তো আপনাদের চরিত্র! ওয়াক থু!' রাগ করে বেরিয়ে চলে এল মানিক রায়।

নিজেই মাথায় করে নারকোলের বস্তা, প্যাকাটির বোঝা বইতে লাগল একটা ছোঁড়ার সঙ্গে মানিক রায় দুপুর পর্যন্ত।

মঙ্গলবারে সে সারা সপ্তার কেনা নারকোল বস্তায় ভরে নিয়ে যাবে হাটে। প্যাকাটিগুলো লাগবে তার পানবরোজে, পানগাছ ওঠার কাজে। রোজ বিকেলে তার হাটে-বাজারে কাঁচা আনাজ নিয়ে বাজরা মাথায় করে যাওয়া চাই-ই। রোদ ঝড় বাদল যাই হোক। এখন বাস, লরি হওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে। বাজরা এনে গাড়িতে তুলে দেয়। চারদিকে যতগুলি হাট আছে সব হাটেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পাকা মর্তমান কলা, বেল, পুঁইশাক, মুলো, পালং, কাঁচ-কলা, পটল, পান, নারকোল, শাকালু, আখ, গুড়, পাটালী—শত রকমের জিনিস তার ক্ষেতে-ডাঙায় ফলন হয়। মানিক রায় নামকরা চাষী। দোষ তার শুধু রোজ মদ খাবে। আর মনে যা ইচ্ছে ভাবনা এলেই মুখে তা ব্যক্ত করবে। পাচ ভাই সবাই আলাদা। সবার বউ ছেলে আছে। বুড়ো মা তার ভাতে আছে চিরকাল। চারটে গাই-গরু। দুটো হেলে গরু। বাপকেলে পেয়েছে দশ বিঘে ধানজমি আর পাঁচ বিঘে ডাঙাজমি। সাতটা পোনা পুকুর অবশ্য এখনো যৌথয় আছে।

দুপুরে বাড়িতে এসে মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরের পাকা দাওয়ায় ঘর্মাক্ত শরীরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। বড় বউ মন্দিরা এসে এক ঘটি জল মাথার কাছে রেখে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয়। অন্ত জায়েরা তা দেখে। এসব নিত্যকার ব্যাপার। বড় বউয়ের স্বামীভক্তি সংসারে

নাকি বিরল। মানিক রায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে, চোখ বন্ধ করে হাত-পা ছড়িয়ে কতক্ষণ। ভুঁড়িও আছে পেটে। ছোট্ ঠাকুরপো বড় বৌদিকে ইশারা করে দেখায়, জিব বার করে দাঁড়িয়ে যাও। অন্য বউরা সব হাসে।

পাখা দেখিয়ে ঠাকুরপোকে শাসায় মন্দিরা। ঘটির জল আঁচলে ঢেলে ভিজিয়ে নিয়ে মানিকের মুখ-গা-হাত মুছিয়ে দিয়ে হাওয়া করে।

মানিক ইচ্ছে করেই ফচকেমি করে, 'বড় বউ গো, পরাণ যায়!' বলে হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে মাতালের মতন, জড়ানো গলায়। আর হাত দিয়ে বড়-বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

ভাদ্দর বউগুলো লুকিয়ে পড়ে ঘোমটার আড়ালে জিব কাটে। এ মা! ছিঃ ছিঃ!

মন্দিরা বলে, 'দেখ কাণ্ড! কোমরের কাপড়ও খুলে গেল! কি মিনসে তুমি গা! চান করে এস—ওঠ।'

'উঠব? কোথায় উঠব? কদ্দূর উঠব? স্বর্গে? সেখানে তো বাবা আছে। বলবে, মানকে রে, তুই এখনো মদ খাওয়া ছাড়লিনি বাবা? তখন পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলব, বাবামশায় গো, মদ আমি খাইনি, মদ আমাকে খেয়েছে। বাবামশায়, আমি স্বর্গে এলাম কি করে!' গানের সুরে টেনে টেনে গলার স্বর বিচিত্র করে এমন জোরে কথা বলতে লাগল মানিক রায়—যেন বাড়ির সবাই শুনতে পায়।

'আমি তো অনেক পাপ করেছিলাম, চিত্রগুপ্ত তাহলে ফাঁকিবাজ হয়েছে, মানুষের নিত্য পাপের বোঝায় সে চাপা পড়বার ভয়ে পালিয়েছে কৈলাসে। বেটা দুর্যোধন পাপীর উরুভঙ্গ হল, আমার বাবা ধম্মের কথা বলে খড়, নারকোল, উলু, পান কম দিত গুনতিতে, দুধে জল দিত—তার কেন শির ভঙ্গও হল না! তাহলে আমরাও জন্মাতুম না। মদও খেতুম না। পাপ কাজও করতুম না। শালা, সব ভণ্ডামি। নট গিন্টি বঁটির বাঁট, চুবড়ি আলু কই মাছ!...বলো হরি হরিবোল হরি।' উঠে বসে মানিক রায়। তার মাথার চুলে একপলা তিলের তেল ঘষে দেয় মন্দিরা। গামছা আর খড়ম দিতে বড় পুকুরে চান করতে চলে এল মানিক রায়। জলে নেমে হঠাৎ খেয়াল হল তার কোমরের টাকার তবিল খোলা হয়েছে তো! হাত বুলিয়ে দেখলে। না, কোমরে বাঁধা নেই। মন্দিরা তাহলে খুলে নিয়েছে। তবিলের মধ্যে সকালে সাতশো টাকা নিয়ে গিয়েছিল সে। কত মাল কিনেছে হিসেব করলেই মিলে যাবে। ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে তবে হিসেব

করবে। নইলে সাতে ছয়ে পনেরো আর পাঁচে বাইশ আর নয়ে একত্রিশ আর নয়ে একান্ন। শালা অনেক টাকা 'সট' হল কেন!'

হাসলে মানিক রায়। কানে আঙুল গুঁজে শতখানেক ডুব দিতে তবে 'শরীল' 'শেতল' হল তার।

সাতটা তরকারী না হলে ভাত খায় না মানিক রায়। ঘি, পাতিলেবু, কাঁচা পিঁয়াজ, ডাল, আলু বেগুন করলা ভাজা, ট্যাংরা মাছের ঝাল, পুঁইশাক দিয়ে চিংড়িমাছ রান্না, পোনামাছ দিয়ে বেগুন আলু রান্না, কলা ছেঁচকি, কুমড়ো-ট্যাড়োসের অম্বল, শেষকালে পাটালী দিয়ে দুধভাত খাওয়া। ভূরিভোজন চাই মানিকের। নইলে ভুঁড়ি হবে কেন তার? ঘরের আনাজ-ফসল—খাবে না কেন? চামরমণি, দুধেশ্বর, দাদখানি, বাঁকতুলসী, কাটারীভোগ, গোপালভোগ, বাস-কামিনীর চাল থেকে তাদের ভাত হয় প্রতিদিন। মোটা চাল বিক্রি করে দেয়। মোটা চালের ভাত তার গলায় নাকি বাধে। বলে: গাবদানা!

শুধু ভাবনা তার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে। দেখাশোনা চলছে। কোনো ছেলেই পছন্দ হচ্ছে না তার। মেয়েটা ক্লাস টেনে পড়ছে। পাস করার পর দেখা যাবে।

মন্দিরা এসে বসল স্বামীর পাশে। পা টিপতে টিপতে বললে, 'খুকীকে নিয়ে আজ বিকালে তার মামার বাড়ি যাব হাঁ গা?'

'আমাকে কে দেখবে? আমি শালা মাতাল লোক, যদি একটা বউ এনে ফেলি?'

মন্দিরা স্বামীর মুখে মুখ চেপে ধরল। বললে, 'বলো না গো।'

'বলছি তো গো। আচ্ছা জানো তো তুমি, আমি কতখানি মন্দিরাগত প্রাণ! আমি শালা জগতে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তোমার বাপকেও না। বয়েস হল, সেই কচি খুকীটির মতনই রইলে। এখনো পায়ে হাত দিয়ে বাবার বাড়ি যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি! তুমি জানো, আমি মাল খাই। বেঘোরে কোথায় শালা পড়ে থাকব এসে কে জানে! এক রাত তোমাকে না পেলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমাকে জব্দ করবার মতলব, না?'

'ওগো তোমার পায়ে ধরি!'

'আমিও তোমার পায়ে ধরি!'

'ছি-ছি-ছি!' স্বামীর পায়ে মাথা ঠুকে গড় করে ক্ষুব্ধ মনে উঠে চলে গেল

তখন সাত পাড়ার ঘুম ভেঙে যায়। বড়কির আর ঘুম ভাঙে না। তখন গালা-গালি করে গোপাল ভোঁড়: 'শালীর বেটি কি মরল, না গলায় দড়ি দিয়ে ভাগাড়ে কেউ টেনে ফেলে দিয়ে এল তাকে। বড়কি, ও বড়কি, তোর পায়ে ধরি, নবাবের বেটি তুই, দোর খোল না! মশায় যে পা-ছুটো শালা ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে!'

বড়কিকে তার মেয়ে অথবা ছেলেরা কেউ ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে, পরনের শাড়িখানা পায়ের দিক থেকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে জগদম্বাও চেল্লাতে থাকে: 'এল মিনসে! আর সবুর সয় নে! যেন ইয়ে হয়েছে!'

গোপাল ভোঁড় কাঁধের বাঁক হাতে নিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'শালা শ্বশুর-মশায়টা 'সাথক' নাম রেখেছিল তোমার—জ-গ-দ-ম্বা! শালী জ্যান্ত ভগবতী!'

দোর খুলে দিয়ে টলতে টলতে এসে আবার বিছানায় ঢলে পড়ে জগদম্বা। মেয়েটা উঠে বাপকে খাবার দেয় হয়তো। রাত্রের খাবার মানে তো এক খোরা মুড়ি আর খানিকটা তরকারী কিংবা রুটি-গুড়। মেয়ের ঘুম না ভাঙলে নিজেই চাপা দেওয়া পাত্তর খুলে খেয়ে নেয় গোপাল। তারপর কালিপড়া হ্যারিকেনটা কাছে নিয়ে তবিলের সব টাকা-পয়সাগুলো মেঝেয় ঢেলে গুনতে থাকে বিড়ি টানতে টানতে। পাশেই 'চেৎরাং' দিয়ে পড়ে অকাতরে ঘুমোয় জগদম্বা। পাছা-ভারী খাটো মোটা তাজা চেহারা। বড় বড় ছুটো স্তন টেনে এনে পিঠেয় চড়ে ছোট তিন বছরের ছেলেটা চোষে চকচক শব্দ করে। জগদম্বার নিচের ঠোঁটখানা ঝোলা। শামলা রঙ। বিশাল একমাথা চুল। জগদম্বা কিন্তু ঘুমোবার ভান করে নাক ডাকালেও সে যে তখনো ঘুমোয়নি গোপাল তা জানে। একটু অন্য-মনস্ক হলেই হাত বাড়িয়ে ছুটো কি চারটে টাকা স্থট করে সরিয়ে নেবে মাগী। যেদিন ছুশো-একশো টাকা থাকে, বিয়েবাড়ি অথবা লগনসার অর্ডারী ছানা কিংবা দই দিয়ে তবিল ভরে টাকা আনে, ছু-এক টাকা দেবার জন্যে গোপাল ভোঁড়ের পরাণটা একটু সদয় হয় বৈকি। তখন সে বাঁ পা-টা হাঁটুমোড়া করে তুলে রেখে একটু অন্যমনস্কতার ভান করে, অন্যদিকে মুখ করে। আর জগদম্বা হাঁড়িখেকো চতুর হুলো বিড়ালের মতো নেয়ো বাড়ায় তয় তয়। থপ করে হাতটা ধরে ফেলে গোপাল। তারপর—।

জগদম্বা ছুধ ছুইতে ছুইতে মামদোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'হাতে 'খাউড়' ধরে

গেল! তোর বাপ মিনসে গো-ভাগাড়ে, ঘাটের মড়া, দুধ দুইতে পারে নে। তিনটে মোষ আর তিনটে গাইগরুর দুধ আমি একলা কি রোজ দুইব? এদের খড় কুঁচোব। মেয়েটা যদি না থাকত তো গামলায় জল-খোল-ভুষি কে দিত র‍্যা বেটা? তোর বউ তো পটের বিবি? যে থেকে এয়েচে খালি ব্যামো। আজ ইয়ে, কাল মাথা ধরা, পরশু পেট কনকনানি। রান্না করলেই মাথা ধরে। সারা-দিন গাধার খাটুনি খেটে সন্ধ্যের পর একটু শুলেই তোর বাপ এসে চেল্লাতে থাকে —'বড়কি, ও বড়কি!...'

হঠাৎ মোষটা জোড়া লাথি ছুঁড়লে কোমর চাগিয়ে তুলে ধরে। দুধের বালতি সমেত জগদম্বা দাসী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নোংরা কাদা 'পচ্‌রা'য় মুখ থুবড়ে। তার অবস্থা দেখে দোরগোড়া থেকে মোদো আনন্দে 'হরিবোল হরি' বলে নাচতে থাকলে জগদম্বা উঠে পড়ে একটা গোয়াল-কাড়া মুড়িঝাঁটা বাগিয়ে ধরে মুখের কালো কাদা নিয়ে ভূতের মূর্তিতে তেড়ে গেল ছেলের দিকে। মোদো তখন নাচতে নাচতে ছুট মারতে মারতে বলতে লাগল, 'তালকা আক্কসী আছছে তেলে। ধল্‌লে বাবা ফেলবে মেলে (তাড়কা রাক্ষসী আসছে তেড়ে। ধরলে বাবা ফেলবে মেরে)।'

বাড়ির চারদিকে সাত বেড় দৌড়েও দিনে-সেরখানেক-করে-দুধমারা-দুম্বা-ষাণ্ডা-চেহারার মোদোকে ধরতে পারলে না জগদম্বা। বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। গাল পাড়বে যে সে মুরোদও নেই তখন তার। দু কেজি আড়াই কেজি দুধ ফেলে দিলে মোষটা। মামদো তখন একটা ডাণ্ডা এনে মোষটাকে বেদম পিটতে আরম্ভ করেছে। মোষটা 'ওঁ-আঁক' করে শব্দ তুলে বিকট চিৎকার ছাড়ছে।

মামদো বলছে, 'শালা, তোমাকে কসাইখানায় দেব এবার। দশ সের দুধ দেখে চোদ্দশো টাকায় কিনে আনন্ তোমাকে কলকাতার খাটাল থেকে মোক্তা? দুধ ফেলে দেবে রোজ। 'ফুকো' না দিলে দুধ নাবাবে না। তিন কেজি দুধ হয় শালা একটা মোষের? কত টাকার খড়ভুষি ঢুকোও?'

হঠাৎ মোষের মাথায় ডাণ্ডা মারতে দেখে মোদো ছুটে এল। চিৎকার করে বললে, 'এই ছালা বড্‌ডা! মোছের মাথায় মাচ্চিস কেন? মলে যাবে যে লে ছালার বেতা ছালা।'

তখন তার দয়া বার করার জন্যে মামদোকে ধরতে বলে জগদম্বা। মামদো মোদোকে ধরলে সে কেয়ার করে না, খানিকটা নাটকীয় লম্ফঝম্প করে দুজনে। মোদোর গায়ে ক্ষমতা অনেক বেশি। তাকে জোরে মারলে দুই ঘুষি—মেরে শুইয়ে

দেবে। আর তখন তার বউদি ঘটি করে জল এনে মাথায় চাপড়াতে থাকবে আর কাঁদবে, 'হায় বাবা, তোমার কি হল গো!' সেই মারের অজুহাত দেখিয়ে সপ্তাখানেক শালার বড়দা আর কিছুই করবে না, বউকে নিয়ে হয়তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে ডাক্তারখানায় যাবার নাম করে। আর সেখান থেকে শুধু দুজনে 'টকী' দেখতে যাবে। কাজেই মামদো যতই কানমলা দিক সহজে মোদো ভারী মার দেবে না, দিলেই ওরা পালাবে। তখন দোকানের দুধ আর ছানা বয়ে মরো তুমি শালা!

হঠাৎ জগদম্বা এসে চুলের মুঠি ধরলে মোদোর। 'হরিবোল হরি? দুধটা পড়ে গেল, আমাকে লাথি ছুঁড়ে মোষটা ফেলে দিলে, তোমার হয়েছে আনন্দ!'

মোদো এক ঝটকায় দাদাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে পাঁজা করে ধরে চাগিয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল: 'হলিবোল হলি! হলিবোল হলি!'

জগদম্বার তখন শোচনীয় অবস্থা। হাসছে কাঁদছে গাল পাড়ছে সে: 'হি হি হি…ওরে বাবা মোদো, তোর পায়ে ধরি বাবা, ছেড়ে দে…ওরে ওলাউঠো, নাবানির বেটা, ছাড়লে কই!'

'মা আমাল কী ভালী লে ছালা! (মা আমার কী ভারী রে শালা!) চল মা, তোকে 'বিছজ্জন' দিয়ে আছি পুকুলে!' মোদো 'র'-কে 'ল' বলে—'স'-কে বলে 'ছ' আর 'ট'-কে বলে 'ত'।

সে তার মাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে সত্যিই পুকুরের জলে দিলে ছুঁড়ে ফেলে। তখন তার কাকারা, তিনটে কাকীমা, তাদের ছেলেমেয়েরা, বিধবা পিসি, নিজের ভাইবোনেরা—সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল। জগদম্বা সাঁতার জানতো, সাঁতরে ঘাটে এসে গা-হাত ধুয়ে উঠে এল। সেও তখন হাসতে আরম্ভ করেছে। হাসিও একরকম সংক্রামক উপসর্গ। অনেক সময় তা সমস্ত ক্ষোভ দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ মোদো দেখলে বাবা আসছে পাড়া থেকে দুধ দুয়ে কাঁধের বাঁকে পিতলের হাঁড়ি বসিয়ে নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে।

'ও বেতাল মুখে আবাল ছিগ্‌লেত!' বলেই মোদো সটকান দিলে একদিকে।

গোপাল ভোঁড় তার গিন্নি জগদম্বার হাত-পা-নাড়া ইত্যাকার সবিস্তার কাহিনী শুনে সেও মোষটাকে আবার পিটতে এল একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে।

মোষটা তখন কাঁধের এক চট্‌কা ঝোনা মেরে শিকল-বাঁধা বিরাট খোঁটাটা উপড়ে ফেলে ঘুরে পড়েই আক্রমণ করলে গোপাল ভোঁড়কে। শিংয়ে করে তুলে

নিয়ে দিলে এক আছাড়।

যত না লাগল তার চাইতে বিশগুণ ভয়ে চিৎকার করতে লাগল গোপাল : 'ওরে বাবারে মেরে ফেললে রে। ওরে বাবা মোদো, কোথা গেলিরে শালা, আয় না!'

মোষটা যমের বাহন হলেও কিন্তু নিতান্ত 'ভদ্দরলোক'। তার বাচ্চাটাকে দুধ খেতে না দিয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে ঐ গোপালেটাই মেরে দিলে, দু'বেলা 'ফুঁকো' দেয়, দু'পায়ে কষে 'ছাঁদন' বাঁধে, হরদম পেটন দেয়, তবু এখন সুযোগ পেয়েও গোপাল ভোঁড়ের পেটে পা তুলে দিয়ে পোঁটা বার করে দিলে না। আঁ-আঁ করে শব্দ তুলে ছুটে পালাতে লাগল মাঠের দিকে।

গিয়ে পড়ল মোল্লাদের ধানের নরম-নধর বীজতলার ওপরে। মোল্লারা চেঁচাতে লাগল। ডাণ্ডা নিয়ে তারা ছুটে এলে মোষটা তাদের সবাইকে ভীমরুল-দৌড় করালে! কিন্তু আশ্চর্য, মোদো ছুটে গিয়ে তার কান ধরে মুখে চাপড়াতে থাকলে সে কিছুই ব্যাঙ্গামো করলে না। মোদো তার পিঠে উঠে তেড়ে এনে পুকুরে নামিয়ে দিলে।

অন্য মোষ দুটোর দুধ দুয়ে দিলে মোদো। গাই তিনটে দুইলে গোপাল ভোঁড়। মোট পঁচিশ সের দুধ হল। তার সঙ্গে সের তিরিশ জল মেশালে জগদম্বা। মোষের দুধে জল খায় অনেক বেশি।

তারপর তিন চার বাপ বেটায় সাইকেলে, বাঁকে-ভারে নানান ধরনের টিন, ছোট ড্রাম বোঝাই করে নিয়ে তিন-চার মাইল পর্যন্ত চা-দোকান, মিষ্টির দোকানগুলোতে নিত্যকার বরাদ্দ দুধ দিতে চলে গেল। ভাই-ভাইপোরাও গেল তাদের সঙ্গে।

দুপুরে ফিরে পাউডার দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নিয়ে কলকাতা শহরে দিতে যাবে মামদো। গোপাল, মোদোও ছানা দিতে যাবে অন্যখানে।

গোপাল ভোঁড় বলে, 'দুধ ব্যবসার মাথায় ঝাঁটা! দু' কেজি পাউডারের দাম সাড়ে ন' টাকা। ছানা হবে চার কেজি, দাম দশ টাকা। আট আনা লাভ। এই আট আনার কাঠ পুড়বে,—মেহনত-য়ানা আছে। তবে যদি এক মণ ছানা কাটে রোজ তাহলে টাকা পাঁচেক লাভ হয়। কিন্তু দু' টাকা গাড়িভাড়া আর এক টাকা ছানার ভাড়া দিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলে থাকে মাত্র দু' টাকা। কাঠ পোড়ে দু' টাকার বেশি। তারপর ঐ খাটালের মোষ শালা, বেহারী গোয়ালারা দশ সের দুধ হয় দুয়ে দেখিয়ে হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে দিয়ে গেল—তিন মাস

পিঠ না দিতেই দুধ 'খেঁড়ে' গেল। তারপর খড়-ভুষির দাম অতিরিক্ত। তিনটে মোষ আর তিনটে গরুর খড়-খোল-ভুষি লাগে রোজ দশ-বারো টাকা। জমির খড় বলে কেবল রক্ষে! তারপর চামড়া নেবার লোভে মুচিরা বিষ খাইয়ে গরু-মোষ নষ্ট করে। রোগেশোকে মরে। গরুর দুধে আট কেজিতে চার কেজি ছানা হবে। পাঁচ সিকে কেজি গাইদুধ পাড়ায়। পাঁচ আষ্টে চল্লিশ সিকি, মানে দশ টাকা দুধের দাম। ছানা করে লাভ নেই বরং 'লোকসান'। তাই সব রসগোল্লাই এখন পাউডারের দুধ থেকে হয়। সে বিদেশী দুধ ভেড়ার কি গাধার আমরা জানি না।'

চা-দোকানী বলে, 'তোমার তো জল মেশানো দুধ হে, ভোঁড়ের পো। টাকায় টাকা লাভ!'

গোপাল ভোঁড় হাসে। বলে, 'জল মেশানো দুধ নয়, 'দুধ মেশানো জল' বলে কলকাতার রেডিও। 'মিটার' যন্তর বসালে যে দুধ আর জল কতটা দেখিয়ে দেয় গো মিষ্টি-দোকানগুলোতে! খাঁটি দুধ দু'টাকা কেজি দিলে দিতে পারি।'

'যদি লোকসানই হয় তবে পাকাবাড়ি করলে কি করে? 'মিটার' ধরবে কি করে যদি বাতাসা গুলে দাও?'

'সে ঐ বাপকেলে ধানজমি ছিল, খোরাকী হত। ব্যবসা থেকে কিছু জমেছিল, তাই। সেজো ভেয়ের ছেলেমেয়ে কম, বন্দুক হল, মিষ্টি দোকান হল। ছোট ভেয়ের মেয়ের বি. এ. পাস জামাই পেলে পাঁচ হাজার ট্যেকা খরচা করে।'

বাতাসা দেওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে গোপন তথ্য ফাঁস হবার ভয়ে আর কিছু বলে না গোপাল ভোঁড়।

'ছোট ভাইয়ের মেয়ের জামাই? না ছোট ভাইয়ের জামাই হল ও ভোঁড় মশায়?' একজন মাস্টার তার কথা ধরে।

'ঐ হল! ভগ্নীপতিকেও তো অনেক ভদ্দরলোক 'জামাইবাবু' বলে!'

গোপাল ভোঁড় বেশ রসিক লোক। সহজে রাগে না। শুধু জগদম্বাকে দেখলেই যেন আজকাল তার মেজাজ খচে যায়। মাগীটা ভীষণ চেল্লায়। আর ভাত খায় নাকি একসের-পাঁচপোয়া চেলের! আর মোষের মতন ঘুমোয়! ঘুমোলে হাত-পা কেটে নাও, হুঁশ থাকবে না। আর কেবল টাকা চুরি করবে। চোরের জাসু। বললে বলবে, 'কোন ইয়ের বেটি মাইরি মিথ্যে কথা বলে! চলো ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে বলছি!'

গোপাল বলে, 'থাক্ আর তোমায় ঠাকুর-দেবতা ছুঁতে হবে না। তোমার

যা টাকা জমিয়েছ তুমি তাই দাও, একটা বুড়ো হোক, হাবড়া হোক, জামাই করে আনি।'

জগদম্বা তখন যেন ফেটে পড়ে। বাঁশ ফাড়ার মতন শব্দ করে চেল্লাতে থাকে : 'আমি দোব টাকা? তাই দিয়ে জামাই আনবে? পোড়ারমুখো, 'নজ্জা' করে না? মেয়ের চেয়ে ছোট সাবিত্তিরির বে' হতে তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেল! মেয়ের 'যৈবন' ঝরে গেলে কি তুমি একটা বর আনবে? চোখ কি তোমার অন্ধ?'

'ওগো তুই চুপ কর! তোকে গড় করি! দেখছি, শালার জামাই কেমন পাওয়া যায় না মেয়ে কালো বলে! টাকা দিলে ছেলের বাপ সুদ্ধু এসে তোর ছিচরণের গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে!'

'ঐ তোমার বাক্যি সার!'

'তোর কাছে যা 'ট্যেকা' আছে দে, এই মাসেই কালিদাসীর বিয়ে দিয়ে দোব। না দিই তো আমায় 'গোপাল রে—' বলে ডাকিস!'

রাত্রে এক সুযোগে জগদম্বাকে রাজী করাতে পারলে গোপাল। শেষকালে তার পায়ে ধরলে, পায়ের তলায় চুম্ খেলে। তখন জগদম্বা উঠে স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে গড় করে বললে, 'তিন হাজার ন-শো টাকা আছে আমার কাছে, দোব। আর ঐ খচ্চর মোষটা বেচে দাও। ওর দুধও 'খেঁড়ে' গেছে।'

অগত্যা মোদো আপত্তি করলেও তার বোনের বিয়ের জন্যে শেষ পর্যন্ত মোষটা কসাইদের কাছে বিক্রি করে একটা মোষের মতোই চল্লিশ বছরের মহিষাসুর ধরে আনলে গোপাল ভোঁড়। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, জামাইটা নাকি ভীষণ মাতাল। গুণ্ডা। মেয়েকে যত গয়নাগাঁটি দিয়েছিল সব চারদিনেই ফুঁকে দিলে। মেয়ে আর তার স্বামীর ঘরে যেতে চাইলে না।

একদিন মাতাল হয়ে এসে জামাই চেল্লাতে থাকলে জগদম্বা ঝাঁটা নিয়ে তাকে বেশ করে ঘা-কতক কষাতে সেও ধরলে শাশুড়ীর হাত। আরে রামো! হৈ-হৈ কাণ্ড! তার গর্ভধারিণী মায়ের অপমান করছে দেখে মোদো ছুটে এসে ভগ্নী-পতিকে গোটা-দুই আষাঢ়ে ঘুষি মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে বেশ করে চুবিয়ে তার নেশা ছুটিয়ে দিলে সে 'ধরম বাপ' বলে সেই যে 'ভাগেল-বা' হয়ে গেল আর ছ-মাসেও দেখা নেই তার!

গোপাল গজগজ করে নতুন মোষের চৌকচাক করে দুধ দুইতে দুইতে,

'নেশার খেয়ালে শালা জামাইটা একবার মাস্তেরে শাউড়ীর হাত চেপে ধরেছিল বলে তাকে ঐ রকম মারধর করে চুবোয়? সে কি মানুষের বাচ্চা নয়? বলিহারি তুই শাউড়ী বাবা!'

গোপাল ভোঁড় আজকাল একটা চশমা কিনে নাকের ডগায় পরে আবার। চশমার উপর দিয়ে সে জগদম্বার মুখখানা দেখে নেয় একবার।

জগদম্বা বলে, 'মাথায় মারি ঝাঁটা অমন জামাইয়ের। মেয়ের আবার আমি বিয়ে দোব।'

'নিকে দিবি! তা 'তাল্লাক' হবে কি কেরে?'

জগদম্বা তা জানে না। ভাবতে থাকে।

কালিদাসী শুধু নীরবে কাঁদে খড় কুঁচোতে কুঁচোতে। কোনো কোনোদিন সে খড়-কুঁচোনো বঁটিতে হাত কেটেও ফেলে। তার বউদিকে নাকি মুখ ফুটে বলেছে সে, 'আর যাই হোক, 'লোকটা' আমার পাহাড়পানা ছিল!...কবে আবার আসবে কে জানে! একদিন না হয় আমি নিজেই যাব।...'

মোদো বলে, 'কাঁদিছনি কালীডি, ছালা ভগ্নীপোতকে একদিন আমি ধলে আনবই ডেখিছ। না হলে আমাল নাম 'মডুছুডন' নয়।'

জগদম্বা মনে মনে বলে, 'তাই যেন হয় হে ভগবান! জোড়া পাঁঠা বলি দেব তাহলে কালীঘাটে!'

জীনের গোলাম

দমকা ভূতুড়ে হাওয়ায় আড়মোড়া ভাঙে বাঁশবনটা।

শেকড়ের মতন ডালপালা ছড়ানো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে।

বনবিড়ালের মতো কটা নীলচে চোখ দুটো চকচক করে উঠল মস্তানের—তার দোসরা বিবি তহুরা খাতুনের হাই ভেঙে মদালস ভঙ্গিতে এলো উদোম বুকখানাতে কাপড়-না-দিয়ে বিচ্ছিরিভাবে শোয়া দেখে অথবা রাত এগারোটার পর তার হোজরায় কাদের যেন ডাকাডাকি শুনে। মস্তান জোরে জোরে কোরআন থেকে মুখস্থ-করা সুরা পড়তে লাগল সুর করে—দুলে দুলে—মোমবাতির আলোতে তার পীরহান আর টুপি-পরা দাড়িভরা চেহারার ছায়াটা দেওয়ালে দুলতে লাগল।

দলিজের ফুটো দিয়ে লোক দু'জন ভিতরে তাকিয়েই স্তম্ভিত। একটা মড়ার মাথা, বাটিতে জাফরান গোলা, তাতে পালকের কলম ডোবানো, সামনে আরবী অক্ষরে দোয়া-তাবিজ লেখা কাগজপত্র আর অলস নিদ্রায় যৌবন-জাগা একটি রমণী—প্রায় বিবস্ত্রা…

'মস্তান সাহেব আছ নাকি গো—আপনি একবার বাইরে এস তো…আমরা বাউড়ী গাঁয়ের লোক…'

দীর্ঘ ছ' ফুট লম্বা—কালো পীরহান-পরা—গলায় হরেক রঙের কাঁচের মালা—মস্তান সৈয়দ আজহার- আলী দস্তগীর খান জাহান্ আল্ বজবজিয়া খড়ম পায়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল আলো নিয়ে। তীব্র আতরের গন্ধ ছড়ালো চারদিকে।

মস্তান বললে, 'তোমরা আসবে আল্লার ফজলে আমি জানতাম। তোমাদের গেরামে 'ওবা' ঢুকেছে। গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। এগারজন মরেছে বোধহয়!'

'হুজুরের কিছুই অজানা নেই দেখছি।…'

এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁতে ফ্যারফেরে দাড়ি চুলকে খলখল করে হেসে উঠল মস্তান। ভয় পেল বোধহয় লোক দু'জন। মস্তান হঠাৎ জোরে শব্দ করে উঠল, 'ইল্!…ইল্…ইল্ হক্, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মোহম্মদর রসুলাল্লা!…'

মস্তান ওদের দুজনের হাত ধরে টেনে আনল হোজরার ভিতরে। লোক দু'জন প্রায় উলঙ্গ মেয়েটির দিকে লোলুপ চোখে তাকাতে লাগল। মস্তান একখানা লাল চাদরে মেয়েটির আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে বললে, 'বসো তোমরা। তোমাদের গায়ে কলেরার বিষ আছে। আজ না এলে কাল ভোরেই তোমরা মারা যেতে!'

লোক দু'জন মস্তানের কথায় ভয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। কুল-আঁটির মতন হয়ে গেল ঠোঁট দুটো। মস্তান বললে, 'ভয় নেই, আল্লাকে ডাকো। আমি তোমাদের গ্রাম থেকে 'ওবা' তাড়াবো। 'ওবা' হল কলেরার দূত—মন্দ মেয়েমানুষ! ঐ যে! আমার ঘরে এসে শুয়ে আছে। শুনবে ওর মুখ দিয়ে সব ঘটনা বার করব?'

মস্তান হড়হড় করে চল্লিশ গজ কাপড় বার করার মতন তার পেটের ভিতর থেকে মুখস্থ আরবী সুরা টেনে আনতে আনতে লোক দু'জনের চারদিকে ঘুরতে লাগল। লোক দু'জন সম্মোহিত হয়ে গেল যখন মড়ার মাথাটা তাদের মুখের কাছে নেড়ে নিয়ে মেয়েটির বুকের মাঝখানে চাপিয়ে দিলে। মেয়েটি নড়ল একবার। তারপর গোঁ-গোঁ করে শব্দ করতে লাগল।

মস্তান শুধোলে, 'বল্ বেটি 'ওবা'—কে মন্দ কাজ করেছিল বাউড়ী গ্রামে—

কখন কাকে তুই দেখা দিলি ?'

মেয়েটি হিঁ-হিঁ করে কাঁদতে লাগল প্রথমে। তারপর বললে, 'বাউড়ী গ্রামে, সবেদ আলীর বউ—আবেসন বিবি লুকিয়ে ব্যভিচার করত—আমি এগার দিন আগে সন্ধ্যার পর তার সামনে দেখা করে তার মূর্তি ধরে তার মনের মানুষ জায়েদের কাছে যাই। জায়েদ আমাকে ধরবার জন্যে এলে আমি খিলখিল করে হাসতে হাসতে মাঠের দিকে ছুটে পালাই। সেও পিছন পিছন ছুটতে থাকে। তারপর আমাকে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ঘরে ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে দেখে সবেদ আলীর বউ তখন দাওয়ায় বসে বসে কাঁটাল খাচ্ছে। ব্যাপার কি! সে টলতে টলতে এসে বিছানায় পড়ল। তার বউকে সব বললে। বউ বললে, ওমা! সে কি! তারপর জায়েদ আলী মরল। বান্নু, হাশেম, করিম, রহমান, দুলু, এবাদ, আম্বিয়া, আন্‌জুমন, আখলিমা, আবু মরেছে। তোমরা ফিরে যেয়ে দেখবে আর একজন মরেছে—তাকে আমি 'ভর' করে আছি—সে হল 'আবেসন বিবি।'

লোক দু'জন স্তম্ভিত। বললে, 'সব ঠিক!'

'এদের নাম কি ?'

'একজনের নাম পিয়ার আর একজন ওহাব।'

কাঁদতে লাগল তখন লোক দু'জন। মস্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরলে: 'মস্তান বাবা, আপনি আমাদের রক্ষে করো। আমাদের বাল-বাচ্চাদের বাঁচাও।'

মস্তান বললে, 'জিতা রহ বেটা। ডরো মৎ।' মড়ার মাথাটা মেয়েটির বুকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে এসে ঝোলাতে পুরলে। দু'জনকে খানিকটা করে সৈন্ধব লবণগুঁড়ো খাওয়ালে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে 'শঙ্করারিষ্ট' খাওয়ালে এক ঢোক করে। তারপর পিঠ চাপড়ে দিলে। বললে, 'গ্রাম বন্ধ করতে যাব আমি, আড়াইশো টাকা দিতে হবে আমাকে। আর 'খাজে খতম' করতে হবে। এইমাত্র 'চিলে' গ্রাম বন্ধ করে এলুম—সেখানে বিয়াল্লিশজন মরেছে। একটা মড়া 'থ্যান' পেয়ে দেখি 'মালসা' গিলেছিল!'

হঠাৎ মেয়েটি খিঁক করে হেসে উঠল। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে হাসতে লাগল। দমকে দমকে। মস্তান রাগে তার দিকে একবার তাকাল। মেয়েটি বললে, 'মালসা কত বড় আর গাল কত বড়? হি হি হি।...'

মস্তান বললে, 'বোঝ! মালসা কত বড় আর গাল কত বড়! শয়তান যখন হাঁ করে, তখন দুনিয়া গিলে নেয়!'

মেয়েটি এবার হাসতে হাসতে উঠে পড়ে দৌড় মারলে। তার বাইরে যাবার দরকার হয়েছিল, থাকতে পারেনি আর।

মস্তান বললে, 'শালা হারামি, মেয়েমানুষ হল ঘোড়ার বিষ্ঠা।...ছুঃ! ওরাই তো দুনিয়াকে পোড়ায়। বাবা আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড়!...কি, সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করতে পারবে? ডাক্তারকে তো অনেক টাকা ঢেলেছ!'

লোক দু'জন বললে, 'চলো হুজুর বাবা, আমাদের রক্ষে করো। টাকা আমরা যেমন করে পারি দোব।'

মস্তান তখন লাল কালিতে লেখা একটা বিরাট ফর্দ তাদের হাতে গুঁজে দিলে। বললে, 'এগুলো কাল যোগাড় করে রেখো—'খাজে খতম' হবে কাল রাত্রে। গ্রাম বন্ধ করে দিয়ে আসব। টাকাকড়ি এনেছ কিছু?'

'হাঁ বাবা—এই পঞ্চাশ টাকা আছে, এখন এই লও।'

ছোঁ মেরে টাকা ক'টা নিয়ে বললে মস্তান, 'এখন যাও। মেয়েমানুষটার তাড়াতাড়ি কবর দাও যেয়ে। দেরি করো না যেন। ঐ মেয়েটা 'আবেসন বিবি' না কি যেন নাম বললে? আমার একটা 'জীন' পালা আছে, 'এসম্ আজম' করে ডাকলেই ঐ মেয়েমানুষটার ওপরে 'ভর' করে—আর সব বলে দেয় সেই। অবাক হবার কিছু নেই—আমি কিছু জানি না—ইল্—ইল্...'

লোক দু'জন বাইরে বেরিয়ে এল যখন হোজরা থেকে, ঝড় উঠেছে তখন প্রচণ্ড বেগে। চারদিকে অন্ধকার। কাঁটালি চাঁপার গাছের পাশে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত সেই মেয়েমানুষটা! এলো চুল, গোল গোল বড় বড় দুটো স্তন—খোলা বুকের কাপড় উড়ছে—বিদ্যুতের আলোয় তাকে মোহিনীর মতো দেখাচ্ছে। মেয়েটি হাসছে। ওরা ভয় পেয়ে সালাম করতে করতে পালিয়ে গেল। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। মস্তান এসে বললে, 'ছিনাল মাগী, জ্যান্ত কবর দোব তোকে। লোকের সামনে ইয়ার্কি! টাকা না পেলে পেট চলবে কি দিয়ে?'

মেয়েটি ঝড় আর বিদ্যুৎ আর আকাশ দেখতে দেখতে বললে, 'বুজরুকি!'

বাড়িতে ফিরে এসে বললে, 'তুমি একটা 'জীন', একটা শয়তান, আল্লার নামে মিথ্যে ভেল্কি দেখাও, বুজরুকি করো। এত যদি জানো তবে একটা ছেলে হয় না কেন? মুরোদ আছে, বুড়ো হাব্ড়া!'

মস্তান চুপ। ওকে আদর করে কোলে বসায়। চুমু খায়। বলে, 'হবে হবে, এই দোয়া তাবিজটা বাঁধো...'

মেয়েটি ছিটকে হাত সরিয়ে দেয়। আবার গিয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ খিলখিল

করে হাসে ঃ 'বাব্বা ! বাব্বা ! বলে কিনা একটা মড়া মালসা গিলেছে ! ঐ মড়ার মাথাটা তুমি যদি ঘর থেকে দূর না করো আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবো, দেখো ! ঐ মাথাটা দেখলেই আমার কেমন যেন ভয় করে। তুমি কি সব আজেবাজে যেন আমাকে বলিয়ে নাও।'

মস্তান একটা শিশি থেকে হঠাৎ একটু তুলোতে কি যেন ঢালতেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠে বসে। মস্তান ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে পেড়ে ফেলে তার নাকে তা ঘষে দেয়। মেয়েটি হাত-পা নাড়ে কিছুক্ষণ। তারপর নীরব।

মস্তান হাসে। তারপর ফ্ল্যাশ লাইট, মড়ার মাথা, এক বাক্স গুঁড়ো জাফরান, ছুরি, দোয়াতাবিজ ইত্যাদি তার ঝুলি-ঝাপ্‌পার মধ্যে ভরে নিয়ে দোরে চাবি এঁটে দিয়ে বেরিয়ে যায় অন্ধকারে।

গহিন রাত। ঝড় বইছে। খরগোস, খ্যাঁকশিয়াল, খট্টাশ ছুটে যেতে দেখা যায় পথের পাশে মাঠের ওপর দিয়ে। আষাঢ় মাসের অর্ধেক হয়ে গেল, আকাশে বৃষ্টি নেই, রোজ মেঘ হয়, হুড়ুম-দুড়ুম শব্দ করে, ঝড় উঠে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ডোবার জল শুকিয়ে গেছে। পুকুরের তলায় ঠেকেছে নীল শ্যাওলা জমা পচা দূষিত জল। গ্রামে সেই বিষাক্ত জলে স্নান, রান্না, থালা-মাজা, গরুর গা-ধোয়ানো, কাঁথা-কানি কাচা—কলেরা লাগবেই তো ! মস্তান জানে, ভারি বর্ষণ না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই।

একেবারে ভোর রাত্রে যখন ক্লান্ত অবসাদে মানুষ একটু ঠাণ্ডা পেয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে মস্তান এলো বাউড়ী গ্রামের কবরস্থানে। পাশাপাশি অনেক নতুন কবর। ফ্ল্যাশ লাইট ফেললে। কয়েকটা শিয়াল—কবর খুঁড়ে মানুষের মাংস খাবার জন্য ধুলোমাটি মেখে ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়া পেয়ে তারা সরে গেল। অদূরের পল্লীটার মধ্যে—বার কতক কুকুর ডাকল।

আবেসন বিবির নতুন কবরটা দেখলে মস্তান। জামা-কাপড় খুলে বকুল গাছে টাঙিয়ে রাখলে। তাড়াতাড়ি মাটি সরিয়ে তালপাতা, এড়ো আর পাটাতনের লম্বা বাঁশ টেনে তুলে নেমে পড়ল কবরের মধ্যে। মড়ার কাফন খুলে ফেললে দেহ থেকে সবটা। যুবতী মেয়ে। পেটটা পিঠের সঙ্গে চেপ্টে গেছে। দাঁত বেরিয়ে আছে। ভয়ঙ্কর মূর্তি ! উঠে এল মস্তান। একটা প্লাসটিকের গামলায় টাটকা রক্তের মতো জাফরান গোলা নিয়ে আবার কবরের মধ্যে নামল। সমস্ত কাফনটা সেই রঙে ভিজিয়ে ফেললে। তারপর মড়াটার গালের মধ্যে খানিকটা কাফন ঢুকিয়ে একটা বড় চামচ দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঢোকাতে লাগল। খালি পেটে ঢুকে

চলল কাফনটা! মস্তান ঘেমে ভিজে নেয়ে গেল। ভয় করছে নাকি তার? কি সব শব্দ! শিয়াল ডাকছে! তাড়াতাড়ি উঠে এল সে। সব তুলে এনেছে তো? গামলা, চামচ, লাইট—হাঁ সব। এবার কবরটা যেমন ছিল চাপা দিয়ে দিলে। ব্যাস, সব ঠিক হ্যায়!

একটা ডোবাতে গা-হাতের মাটি রং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে জামা-কাপড় পরে বাউড়ী গ্রাম থেকে সে যখন অন্য গ্রামে এসেছে তখন সকাল হল। একটা দোকানে চা খেলে। বললে, 'গিয়েছিলুম ভাই বহু দূরে—ফলতায়—কলেরা ছাড়াতে। রাস্তায় 'ওবা'র কি কান্না!'

'বাউড়ীতেও তো বারোজন মরল।'

'হেঁ হেঁ—একটা মেয়ে তেরো হাত কাফন গিলে বসে আছে ওদের গাঁয়ের কবরে। কাল রাত্তিরে গিয়ে তুলব। তোমরা রাত একটার সময় যেও সব, দেখবে।...'

মস্তান বাড়িতে এসে দোর খুলে দেখলে তার স্ত্রী তেমনি পড়ে আছে। ঝোলা নামিয়ে রেখে একটা ইঞ্জেকশন দিলে মেয়েটির 'চিতোড়ে' (উরুর অভ্যন্তর ভাগে)। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির জ্ঞান ফিরল। গালাগালি করতে লাগল। মস্তান বুঝতে পারে ওর মাথায় একটু পাগলা ছিট এসে গেছে। আগেরটার মতন এও বোধহয় বদ্ধ পাগল হয়েই যাবে। অজ্ঞান করে রেখে না গেলে যৌবনের শিকার খুঁজতে হন্যে হয়ে পালাবে মেয়েটি। দুর্ভাগ্য মস্তানের যে সে অক্ষম।

দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে নিয়ে বিকেলে এলো মস্তান। হাতে তার বাহারে বাঁকা লতার লাঠি, কাঁধে সত্তর তালি মারা ঝোলা, গলায় রঙিন কাঁচের মালা, মাথায় জালি টুপি, কালো লম্বা পীরহান গায়ে দিয়ে। সবাই ভক্তিতে গদগদ। 'কদমবুসী' করতে লাগল সবাই।

এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের নামে ছোলা পড়িয়ে ফল-পাকড়, সন্দেশ-মিষ্টি দিয়ে 'খাজে খতম' শেষ করতে রাত দশটা বাজল।

দু-হাজারের উপর লোক জুটেছে মস্তানের কীর্তি দেখতে।

'খাজে খতমে'র ফল-মেওয়া বিলি করা হল। পাঁচখানা গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সবাই খেলে। বোতল শিশি ঘটিতে করে বহু লোক জল এনে মস্তানের পাশে বসিয়ে রেখেছে। মস্তান একবার বিড়বিড় করে সমস্তগুলোয় ফুঁ দিয়ে দিলে। তাবিজ-কবজ বিক্রি করলে শতখানেক টাকার। তারপর একা বেরুল অন্ধকারে। দৌড়ে গেল কবরখানার দিকে। হঠাৎ গ্রামের শেষ প্রান্তে তার আজান শোনা

গেল। আবার দক্ষিণে—তারপর উত্তরে। মস্তান ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। বললে, 'চল সবাই কবরখানায়, কোদাল লও, নতুন কাফন চাই আর দশ বালতি পানি।'

সমস্ত কবর পরীক্ষা করে দেখলে মস্তান হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কবরে কান দিয়ে দিয়ে। নতুন কবরের কাছে এলো শেষ বেলা। বললে, 'খুলে ফেলো এই কবর!'

মস্তান নিজে কোদাল ধরে মাটি টেনে দিলে প্রথমে। তারপর দু-চারজন মিলে মাটি খুঁড়ে ফেলে পাটাতনের বাঁশ তুলে দিতে মস্তান নেমে গেল কবরে। উলঙ্গ মড়াটাকে তুলে দিলে উপরে। মড়া সমস্ত কাফন গিলেছে! হায় বাবা!

কি ব্যাপার! তাজ্জব কাণ্ড!

মড়াটাকে সরিয়ে আনলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। মস্তান একটা গামছা চাপা দিয়ে দিলে তার কোমরে। তারপর তার বুকে পা দিয়ে গালের মধ্যে থেকে হড় হড় করে রক্ত-রঙিন কাপড় টেনে টেনে বার করে আনলে। লোকের তো চক্ষুস্থির!

মস্তান জোরে জোরে 'লা ইলাহা' পড়তে লাগল।

বালতির জল ঢেলে স্নান করানো হল মেয়েটিকে। আবার কাফিন পরানো হল। 'জানাজা' পড়ানো হল। গোর দেওয়া হল নতুন করে।

ভোর রাতে গাঁয়ের চার কোণে লাল নিশান উড়িয়ে দিয়ে গ্রাম বন্ধ করে টাকা নিয়ে মস্তান বাড়ি ফিরবার পথে প্রচণ্ড ধারায় বর্ষণ নামল।

বাড়িতে ফিরে দেখলে স্ত্রীর আপনা-আপনি জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে জানলায় বসে ঝড়ে-তোলপাড়-করা বর্ষণমুখর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছে উদাস মনে। তালা খুলে ভিতরে এসে মস্তান তার ঝুলি-ঝাপ্‌পা নামিয়ে রেখে ডাকলে, 'তহুরা —আমার 'সরাবন তহুরা'—এদিকে এসো। দেখো কত টাকা এনেছি।'

তহুরা বললে, 'রেখে দাও। মরলে পাকা কবর হবে। অনেক ভক্ত আসবে। কাওয়ালী গানের মাতম হবে সারা রাত। প্যালা পড়বে।'

'লও, এসো, গোসা করো না বিবি! মদ্দমানুষ হল বাজপাখি, সে কোথা থেকে কি ছোঁ মেরে শিকার করে আনে তা মেয়েমানুষের অতো বিচার করে দেখার দরকার নেই। চুরি-বাটপারি করার চেয়ে তো ভাল। বোকা মূর্খ সমাজকে সবাই ঠকায়। আমার সাহসকে তুমি তারিফ করবে না?'

'করি। কিন্তু আমার ভয় করে। সাপুড়ের যে সাপের হাতে মরণ হয়! তোমার যদি কলেরা হয়?'

হা-হা করে হেসে ওঠে মস্তান। বলে, 'আল্লা বাঁচানেওয়ালা!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তহুরা। বলে, 'আল্লা তোমাকে বাঁচাচ্ছে বললে আল্লার নামে কলঙ্ক দেওয়া হয়। তুমি তো জানো তুমি কতবড় শয়তানী করছ। আমাকে তিলে-তিলে মেরে ফেলছ—শুধু টাকার জন্যে—নামের জন্যে—কী চাও তুমি? আমাকে কেন তুমি বিশ্বাস করো না? কেন বন্দী করে, অজ্ঞান করে রেখে যাও? আমি যদি ঘরে আগুন দিই তুমি যখন ঘুমোও…'

মস্তান হঠাৎ উঠে পড়ে তলোয়ারটা পেড়ে নিয়ে শূন্যে তুলে কোপ বসাবার ভঙ্গি করে বলে, 'এক কোপে এক্ষুণি দু' টুকরো করে ফেলে দোব—চোপ!'—

ঝড় ছুটে চলেছে গাছপালা চুরমার করে।

হঠাৎ বাজ পড়ল একটা, প্রচণ্ড জোরে।

মস্তান টাকা গুনতে গুনতে বললে, 'কলকাতায় যাব ওষুধপত্র কিনতে, রান্না করো।'

জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল তহুরা। হঠাৎ একটা মেয়ে ভিজতে ভিজতে ছুটে এলো: 'বাবা, মস্তান বাবা, আমার কোলের বাচ্চাটাকে সাপে কামড়েছে—এসো বাবা—তোমার দুটি পায়ে ধরি…'

মস্তান তখনি ছাতা মাথায় দিয়ে চলে গেল মেয়েটার সঙ্গে। যাবার সময় বলে গেল, 'তহুরা, আজ থেকে তুমি মুক্ত—তুমি যা খুশি করতে পার।'

ফিরে এলো মস্তান রাত দশটার পরে। এসে কাঁদতে লাগল—মস্তানের চোখে জল! বললে, 'ছেলেটা বাঁচল না!'

ছেলের জন্যে তাহলে মস্তানের প্রাণেও মায়া-মমতা আছে? তহুরা অবাক। সে স্বামীর কাছে এসে বসল। লম্ফের আলোতে লোকটাকে নতুন করে দেখতে লাগল। মস্তান তহুরার রকম দেখে বললে, 'তহুরা, আমিও মানুষ, বুজরুকি না করলে চলবে কি করে!'

গন্ধ-ভেদালী

গেঁদালী বা গন্ধ-ভেদালী পাতা আনতে বলেছে মা। রোগা ভাইটা পথ্য পাবে আজ। শিঙিমাছ, কাঁচকলা আর গেঁদালী পাতার ঝোল নাকি খুব উপকারী। গাছটাকে ভাল করে চেনে না শিরীন। মা বলেছে, 'কবরস্থানের জঙ্গলে, আমাদের আনারস-বাড়ির কাছে দেখিস, লতানে গাছ, কালচে সবুজ একটু লম্বাটে পাতা, মল্‌চে দেখলেই যেন এক দুর্গন্ধ পাবি, যা আন গে।'

কবরস্থানের নির্জন জঙ্গল। শত শত সুদীর্ঘ সরল দেবদারু গাছ আকাশ-ছাওয়া-সবুজ-পত্র-সম্ভারে সমাচ্ছন্ন। আম, জাম, করমচা, খিরিশ, বাঁশ, কলা-গাছের নিবিড় জড়াজড়ি। দেবদারু বনের নিচে কবরস্থান। কবরের গর্ত বা জোল পড়ে আছে চারদিকে। চারদিকে লতা-গুল্ম ঘাস-আগাছা। মাঝে মাঝে সরু সিঁথির মতন পায়ে-চলা অস্পষ্ট পথ। আম কুড়োতে, নারকোল বা পাতা কুড়োতে আসে ছেলেমেয়েরা। দক্ষিণ দিকে আমির আলী মণ্ডলের পুকুর, ফলের বাগান। বড় বড় পেয়ারা পেকে আছে। গাছভরা পাতিলেবু। আনারস পেকে আছে অনেকগুলি। ডালিম, সবেদা, বেল, পেঁপে, কলা পেকে আছে গাছে গাছে। কেউ একটাতেও হাত দেয় না। মোড়ল ভীষণ পাজি লোক। চুরি করার সময় ধরতে পারলে সাবাড় করে ফেলবে। মোড়লের জমিতে সদ্য রোয়া ধানবাড়ির মধ্যে দিয়ে একটা লোক অন্য ক্ষেত থেকে কাজ সেরে আসছিল এক-বার—তাকে ধরে এনে কাস্তে দিয়ে একটা কান কেটে নিলে আমির আলী মোড়ল। অনেক টাকা ঢালা সত্ত্বেও মোড়লের তিন মাসের জেল হয়ে গেল। সেই সময় পাড়ার ছেলেরা যা একটু সুখ করে মোড়লের বাগানের নারকোল, কলা, আনারস, পেয়ারা, লেবু, কাঁটাল ধ্বংস করতে পেরেছিল। মোড়ল এখন চৌকি দিতে আসে—চুপচাপ বনের মধ্যে বসে থাকে। ধরতে পারলেই মুশকিল!

শিরীন দেখলে কবরের গর্ত থেকে দুটো শিয়াল ঝুপ-ঝুপ করে ওদিকে বাঁশ-বনের মধ্যে চলে যাচ্ছে পিছন ফিরে মাঝে মাঝে তাকে দেখতে দেখতে। শিয়ালগুলো এই নির্জন সুশীতল ছায়াঘন জঙ্গলের মধ্যে আরাম্‌সে সারাদিন শুয়ে ঘুমোয় আর রাত নামলে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যের সন্ধানে। মরা মানুষকে এখানে কবর দিয়ে গেলে ওরা মাটি খুঁড়ে লাস খেয়ে নেয়। তাই জমপেশ করে বাঁশ আর কাঁটা দিয়ে কবর দিতে হয়। আশ্চর্য যে কারো কারো কবর ওরা আবার

আদৌ ছোঁয় না! দিনের বেলা পাড়া থেকে মুরগী নিয়ে পালিয়ে এসে এই নির্জনে বসে বসে খেয়েছে, কত সব সাদা কালো আর রাঙা রাঙা পালক পড়ে আছে।

শিরীনের ভয়ে গা ছমছম করছিল। প্যাঁচা ডেকে উঠল কাঁটাল গাছের ওপরে। বিড়ালের মত গোল গোল কটা চোখ, ঠোঁটটা যেন নাক—চ্যাপ্টা মুখ—মাথা নাচিয়ে শিরীনের দিকে ভেংচি কাটে! তারপর একবার ছোঁ মেরে যায়। খিরিশ গাছের কোটরে বোধহয় ওদের বাচ্চা আছে। বাচ্চা পেড়ে নেবার ভয়ে ওরা ঐরকম চিৎকার করে। একবার শিরীন দেখেছে, বিরাট একটা কেউটে সাপ গাছ বেয়ে জড়িয়ে উঠে নারকোল গাছের কোটরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পাখির বাচ্চা খাচ্ছে আর এক ঝাঁক শালিক এসে চিৎকার জুড়েছে। ছোঁ মেরে খোপর দিয়ে অস্থির করে তুলছে সাপটাকে। সাপটা মাঝে মাঝে মুখ বার করে ছোবল হানতে চেষ্টা করছে।

মা বলেছে, 'খুব সাবধানে পা ফেলবি মা। চন্দুরে বোড়া শুয়ে থাকে ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে।'

শিরীন দেখলে তাদের আনারসগুলো গাছ থেকে ভেঙে এনে কারা বাঁশ-তলাটার নিচে বসে ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে আরাম করে খেয়ে গেছে।

কতকগুলো পাতার গন্ধ শুঁকল সে। এটা তো বন-তুলসী, এই হল ভেঁট, কাল-কাসুন্দে, কালমেঘ, বিশল্যকরণী। গেঁদালী গাছ তো লতা গাছ! গাছটা সে ঠিক চিনতে পারছে না। খালি হাতে গেলেই মা গালাগালি করবে'খন। বলবে'খন 'বে' দিলে ছেলের মা হয়ে যেতিস, তোর জুড়ি মেয়ের ছেলে হয়ে গেল, ষোল বচ্ছরী হয়েও তুমি এখনো খোলায় খুদ খাও, মালায় দুধ খাও!...'

মোড়লের বেড়াটার ধারে দাঁড়িয়ে সে পাকা ফলগুলো দেখছিল। কত পাকা লেবু পড়ে আছে গাছতলায় বিছিয়ে। হঠাৎ দেখলে আমির মোড়ল—ডাঙার মধ্যে রয়েছে। কলাবনের মধ্যে বসে-বসে হেঁট হয়ে পড়ে কি যেন করছিল। তাকে দেখে এগিয়ে এলো। শুধোলে, 'কে লো বুন, শিরীন না! জঙ্গলে কি মনে করে ভাই?' মিষ্টি করে কথা বললে মোড়ল।

শিরীন বললে, 'গেঁদালী পাতার জন্যে এসেছি মোড়লদা। খুজে পাচ্ছি না। আমি গাছটা ঠিক মতন চিনি না।'

'গেঁদালী গাছ? গন্ধ-ভেদালী? এই তো আমার বাগানের মধ্যে কত হয়ে রয়েছে। ক'গাড়ি চাই তোর? আয় লিয়ে যা।'

'কি করে যাব? বেড়া যে! তুমি দাও।'

'ঐ তো, ঐ ফাঁকটা গলে আয়। আয়, চাট্টি ফল দিচ্ছি। পেয়ারা লিবি? ডালিম লিবি? পাকা আনারস দুটো লিয়ে যা।'

শিরীন একটু দ্বিধা করলে, ইতস্তত করলে। মোড়লের চোখ-মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলে। এই নির্জনতা!···সোমত্ত ডাগর মেয়েছেলে।···যৌবন শিউরে উঠছে দেহে।···ইস্কুলের মাস্টার দুলাল দাদামশায় ঠাট্টা করে বলে, 'তোর খুব সুন্দর বর হবে রে শিঁরি! তোর চোখ দুটো সুন্দর। চেহারার গড়নটাও ভাল। আমাকে মনে ধরে তো বল, ঘর-সংসার, মান-ঈজ্জৎ সব ফেলে রেখে তোকে নিয়ে দেশান্তরী হই!' শিরীন বলেছে, 'মুখে ছাই তোমার বুড়ো!' আমির আলী মোড়ল পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে। কপালে দাগ হয়ে গেছে। রোগা ভাইয়ের জন্যে গেঁদালী পাতার ঝোল চাই। ফলগুলো দিলে সে খেতে পাবে। ভারী টাইফয়েড গেল। ডাক্তার ফল খেতে দিতে বলেছিল।···পয়সার অভাবে গরিব বাপ তার আনতে পারেনি।—বেড়া গলে ভেতরে গেল শিরীন। মোড়ল হাসতে লাগল। দুটো ডালিম পেড়ে তার বুকের ডালিমের ওপরে হাত ছুঁইয়ে কাপড়ের মধ্যে রাখতে দিলে। চারটে বড বড় পেয়ারা পেড়ে দিলে ছোট মতন গাছের ডালে উঠে। পেয়ারা দেবার পর দুটো আনারস ভেঙে দিলে। লেবু দিলে আট দশটা। আঁচল ভরে গেল। গন্ধ-ভেদালী পাতাটা দিলেই এবার চলে যাবে সে। কিন্তু মোড়ল তার চিবুক ধরে শুধোলে, 'কি, খুশী তো? ভারি সুন্দর তোমার মুখটা তো!' বলেই সে তাকে ধরে চুমো খেতে গেল।

শিরীন ভয়ে যেন একেবারে কেমন হয়ে গেল। 'মা'—বলে একবার চিৎকার করে উঠল। মোড়ল হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কলা বনটার ভেতরে।

'আহা, ছাড়ো না মোডল-দা, ছি ছি, কেউ দেখতে পাবে যে! মাকে বলে দেব।'

'বলে দিলে আমি বলব আমার বাগানের ফল চুরি করেছে!'

'আমি চুরি করেছি? তুমি ডেকে তো দিলে!' ফলগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেল আঁচল থেকে। মোড়লের তাজা দীর্ঘ শরীরের রক্ত তখন সিনাই মরুভূমির মতন গরম হয়ে গেছে। সে জোর করে শিরীনকে মাটিতে পেড়ে ফেললে। শিরীন চিৎকার করতে গেলে তার মুখটা চেপে ধরে রইল। শিরীন কাঁদতে লাগল। হাতের চুড়ি ভেঙে হাত কেটে রক্ত বার হতে লাগল। মোড়লের দাড়িগুলো শিরীনের মুখে বুকে ফুটতে লাগল। তবু সে হঠাৎ জোরে এক লাথি মারলে

মোড়লের বুকের ঠিক মাঝখানটাতে। মোড়ল পড়ে গেল উল্টে।

শিরীন উঠে পড়ে শাড়ি জড়াতে জড়াতে কেউটে সাপের মতন ফুঁসতে লাগল: 'হারামীর বাচ্চা, তোর মা বুন নেই? তোর সোমত্ত মেয়ে আছে না?' একটা আনারস কুড়িয়ে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে মোড়লের মুখে মারলে সে। মোড়ল তীক্ষ্ণ চোখে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করলে। বললে, 'তোর পায়ে ধরি শিরীন, কাউকে বলিস না। তোকে একশো টাকা দোব, শাড়ি দো'ব গয়না দোব। তোকে সাদি করব। তোর দেহ এত সুন্দর! এত নরম!...'

'চুপ কর শয়তান! আমি এক্ষুণি পাড়ার সব লোককে বলছি। বিচার ডেকে তোর মাথায় ঘোল ঢালব। পাঁচ খুরে করে তোকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সাত গেরাম ঘোরাব!...'

তখন ক্রুদ্ধ এবং হতাশ মোড়ল হঠাৎ ছুটে এসে আবার ধরলে শিরীনকে আর চিৎকার করে ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগল, 'আসগার আলী বে!—দৌড়ে আয়—চোর ধরেছি—'

শিরীন দেখলে, উল্টো বিপদ!

মোড়লের ছেলেরা তার বাপের দরাজ গলার চিৎকার শুনতে পেয়েছে। লাঠি নিয়ে তারা ছুটে আসছে।

শিরীন হাত মোচড়াতে থাকে। বলে, 'ছেড়ে দাও মোড়ল-দা, তোমার পায়ে ধরছি।'

'আর ছাড়া যায় না। এখনো বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে নষ্ট করেছি এটা যদি বলো তোমার জীবন 'বরবাদ' হয়ে যাবে। কেউ তোমাকে আর ঘরে তুলবে না।'

মোড়লের ছেলেরা এসে পড়ল হই হই করে।

মোড়লের বড় ছেলে আসগার দেখলে ভারি মজা! শিরীনকে প্রেমে ফেলবার জন্যে সে কত কায়দা-কানুন করেছে, শেষে পাট্টা জুল্‌পি পর্যন্ত রেখেছে, তবু মেয়েটা পটে না। ভারি দেমাক দেখাত টিউকলে জলের জন্যে যাবার সময় ঠোঁটে রঙ দিয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে। কিন্তু এখন? তার হাত ধরলে আসগার। ফলগুলো দেখিয়ে বললে, 'এসব কি!'

'তোর বাপ দিয়েছে।'

'মোর বাপ দিয়েছে?' মোড়ল তখন চলে যাচ্ছে। আসগার চুমো খাবার ভঙ্গি করে বললে, 'সোনামণি।'

সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে।

ঠাস করে গালে চড় মারলে শিরীন। হাতে কামড়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়া গলে সে পালিয়ে গেল।

ছেলেরা তাড়া করলে, 'ধর শালীকে! ধর শালীকে! থানায় নিয়ে চল!'

চেঁচামেচি শুনে শিরীনের মা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। মেয়ের ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, ঝাঁকড়া চুল, রক্ত-মাখা হাত-মুখ দেখে আঁতকে উঠে বললে, 'কি হয়েছে শিরীন?'

শিরীন মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু একবার 'মা' বলে উঠল। তারপর নীরব। সে অজ্ঞান হয়ে গেল।…

মোল্লাদের বাড়ির যত মেয়েছেলে লোকজন সবাই জুটল। মাথায় জল-ঢালা হতে লাগল শিরীনের। মেয়েদের আন্দাজ, মোড়লপাড়ার সব কটা ছোঁড়া শিরীনকে একা জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে ধর্ষণ করেছে!

শিরীনের মা আকলিমা বিবি হাত-পা ছড়িয়ে সুর করে কাঁদতে বসল: 'হায় আমার কপাল রে আল্লা, তোকে একলা কেন বনজঙ্গলে পাঠানু মাগো, হায় বাবা গেদালী পাতা, তোর মনে এই ছ্যালো! মোর মদ্দমানুষ এখন ঘরে ফিরে মোকে কি বলবে! কাঁচা মেয়েটার মাথা আমি খেনু গো!…'

পুরুষরা লাঠিসোঁটা ছোরা-বল্লম বার করতে লাগল। কিন্তু শিরীনের মুখ থেকে আসল কথাটা শোনা দরকার। সে সুস্থ হোক। কাছের চটকল থেকে শিরীনের বাপ দুপুরে খেতে ফিরুক।

দুপুরে দু' পাড়ার মধ্যে 'দুপুরে মাতম' শুরু হয়ে গেল। প্রথমে মেয়েরা গাল পাড়তে লাগল মোল্লাপাড়া থেকে। তারপর বেরুল মোড়লপাড়ার মেয়েরা। দু'পাড়ার দু'দল মেয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে যেন লড়াইয়ে নেমেছে। একবার সামনে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। পরে বেরুল পুরুষরা। লাঠি সড়কি বল্লম হাতে। শিরীনের বাপ আনসার আলী মোল্লা বল্লম নিয়ে বার বার ছুটে যেতে গেলে তাকে শিরীনের মা কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে রাখতে লাগল। শেষে যখন মোড়ল আমির আলী তার দলের লোকেদের পিছনে সরে যেতে বলে একাই খালি হাতে সাহসভরে এগিয়ে এসে বলতে লাগল, 'মাথা গরম করিসনি আনসার, তোর মেয়ে বাগানের ফল তুলেছিল কিনা হলপ করে বলতে বল—আর আমিও বলছি—তোর মেয়ের গায়ে কেউ হাত দেয় নে বাপ—! তোরা কি ঐ মেয়ে-ছেলেটার কথা শুনে আমাকে মারবি? একটু বিচার করবিনি?' তখন আনসার

হঠাৎ তার স্ত্রীকে এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিয়ে বল্লম নিয়ে ছুটে গিয়ে মোড়লের পেটে বুকে ঘ্যাচাঘ্যাচ খুঁচতে লাগল। মোড়ল চিৎকার করতে লাগল। রক্ত! রক্ত! মোড়লের ছেলেরা ছুটে আসছে দেখে মোল্লারাও খোলা তলোয়ার তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল সামনের দিকে। হেঁকে বললে, 'খামোস! এগুলেই বাপের সঙ্গের সাথী হবে! একটার জায়গায় দশটা পড়বে।'

মোড়লের লাস পড়ে গেল!

আনসার চলে এলো বাড়িতে। মোড়লপাড়ায় কান্নাগোল পড়েছে। মোড়লকে মেরে ফেলেছে শুনে ভয়েই আবার অজ্ঞান হয়ে গেল শিরীন।

পুলিস এলো সন্ধ্যার পর।

আনসার আলীপুর কোর্টে হাজিরা দিতে চলে গেছে। বড় দারোগা রিপোর্ট লিখতে লাগল। লাসটা ঝ্যাৎলার মধ্যে মুড়ে বাঁধা হল। ভ্যান গাড়িতে তোলা হল। মোড়লের খণ্ড-তয়ের মতন বাঁকা দাড়িটা শুধু আসমানের দিকে উর্ধ্বমুখী হয়ে আল্লাহ্‌র দরগায় কি মোনাজাত করতে করতে চলে গেল তা কেউ জানে না।

বিচারে আনসারের ছ-মাস জেল হল। ধর্ষণের চাইতে মানুষ খুন অনেক বড় অপরাধ—(যুদ্ধ বাধিয়ে রাজা বা রাষ্ট্র-প্রধান লক্ষ লক্ষ মানুষ মারলে তার বিচার নেই) শিরীনের ওপর ব্যভিচারের প্রমাণের জন্যে বেশি সাজা হল না।

ফল হল, শিরীনের আর বর জুটল না। আনসার জেল থেকে ফিরে বাধ্য হয়েই মোড়ল আমির আলীর গোঁয়ারগোবিন্দ মূর্খ ছেলে আসগারের সঙ্গে শিরীনের বিয়ে দিয়ে দিলে।

আসগার মহা খুশী হয়ে ঢোল বাজাতে লাগল: 'ছুঁড়ি তোর 'মুখ' দেখি তোর, 'মুখ' দেখি তোর, 'মুখ' দেখি তোর, কনের মায়ের 'ধড' ধাম্‌সা! তুই কি 'ইয়ের' ঘাড় ভেঙেছিস!' (ঢোলের বুলি, ইলেকের জায়গায় অশ্লীল শব্দ) শিরীন তার বরের 'ছেরন' (ছিরি—শ্রী) দেখে না হেসে পারলে না।…এর নাম হল জীবন।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

'আমার মা কোথা? আমার মা! আমি তার কাছে যাব। আমি মায়ের কাছে শোব। মা নেই কেন? আমার মা কোথা?'

'তোমার মা? তুমি সোনামণি ঘুমোও। ঘুমোলেই ঠিক দেখতে পাবে। তোমার মা এসে দেখা করবে।'

'আমাকে চুমু খাবে?'

'হ্যাঁ সোনা, তোমাকে চুমু খাবে।'

'মা কোথা গেছে?' পাঁচ বছরের খোকন সুজন হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে শুধোয় তার বাবাকে। তিন বছরের খুকীটির কান্না আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নির্মল সরকার নিজেও গোপনে কাঁদতে থাকে। কণ্ঠনালী তার শিঙি মাছের কাঁটা মারার যন্ত্রণায় যেন ফেটে যাচ্ছে। এক বছরের কচি খোকনটি চিৎকার করে ঘণ্টা কয়েক কাঁদার পর এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নেতিয়ে পড়েছে যেন মড়ার মতন।

খুকী কণা আবার বাবার চিবুক ধরে মায়া মাখানো আদুরে গলায় শুধোয়, 'ঘুমোলেই মা আসবে? মা ভাল। খোকন আমাকে মারে। মা এলেই মাকে বলে দোব। মা খুব বকে দেবে।'

'হ্যাঁ, খুব বকে দেবে।'

খোকন হঠাৎ বলে বসে, 'মা তো মারা গেছে! মা তো আর আসবে না! রুপালী, বর্ণালী, অশোক—ওরা বলেছে, তোর মা মরে গেছে রে! সে কোন্ অন্ধকারে চলে গেছে! আর আসবে না, আর হাসবে না! তোদের আর কোলে নেবে না। চুল আঁচড়ে দেবে না। এই শীতের সময় গায়ে জামা-কাপড় দিয়ে দেবে না। তোদের কাপড় ময়লা হয়ে যাবে। গায়ে মাথায় ধুলো-কাদা জমবে। আর তোর বাবাও তোদের কান্নায়, তোদের মায়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে পাগলা হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাপী, তুমি পাগলা হয়ে যাবে?'

নির্মল এবার ডুকরে কেঁদে উঠল: 'মন্দিরা, মন্দিরা! তুমি আমাকে কি পাগল করতে রেখে গেলে? আমি কি করব এখন! এদের আমি কেমন করে বাঁচাব?'

বড় মেয়ে সুধার বয়স আট। সে উপুড় হয়ে পড়ে লেপের মধ্যে একটানা ফুলে

ফুলে কাঁদছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল: 'বাপী, তুমি কাঁদবে না, তুমি কাঁদলে আমরা ভয় পাই!'

সুধা, সুজন, কণা, যীশু—চারটি কচি-কাঁচা সোনা। ওদের ফেলে রেখে হঠাৎ ওদের মা চলে গেছে। যাবার সময় সন্তানদের কথা ভেবে কেমন করে শেষ কান্না কেঁদে উঠেছিল মন্দিরা, বড় বড় চোখ মেলে, সে দৃশ্যটা ভুলতে পারে না নির্মল। কী নির্মম ক্রোধবহ্নি ছিল তার চোখে!

ছেলেমেয়েরা কেঁদেকেটে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। কি আর খাবে ওরা? দুটো ভাত রেঁধেছিল নির্মল সুধার সাহায্য নিয়ে। মেয়েটা ফেন গড়াতে গিয়ে হাত পোড়াল।

'কে তোকে ফেন গড়াতে বললে, দুষ্টু মেয়ে!' তাড়া দিলে নির্মল।

সুধা মুখ ঝুলিয়ে কাঁদতে লাগল নিমগাছটার কাছে গিয়ে—যেখানে তুলসীতলা—তার মাকে শেষ শোয়ানো হয়েছিল। যে পথে হরিবোল দিয়ে কাঁধে করে সবাই তার মাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় সুদূর নদীর চরে পুড়িয়ে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়।

কচি বাচ্চাটা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে দেখে চিৎকার করে তাড়া দেয় নির্মল, 'সুধা, ওখানে কাঁদা হচ্ছে—যীশুকে নিতে পারিস না? আমার আর কী! এই করি? অফিস গেল, রোজগার গেল!...'

ছেলেমেয়েরা এখন ঘুমিয়েছে। হ্যারিকেনটা খুব নিস্তেজ করে আলো কমিয়ে দেয় নির্মল। কচি বাচ্চা যীশু ঘুমের ঘোরে চুকচুক করে স্তন টানার মতন শব্দ করে। কচি কচি হাত দুটো দিয়ে মায়ের নরম নরম তপ্ত মধুর বুকের অমৃতাধার খুঁজে বেড়ায়।

স্বপ্ন দেখে সুজন হঠাৎ হাসতে থাকে। কথা বলতে থাকে: 'জানো মা, রুপালী বলে, তুমি নাকি মরে গেছ!...বাপী আমাকে আজ মারল।'... তারপর সুজন কাঁদতে লাগল।

বাইরে হিমার্ত পৃথিবী কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

প্যাঁচা ডাকতে লাগল—চ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ স্বরে।

শিয়াল ডাকে—কাক-কাক কা—হুয়া—হুয়া! কা হুয়া, কা হুয়া!

খট্টাশ ডেকে ওঠে—বাফ-বাফ-বাফ—ভুষ! ভুষ!

রাতচরা পাখি ডাকছে—চিকুর-চিকুর-চিকুর!

ঘরের আড়কাঠার কোথায় একটা ঝিঁকুর পোকা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ তুলে

ক্রমাগত একটানা বাঁশ কুরে খাচ্ছে। হাড়ের মজ্জা কুরে খাচ্ছে যেন পোকাটা।

খাটের ওপরের শয্যাটা শূন্য পড়ে আছে। মেঝেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠিক যেখানটাতে মন্দিরা শুয়ে থাকত আজ পাঁচদিন হল সেখানটাতে শুচ্ছে নির্মল। সারারাত মোটেই ঘুমোতে পারে না সে। একটু তন্দ্রা ঘনিয়ে এলেই হঠাৎ মন্দিরা এসে হাজির: 'একি গো! তুমি মা হয়েছ নাকি! হি-হি-হি···বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছ? ওঠ-ওঠ—এই উঠে গিয়ে খাটে শোও! তারপর হঠাৎ সে হাঁক দেয়, বল হরি হরিবোল হরি!'

উঠে বসে থাকে নির্মল।

কচিটা বিছানা ভিজিয়ে ফেললেই উঠে পড়ে। কাঁথা পালটে দিতে হয়। নোংরা করলে পরিষ্কার করে দিতে হয়। সকালে সেসব ধুতে হবে। রোদে শুকোতে হবে। মন্দিরার যে অলক্ষ্যে কত কাজ ছিল সেসব করতে গিয়ে এখন চোখে পড়ে যায়।

হাসির ব্যাপার, সুধা খানিকটা গোবর কুড়িয়ে এনে মাটির ঘরের মেঝে-দাওয়া নিকিয়েছিল সকালে।

মন্দিরা ওদের জন্যে টিন ভর্তি করে মুড়ি ভেজে রাখত। মুড়ি ভাজতে পারে না নির্মল। চাল দিতে পাড়ার রূপালীর মা ভেজে দিয়ে গেছে গতকাল। রূপালীর মাসী এসে ওদের কোলে নেয়, দেখে মাঝে-মধ্যে। নির্মল এসে পড়লেই পালিয়ে যায়। অষ্টাদশী কুমারী মেয়ে। মন্দিরার যেন সখীর মতন ছিল—তার গন্ধতেল মাথায় দিত—হিমানী মুখে দিত। মন্দিরা তামাশা করে বলত, 'আমি যদি মরে যাই হঠাৎ, তুই আমার সতীন হবি। তুই অনাথ মেয়ে—তোর দাদাবাবু তোর বিয়ে দিচ্ছে না। দেখিস যেন আমার পুরুষটাকে দখল করিস না।'

জমিতে ধান পেকে গেছে। জন লাগাতে হবে। পাশাপাশি আটনের ধান কাটা হয়ে গেছে। অনেকের ধান উঠে গেছে মাঠ থেকে খামারে।

নির্মলের শ্বশুর আছেন, তিনি বৃদ্ধ, স্কুল মাস্টার—শাশুড়ী নেই। নিজের মা-বাবা নেই। বাবা মারা যান তাকে মাত্র বছর দশেকের রেখে। মা মারা গেছেন গত বছরে। তিনি অনেক কষ্টে জমি-জিরাত চাষ করিয়ে ছেলেকে বি. এ. পর্যন্ত পাস করান। বিয়ের ব্যাপারটা নির্মলের 'লভ ম্যারেজ'। মা কিছু আপত্তি করেননি। কারণ মন্দিরা সুন্দরী ছিল দেখতে, অসামান্য সুন্দরী। আগুনের শিখার মতন। মন্দিরার রূপের প্রশংসা করলে সে বলত, 'কত মেয়ের মাথা ঘোরানো তোমারও তো রূপ আছে বাপু!'

লভ্! ভালবাসা! মন্দিরার ভালবাসা! তার স্বর্ণচাঁপার কুঁড়ির মতন দুধে ধোয়া শরীর আজ কোথায় হারিয়ে গেল! তার দেহ! দেহের বিচিত্র গোপন চিত্র! তার সন্তান! চারটি সন্তান! সুধা-সুজন-কণা-যীশু…সবাই শিশু! সবাই শিশু!…

চারটি সন্তান হয়ে গেল। অফিসে সে কথা বললে বন্ধুরা বলত, 'তুই কোন্ যুগে বাস করছিস র‍্যা? সগররাজার মতন ষাট হাজার সন্তানের জনক হবি নাকি? সন্তান মানুষ করতে টাকা লাগবে না? বন্ধ কর বাবা—বন্ধ কর—ভগবানের নাম করে এখন ক্ষ্যান্ত দে। বলতেও লজ্জা করে না তোর? তাছাড়া তোর সুন্দরী বউটা বুড়ী হয়ে যাবে—চুল পাকবে, দাঁত খসবে তাড়াতাড়ি। তোর ঠাকুরমা হয়ে যাবে!'

মন্দিরাকে এসব কথা বললে সে হাসত।

'এই না না, ইয়ার্কি না। আমি অপারেশন করে নিই।'

'না। কক্ষণো তা করবে না। করতে হয় আমি যা-হয় করব।'

'করব করব করে যীশুও তো আবির্ভূত হল।'

মন্দিরা বললে, 'ভাগ্যি কিছু করিনি। এমন সোনার চাঁদ এল আমার কোলে!'

'ওই নিয়ে থাকো। বিশ-বাইশটা ছেলেমেয়ে হোক তোমার। তোমাকে তো মেয়ের বিয়েতে টাকা বার করতে হবে না! ছেলেকে পড়াবার…'

'রক্ষে করো। আমারই সব দোষ। তবে ডাকো কেন, এই এসো না—আমার ঘুম আসছে না।'

শেষে হঠাৎ একদিন জন্মনিয়ন্ত্রক হাসপাতাল থেকে 'লুপ' নিয়ে এল মন্দিরা।

প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয়টা এল তিন বছর পরে।

তারপরেরটা দু'বছর পরে। শেষেরটা এল মাত্র দেড় বছর পরেই। গ্রামের ডাক্তার মন্মথ সান্যাল নাকি মন্দিরাকে বলেছিলেন, 'এবার সাবধান হোন, ঘন ঘন সন্তান আসবে। কেন না ইউটেরাস লুজ হয়ে গেছে।'

আগামী সন্তানের আগমন আতঙ্কেই লুপ নিয়ে এসেছিল মন্দিরা। জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ করা বন্দনা চ্যাটার্জিও তার কাছে আসত, বোঝাত। লুপ না নেওয়া যে কত বোকামী তা হাসিকান্নায় নাটক করে বুঝিয়ে বন্দনা মন্দিরাকে শিকার করে ফেললে।

কিন্তু মন্দিরার আর শান্তি ছিল না। না কোনো কাজে, না দেহে, না মনে।

অনেকবার দেহ দেখিয়ে এল। কেবলই বলত, 'ঘেন্না! ঘেন্না! লজ্জায় মরে যাই! ছি!...আমি খুলে ফেলব—আমার যন্ত্রণা হয়—রক্তপাত হয়—মাথা ঘোরে—ভ্রম হয়—সেদিনি ঘাটে পড়ে গেলাম—জ্ঞান ছিল না। ছেলেমেয়েরা কেঁদে-কেটে পাগল—আমাদের মা মারা গেছে!'

'খুলেই এস তাহলে। কারো কারো আবার ওসব সয় না।'

'কিন্তু রুপালীর মা নিয়েছে, রাধার মা নিয়েছে—ওদের তো কিছু হয় না! দেদার মোটা হচ্ছে। তবে একটা মজার কথা, হাসুর মায়ের নাকি লুপের ওপরেই বাচ্চা হয়েছে। সেও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয় মাঝে মাঝে।'

'তোমারও তাই নয় তো?'

'কে জানে!' হাসলেও মহা চিন্তিত দেখা যেত মন্দিরাকে। ...ত সুন্দরী মেয়ের মুখেও মেছেতা দাগ পড়তে লাগল

তারপর মন্দিরা একদিন ভোর থেকে ছটফট করতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়। মন্মথ ডাক্তার এলেন। বললেন, 'ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলাম। সেরে যাবে।'

ঘণ্টা দুই পরে আবার যন্ত্রণা।

নির্মলের এখন মনে হয়, ইউটেরাসের ভেতরটা বোধহয় মন্দিরার পচে গিয়েছিল।

মন্দিরা কাটা মুরগীর মতন আছাড়-কাছাড় করতে লাগল। ছেলেদের বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগল: 'ওরে তোদের 'ভাল করে মানুষ করবার জন্যে' আমি মরে গেলাম! আমার নাকি 'যৌবন' চলে যাবে!...আমি আত্মহত্যা করেছি!' কর্কশ দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে লাগল সে।

'মন্দিরা!'

ছেলেমেয়ের দিকে বড় বড় চোখ মেলে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘাড় কাত হয়ে গেল মন্দিরার।

কণা জেগে ওঠে: 'মা কই? আমার মা কোথা? আমি তোমার কাছে শোব না। মার কাছে শোব। মায়ের বুকে মাথা রেখে শোব। মা কেন আসে না? মা—মাগো'—চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কণা। সুজন উঠে পড়ে বসল। সেও বললে, 'মা, আমার মা কই?'

'ঘুমোও।' নির্মল তাড়া দিলে।

সুজন চিৎকার করে ওঠে: 'হ্যাঁ, খালি তুমি বলো ঘুমোও! কি করে ঘুমোবো—মা নেই!'

'তোমাদের মা আসবে।'

'কবে আসবে ? কখন আসবে ?'

'আচ্ছা সুজন, রুপালীর মাসীকে মা বলতে পার না ? সে যদি তোমার মা হয় ?'

'ছ্যা ! মা'র মতন কেউ হয় ? মা মরে গেছে বলে কি আর আসবে না ? আমরা তাহলে মরে যাব !...'

কচি বাচ্চাটা উঠে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুতেই থামে না। মন্দিরা কেমন করে থামাত কে জানে! নারীর কাজ পুরুষরা পারে না। নারী হল পুরুষের চারপাশের সোনার প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেঙে গেছে নির্মলের।

ক্ষেতে পাকা ধান পড়ে আছে, অফিসের কাজ গেল, সন্তান মানুষ হবে না। অনাহার, রাত্রি জাগরণ, দুঃস্বপ্ন। বাপ মারা গেলে মা তবু সন্তানদের মানুষ করতে পারে, বাপ পারে না। মায়ের কষ্ট বাপ সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু রুপালীর মাসী পারুলকে যদি বিয়ে করে নির্মল তবে সে কি এইসব বাচ্চাদের নিজের পেটের বাচ্চার মতন করে আর দেখবে ? তার সুখ-আহ্লাদ নেই ? তার নিজের ছেলে আসবে। আবার ছেলেমেয়ে! যার জন্যে মন্দিরা বিদায় নিলে! তার ভাষায় 'আত্মহত্যা' করলে!

ছেলেরা আবার একটু ঘুমিয়ে পড়লে মন্দিরার সঙ্গে দীর্ঘ এগার বছরের সংসার-চিত্রটা কত চেনাজানা হয়ে অথচ ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

ভাবতে ভাবতে নির্মল হঠাৎ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু।

হঠাৎ মন্দিরা সেই বিয়ের দিনের আগুন রঙের শাড়িটা পরে এসে হাজির। ডেকে বললে, 'এই ! ওখানে কেন ? 'মন্দিরা' হয়ে গেছ ? মা হয়ে গেছ ? ওঠ ওঠ—দেখ—আমি সেই বিয়ের পোশাক পরে এসেছি গো ! শানাই বাজছে কেমন সুরে, শুনতে পাচ্ছ না ?'

আশ্চর্য ! ঘুম ভেঙে যেতে সত্যিই শানাইয়ের বাজনা শুনতে পেলে নির্মল সরকার।

হাসলে সে। সকাল হয়ে গেছে কখন। পাশের বাড়ি থেকে রেডিও বাজছে। রেডিও শঙ্খনিনাদে শানাই বাজাচ্ছে।

কণা ঝেড়েমেড়ে উঠে পড়ে বললে, 'আমার মা নেই কেন ? হ্যাঁ বাপী, মা কই ? আমার মাকে কোথা গেলে পাব ?'

পীর আলীর চিচিংলা

পীর আলী মীর লোকটা খব্বিশ। এক দণ্ড চুপ করে থাকবার বান্দা নয়। শুধু মুখ চলে না, হাতও চলে তার। হয়তো একশিষ পাট এনে মোড়ের চা-দোকানের খুঁটিতে বেঁধে ঢ্যারা ঘুরিয়ে দড়ি কাটছে, নয়তো টকাটক 'কেঁড়ে-নালি' চালিয়ে খেপ্‌লা জালের পাটা বুনছে, কিংবা উরুতে রগ্‌ড়া মেরে 'টাকু' বা তক্‌লি ঘোরাচ্ছে সুতোয় পাক দিতে দিতে। তার বাড়িতে গেলেও দেখতে পাবে হয় সে মাটির দড়িবাঁধা 'গুলো' টপাটপ এদিক ওদিক করে ঝ্যাৎলা-মাদুর বুনছে, নয়তো নালাকল ঘুরিয়ে গরুর দড়ি পাকিয়ে নিয়ে 'ভাঙছে' অথবা খড়ের আটলা তৈরি করছে। গরুর গায়ের কেঁট মারছে, জুতো সেলাই করছে, নয়তো কিছু কাজ যদি না থাকে গোমস্তার মতন নাকের ডগায় ঝোলা চশমা লাগিয়ে মহাভারত পড়ছে। সুর করে কোরআন-শরীফ পড়ছে। পীর আলীর জানা নেই হেন কর্ম গ্রাম-সংসারে প্রায় বিরল। রাজমিস্ত্রির কাজ, ঘরামীর কাজ, ছুতোরের কাজ, চাষবাসের সমস্ত রকমের কাজ সে জানে। জানে শুধু নয়, যাকে বলে একেবারে দক্ষ। হাড়পাকা লোক। বুদ্ধির ঘুণ। তাকে সবাই 'মীর সাহেব' বলে। গ্রামের পাঁচটা বিচার-সালিসীতে ডাকে। তার উপরে কথা বলে হেন লোক নেই কেউ।

বছব পঞ্চাশ বয়েস পীর আলীর। বেশ ফরসা দেখতে। সুন্দর চোখা নাক-চোখ। চেঁছে দাড়ি কামানো। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা। ডান হাতের বাজুতে একটা সোনার পদো। লম্বাটে গড়ন। এখনো তত্‌তড করে পঁচিশ-তিরিশ হাত নারকোল গাছে উঠতে পারে বুক না ঠেকিয়েই নাকি আস্ত হনুমানের মতন। পীর আলী একনাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা বকতে পারে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। চমৎকার কাওয়ালী গাইতে পারে। তখনকার দিনে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। তাকে ইস্কুল থেকে নাকি 'রাস্টিকেট' করে দিয়েছিলেন মাস্টাররা। সে নাকি ভীষণ ডানপিটে আর তর্কবাগীশ ছিল। একদিন উদ্ভিদবিদ্যা পড়ানো হচ্ছিল। মাস্টার গোবিন্দবাবু শুধোলেন, 'ফল কেমন করে হয়?'

ছেলেরা বললে, 'পরাগ-সংগমের দ্বারা। প্রজাপতি বা পিপীলিকারা পায়ে করে রেণু বয়ে আনে মধু খাবার সময় এবং অন্য ফুলে যখন বসে সেই পুং রেণু স্ত্রী

রেণুর গর্ভকেশরে লাগলেই ফলের জন্ম হয়।'

পীর আলী বলেছিল, 'ব্যাপারটা কাল্পনিক। আন্দাজি-ক্যালী ফতোয়া। যেমন মশা থেকে ম্যালেরিয়া হয়। যেমন শুয়াপোকা থেকে প্রজাপতি জন্মায়। মাটি থেকে মানুষ তৈরি হয়েছিল যেমন একটা ধারণা চালু আছে—এসবও তেমনি। কক্ষনো পরাগ-সংগমের দ্বারা ফুল থেকে ফল জন্মায় না।'

গোবিন্দ মাস্টার বললেন, 'বইয়ে লিখেছে যে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা উদ্ভিদবিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। তাঁরা প্রমাণ না করে কথা বলেন না তোমার মতো।'

উত্তেজিত হয়ে পীর আলী বলেছিল, 'হ্যাং ইওর সায়েনটিস্ট! ডুমুরের ফুল হয় না, একেবারে কাঠ বা গাছ ফুঁড়ে ফল বেরোয় কি করে? অন্তর্মুখী ফুল আছে, তাতে তো প্রজাপতি বসে না? কুমড়ো, শশা, লাউগাছের মাদী ফুল ফল নিয়ে বের হয় আগে—ফলের মুখে যে ফুল থাকে তা ফোটে অনেক দেরিতে। পুরুষ ফুল বা 'অ্যাড়াফুল' হয় আলাদা। সে-সব আমরা কেটে নিয়ে রান্না করি অবশ্য কুমড়োর ফুল। কাজেই পরাগ-সংযোগ করে ফলের উৎপত্তি হয় বলে ফতোয়া দেওয়া নিছক কল্পনা। স্ত্রীফুল আলাদা জন্মায়।'

পীর আলীর বয়েস হয়ে গিয়েছিল, তখন তার নাকি গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গিয়েছিল। ক্লাসের সব ছেলেরা তার কথা শুনে সমর্থন করলে। শুধু ভদ্রলোকদের সাদা সাদা মাখন-মাখন ছেলেরা চুপ করে রইল। বই ছাড়া তারা তেমন কিছু জানে না। গোবিন্দবাবু বার বার সরষের ফুল দেখতে লাগলেন বইয়ের ছবিতে। বললেন, 'আমাকে প্রমাণ যদি না দেখাতে পার তাহলে সবাই তোমার কান মলে দেবে।'

পীর আলী বললে, 'আর প্রমাণ দেখাতে পারলে? আমরা সবাই আপনারও কান মলে দেব স্যার?'

'কি বললি ইডিয়েট!'

পীর আলী কিন্তু পরাগ-সংগমের পাতা ক'টা তার বই থেকে চড়াৎ করে ছিঁড়ে নিয়ে দলা পাকাতে লাগল তখন মুঠোর মধ্যে। তার চোখ দুটো তখন যেন মাস্টারকে শিকার পেয়ে বাঘের মতন জ্বলছে। ভীষণ বজ্জাত ছোকরা!

মাস্টার এগিয়ে এসে তার কান ধরলে সে হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'তুই যা গোবিন্দ, এক ঘুষি মারলে মরে যাবি, আমি রোজ এক সের দুধ খাই।'

ঢ্যারা ঘোরাতে ঘোরাতে পীর আলী বলে, 'এখন সে-সব ভাবলে মাইরি লজ্জা করে! মাস্টারকে অপমান করেছিলুম বলে তো আমার বিদ্যে হল না; এই ঘোড়ার ঘাস কাটছি। তারপর হল কি জানো, আমাকে ইস্কুলের বেয়ারা ভোলানাথ টিচার্স-রুমে ধরে নিয়ে গেল। হেডমাস্টার দোর বন্ধ করে দিয়ে ঘা-দশেক এমন বেতের বাড়ি কষালে যে গা-হাত ফুলে পাঁকাল মাছ হয়ে গেল। তবু শালা আমি একটু কাঁদিনি! বাড়িতে ফিরে ক'দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। বাপকে কিছু বলিনি। তাকে বললে হেডমাস্টারের গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়ে আসত বোধহয় হেলে-গরুর শূনোদড়ির চাবুক দিয়ে। আমার বাপ সুন্দরবনের মউলে ছিল, বাঁশের কাব্ড়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল তেড়ে-এসে-ঘাড়ে-পড়া বাঘের গালের মধ্যে। বাঘ মেরেছিল প্রথম যৌবনে। প্রেমে পড়ে একটা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে পালিয়ে ছিল নাকি গোসাবার দক্ষিণে। সেখানে নাকি মউলে আর বাউলীদের সঙ্গে ছ'বছর কাটায়। বাড়িতে ফিরে আমার মা-জননীকে সাদি করার পর দাদা-মশায় মানে নানাজীর সঙ্গে লাগল দ্বন্দ্ব। মাকে আনতে গেল পুলিস নিয়ে। পুলিস নানাজীর কাছে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ খেয়ে বললে, 'থাক্ না ভাই, মেয়ে যখন যেতে চায় না, তাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে?' বাবাজী বললে, 'ও, তুই শালা বুঝি ঘুষ গিলিছিস?'—'মুখ সামলে কথা বলো'— বললে পুলিসটা। তার গালে তখন দে থাপ্পড়। 'শালা ঘুষও খাবে, আবার চোখও রাঙাবে? এই কোথা আছিস র‍্যা বনালী গাজি?' নানাজী মানে শ্বশুরের নাম ধরে আমার বাপ হাঁক মেরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে ভয়ে সবাই হাওয়া! তারপর বন্ধ-দোর এক লাথি মেরে ভেঙে ফেলে বাবাজী ঢুকে দেখে মোর নথ-নাকে বুড়ী নানী বু-বু করে কাঁপতেছে মোর মাকে জড়িয়ে ধরে। মোর সেই মায়ের পেটে তখন মুই নাকি মাত্তেরে চার-পাঁচ মাসের। বাপ আমার মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে এল সাত গেরাম পার করে। সেই বাপকে কি মাস্টারমশায়দের জুলুমের কথা বলা যায়? তাহলে হালুয়া টাইট করে দিত!'

বেশ জমিয়ে গল্প বলতে পারে পীর আলী মীর। সন্ধ্যার সময় সারাদিনের পর, মাঠঘাটের চাষের কাজ সেরে চাষীবাসীরা মোড়ের মাথার চা-দোকানে আড্ডা দেয়—তার গল্প শোনে। 'মীর সাহেব, আপনি একটু চা খাও গো'—বলে পীর আলীকে কেউ চা দিলে সে খায় না। বলে, 'চা না গরাণছাল গুঁড়ো। অতে এত নিকোটিন আছে যে খেলে ভেতরের বাঁচবার পাইপ সাতদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে! তোরা বিড়ি খাস, কাপড়ের ভেতরে ধরে টেনে দেখ দিকিনি কত কষ্ পড়ে!

বরং হুঁকোটানা ভাল। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেনবাবু নাকি একবার বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে পাইপ টানছিলেন আর মহর্ষি 'এই' বলে হাঁক দিলেন। তিনি কারো নাম ধরে ডাকতেন না। চাকর ছুটে এল। তিনি বললেন, 'গাঁজা টানে কে?' তখন চারদিকে খোঁজ খোঁজ। দেখেন বড়বাবু পাইপ টানছেন। ওদের আবার মিথ্যে কথা বলা নিষেধ। তার উপরে রবীন্দ্রনাথের বাবামশায়ের সামনে তো মিথ্যে কথা উচ্চারণ করা আরো কঠিন। রবীন্দ্রনাথের কাছেই অনেক তাবড়া-তাবড়া লোকের টেংরি কেঁপে যেত। চাকর ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, বড়দাদাবোবু নিচের বাথরুমের মধ্যে পাইপ টানছেন!' মহর্ষি বললেন, 'পাইপ টানবেন কেন? দেশে কি ভাল তামাক নেই?'

পীর আলী এসব ব্যাপার জানলে কোথা থেকে? তার ছেলে ইউসুফ আলী যে এম. এ. পাস করল বাংলাতে। তার প্রায় অনেক বই সে পড়ে ফেলেছে। ছেলে যখন পড়ে সে কান পেতে শোনে। ইউসুফের নাকি গোটা 'নৈবেদ্য', 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'পুনশ্চ' মুখস্থ। ছেলেটা সে নাকি 'ছুরির ফলার' মতন দেখতে। কলকাতার কফি-হাউসে আড্ডা দেন। অনেক মেয়ে-বন্ধু আছে নাকি তার।

পীর আলী ঐরকম—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে চলে যায় কথা বলতে বলতে। তাকে মনে করিয়ে দিতে হয় কি সম্বন্ধে আগে কথা বলছিল। করাতী জাহান আলী মল্লিক বলে, 'তা হাঁ চাচা, ইস্কুল থেকে কি করে বার করে দিলে বললে না তো?'

'ও! হাঁ হাঁ! জ্বর থেকে উঠে একদিন শালা মুই করলুম কি, কতকগুলো ডালসমেত কচি কচি ডুমুর, একটা লাউগাছ, একটা কুমড়ো ডগা, আর ফলন্ত শশাগাছ কেটে ঝোলার মধ্যে করে ভরে নিয়ে গেলুম ইস্কুলে। মাস্টারদের দেখালুম, দেখ ব্যাটারা, পরাগ-সংগমের আগে অর্থাৎ ফুল ফুটবার আগেই ফল জন্মায় কিনা! সবাই দেখলে, তাই তো! কুমড়ো কচি মতো হয়ে গেছে আগেই যখনো তার মাথার ফুলটা ফোটে নাই। বিশটা শশার ফল ধরেছে মুখের ফুল না-ফোটা অবস্থায়। লাউও তাই। কচি কচি ডুমুরও দেখ। তাহলে? পুরুষ ফুল দেখ আলাদা।…গোবিন্দবাবু স্বীকার করলেন বইয়ের তথ্য ভুল বটে। তখন আমি বললুম, তাহলে অধমের শর্ত মতো এবার আপনার কানে পাক দেব আমরা সবাই। আমাকে সেদিন মারপিট করিয়ে জ্বর ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দোর বন্ধ করে আমি গোবিন্দবাবুর কান মলে দিয়েছিলুম আর ছেলেরা হৈ-হৈ করতে

লাগল। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে আবার ধরে নিয়ে গেল। ছেলেরা বললে, পীর আলীকে আবার মারলে আমরাও মাস্টারদের মারব। হেড্ডুর টাকে বেল ফাটাব। অগত্যা ইস্কুল থেকে একখানা বহিষ্কার-পত্র আমার হাতে গুঁজে দেওয়া হল। আমি যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলুম। শালা, চাষীর বেটা হয়ে বাবুদের লেখা বইপত্রের ভুল ধরতে গেনু—বাবুপাড়া থেকে বার করে দিলে! আর ভদ্দরলোক হতে পারব না। ভাগ্যি ভাল যে আমার সন্তান-সন্ততি চোদ্দ-পুরুষ সবাইকে লেখাপড়া শেখবার অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত করেননি! তাহলে মোর ছেলেটা আর এম.এ. পাস করতে পারত না। তা ইস্কুলের লেখাপড়া হল না বলে কি বাইরের বইপত্র পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে? ঐ পাঁজি পড়ি, রামায়ণ-মহাভারত পড়ি, পুঁথি পড়ি, নাটক-নভেল পড়ি, খোকার বই পড়ি, খবরের কাগজ পড়ি। মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা আনে খোকাটা—সে-সব পড়ি। বিদ্যেও আমার কিছু হয়েছে বইকি।'

'চাচা তুমি ঘুমোও কখন?'

'আমার কি আর চোখে ঘুম আছে বাবা? পঁচিশ বিঘে ধান-জমি আর চোদ্দ বিঘে ডাঙা-জমি আছে, পান-বরোজ আছে, পটল, আলু, কলা, বাঁশ, পাট, কলাই হয়—গরু আছে চারটে—এসব দেখতে হয়—ভাবনা আছে—ছেলেটার আবার বিয়ে দিতে হবে। মেয়ে পাচ্ছি না। একটা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে একটা জেলা ঘুরলেও বুঝি পাবে না মুসলমান বাড়িতে।

একটা মুসলমান গাড়োয়ান লোক শুধোয়, 'চাচার 'ঘাস' আছে, বিক্কিরি করবে গা?'

'ঘাস নয়, খড় বল বেটা। আমার ছেলেটা সেদিন বলে, বাবাজী, 'খড়ের বন' হয় কি? লে বাবা! 'খড়ের বন' আবার কি? সেই পরাগ-সংগমের দ্বারা ফলের জন্ম হয়—এও কি তেমনি 'উদ্ভট্টি' ব্যাপার নাকি? বললাম, না হয় না। বাবুরা বলতে পারে—চাষীরা বলবে না। খড় হল শুকনো ধানগাছ—যা থেকে ধান ঝেড়ে নেওয়া হয়েছে—যা দিয়ে ঘর ছায়, যা কুঁচিয়ে গরুকে খাওয়ানো হয়। খড়কে বিচালীও বলা হয়। খোকা বললে, কলকাতার কফি হাউস থেকে শুনে এসেছি, রাঢ়ের দেশের মানুষরা নাকি 'খড়ের বন' বলে। 'খড়কাটা' বলে এক ধরনের লোকও নাকি আছে। বললাম, ওসব ভদ্দরলোকেদের বানানো। চাষীরা অতো বোকা নয়। তারা কাশ, উলু, ধানগাছ, গমগাছ, ভুট্টাগাছ, দেধান, বাজরা, আখ, খড়ি, শরখড়ি, খাগড়া, নলখাগড়া, হোগলা, লাড়ঘাস, ব্যানা, গড়গড়া,

ঝড়া চুরুট, পাতি, চেঁচ্‌কো, শ্যামা, ফুল্‌কো, সোঁ-করাতে, মুতো, ছড়া জালকেটে, দূর্বা—এসব আলাদা আলাদা ঘাস চেনে। আর 'খড়কাটা' হবে কেমন করে? ধরো, এক মাস পাট কাটা হয় ঐ শ্রাবণ ভাদ্দরে, এক মাস ধান কাটা হয় অঘ্রাণ-পৌষে, এক মাস উলু-কাশ কাটা হয় কাতিক মাসে—এই এক মাসের সাময়িক কাজের জন্যে কেউ যদি কাশ বা উলু কাটে তাকে কাশকাটারা বা 'খড়কাটা' বলা ঠিক নয়। আরো দশ-এগারো মাস সে খড় কাটবে কোথায়? খড় বা ঘাস কি সব সময় কাটার যোগ্য হয়? ঘাস পাকলে তবে তো কাটবে। হোগলা কাটা হয় শীতে—সেই পৌষ-মাঘ মাসে যখন জলা-জাঙালের পানি শুকিয়ে আসে। উলু, কাশ কাতিকে কেটে আঁটি বেঁধে 'জালি' দিয়ে রাখা হয় মাঠে। পরে বয়ে এনে ঘর ছাওয়া হয়। কাশের এখন খুব দাম। মানুষের চাইতেও লম্বায় বড় হয়। সরু সরু পাতায় সূক্ষ্ম করাতের মতন ভীষণ ধার। এখন পান-বরোজ ছাইবার জন্যে কাশের দর উঠেছে মেলা—কুড়ি টাকা শ। কাশের ফুলের লম্বা লম্বা তুলোর মতন শীষ হয়। কাশবন ফুলে ফুলে সাদা হয়ে যায়। উলুঘাস হয় এককোমর উঁচু। তারও ফুল হয় ছোট ছোট সাদা শীষঅলা। 'উলুখড' যারা বলে তারা ভুল বলে। উলুখাগডার বন হতে পারে, কেননা খাগডা বা খড়ি যার কলম হয়—পূজার সময় কাজে লাগে—একসঙ্গেও হয়। বেশিদিন উলু কাটা না হলে কাশবনও জন্মাতে পারে। কাশের অঙ্কুর পায়ে বিঁধলে রক্তপাত হতে পারে। কাশের গোড়ায় শক্ত খড়ি থাকে সরু সরু। উলুর তা থাকে না। উলুঘাস শুধু পাতা—তলাটা সূক্ষ্ম সরু সরু। দাঁতের গোডায় ঢুকিয়ে 'খেলোল' করা হয়। উলুর অনেক কাজ। কুঁচিয়ে মাটির দেওয়ালে ছোপ ধরাতে লাগে। ঘর ছাইতে লাগে। বরোজে পান গাছ বাঁধবার জন্যে দরকার হয়। পাতিঘাস থেকে ঝ্যাৎলা বোনা হয়। মেদিনীপুরে মাছুরের একরকম সরু সরু চুরুট-ঘাস হয়। ঘাস অনেক রকমের আছে। কিন্তু খড় এক রকম। তা হল ধানগাছ—যা জমি থেকে কেটে এনে ধান ঝেড়ে নিয়ে 'টাল' বা 'গাদা' দিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজেই 'খড়ের বন' বলা ভুল। যখন ধান থাকে—পেকে শুকিয়ে মাঠে পড়ে থাকলেও তাকে 'ধানবন' বা 'ধানবাড়ি' বলে। উলুকাশের দিগন্তবিস্তার মাঠ বা বনকে যদি কোনো অঞ্চলে 'খড়ের বন' বলে লোকে, তবে তা কথার দিক থেকে ভুল। কাশবন, উলুবন, ধানবন, খাগড়াবন, শরবন—সব আলাদা। সব মিলিয়ে 'খড়ের বন' বললে আরো কেলেঙ্কারি। খোকা বললে, ঐ নিয়ে আমার সঙ্গে একজন তরুণ সাহিত্যিকের তর্ক। তিনি নিজে পক্ষে সাফাই গাইবার জন্যে বললেন, রাঢ় অঞ্চলের লোক 'খড়ের বন' বলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি তাঁর 'পথের পাঁচালী' আর 'আরণ্যকে' 'সবুজ খড়ের বন' লিখেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বিভূতিবাবু তাই কি লিখতে পারেন? গ্রামজীবনের তথ্যে কেবল বিভূতিবাবুর প্রায় ভুল নেই বললেই চলে। খোকা নাকি পাবলিশারের কাছে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। তাঁদের জিজ্ঞেস করতে তাঁবা বলেছেন, 'শরবন, খাগড়াবন এসব হতে পারে, বিভূতিবাবু 'খড়ের বন' লিখেছেন কে বললে?'—আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক, তাঁকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। "খড়ের বন', কই কক্ষণো তো শুনিনি মশায়! কোথাও গজিয়েছে নাকি?'—তাহলে বোঝ ব্যাপারটা! অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যায় মেশানো গোয়ালাদের খাঁটি জল-মেশানো দুধের মতন অনেক ভেজাল মাল এদেশের সব ব্যাপারেই চলে। যাকগে বাবা, খোকাকে বলেছি, ঝগড়া করো না বাবা, আমার মতন 'রাস্টিকেট' হবে ভদ্দরলোক-সমাজ থেকে এটা কি করে হয়, ওটা কি করে হয় জিজ্ঞেস করলে। 'সোনার পাথর-বাটি' কি আর হয় না? 'ঘোড়ার ডিম' কি চাঁদেও পাওয়া যায় না? 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'—এযুগেও শিক্ষিত বাঙালীরাও দু-চারজন লেখেন বইকি! বাঙালী বর্ণ-সংকর জাতি। তাই ভেজালের নেশা তার জন্মগত। আমি শালা তাই নমুনাস্বরূপ এক কাণ্ড করেছি—আমাদের উঠোনে করলা গাছের সঙ্গে চিচিঙ্গে গাছের জোড় লাগিয়ে দিয়েছি। নিচের চিচিঙ্গে গাছের মূলটা কেটে দিয়েছি, আর উপরের করলা গাছের অংশটা ছেঁটে ফেলেছি। তার ফলাফল হল, করলারূপী ইয়া বড় বড় চিচিঙ্গে হচ্ছে। খোকা তার নাম বার করেছে 'চিচিংলা'। মাইরি, ভারি মজাদার খেতে!'

মাস্টার অরবিন্দ প্রামাণিক যেন লোভে পড়ে গেল। রোম্যান্টিক উপন্যাস পড়ে সে ভীষণ। বললে, 'ঠাকুরদা, একখানা তোমার 'চিচিংলা' খাইও তো, কেমন মজা দেখব!'

পীর আলী মীর বললে, 'জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজে লাগবে আমার 'চিচিংলা'। যিনি খাবেন তাঁর আর সন্তানদি হবে না।'

'তাহলে তোমার ছেলে খেয়েছে তো?'

'আরে ধ্যুৎ, তাই কি খাওয়াতে পারি! ওর বিয়ে দেব বলে মেয়ে খুঁজছি

ভীমরতি

মহা রসের বুড়ো মহাদেব সাউ।

বুড়ো বয়েসে আবার টোপর মাথায় দিয়ে বিশ বছরের নয়চা যুবতী মেয়েকে বউ করে এনেছে। বউটাকে দেখতে নাকি একেবারে পরীর মতন।

পাড়ার বঙ্কিম সাধুখাঁ মহাদেবের এক গেলাসের ইয়ার। চাল্লিশ বচ্ছর 'ন্যাশা' করেছে একসঙ্গে। দুজনে ধানবাড়ির জলে পড়ে মাতাল হয়ে সারারাত পাক খেয়েছে। মারামারি করেছে। মামলা করেছে। আবার ভাব হয়ে গেছে। দুজনে বিবির বাজারের একই বিবির কাছে গেছে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা মহাদেব সাউ গোপন করলে কেন তাকে? মহাদেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতেই সাধুখাঁ বললে, 'কি হে সুমুন্দি, খুব যে টেরি বাগিয়ে, কোচা দুলিয়ে, পাঞ্জাবি পরে, পান চিবিয়ে ঠোঁট রাঙা করে চা দোকানের মোড়ে সন্ধ্যের আড্ডা জমাতে চলেছ? বলি মাল-টাল আজ টানা হবে?'

মহাদেব হেসে গালটা অনেকখানি টেনে রইল। তারপর বললে, 'টাকা নেই।'

'কেন, নতুন বউ কি টাকার ভাড়ারটা দখল করে ফেলেছে?'

'মাইরি! আমাকে সুদ্দু।'

'হুঁ-হুঁ-হুঁ! চরিত্তিরর! গায়ে সেন্টের গন্ধ! আবার পায়ে আলতা?'

'দুপুরে ঘুমুচ্ছিলুম, পায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, শালীটা বড্ড দুষ্টু! আর কালি দিয়ে আমার রাবণের মতন গোঁফ করে দিয়েছিল। বাইরে বেরুতে বড়গিন্নী জ্বলে উঠল: 'মরণ! গলায় দড়ি জোটে না! রাবণ সাজিয়েছে বুড়ো বলে? তবু কত আদিখ্যেতা!'—আয়না দিয়ে দেখি—তাই তো! মিথ্যে রাগ দেখিয়ে হাঁকলুম, বেদানা! এ কি করেছ? আমি কি তোমার ঠাকুদ্দা যে মস্করা করেছ? বেদানা হেসে খুন। বড়গিন্নী চোখ রাঙা করলে তাকে পাঁজা করে ধরে কোলে তুলে নাচাতে থাকে। সেও হেসে ফেলে। ভারি মজার মেয়ে।'

দুজনে কার্তিক মাসের শেষে ধান-পাকা মাঠের মাঝ দিয়ে হাঁটতে থাকে।

সাধুখাঁ গম্ভীরভাবে বললে, 'ভাল কাজ করলি না। ঐ জোয়ান মেয়ের 'যৈবনে'র ভোগ দিবি কি করে এখন তুই? তোর এখন ছাপ্পান্ন বচ্ছর বয়েস। চুল পেকেছে। ভুঁড়ি গজিয়েছে। হাঁটুতে গেঁটে বাত। দুদিন বাদে কোমর

আঁকড়ে ধরবে। সোমত্ত মেয়ে ঘরে, বড় ছেলে লেদ মেশিনের বড় মিস্ত্রি—ছ'শো টাকা মাইনে—তাদের বিয়ে দিবি কোথায় না নিজে বিয়ে করে ভর-যুবতী বউ ঘরে আনলি? ঐ মেয়েটার সঙ্গেই তো তোর ছেলের বিয়ে দিতে পারতিস?'

'তাই তো দিতে চেয়েছিলুম হে! কনে দেখতে গেলুম শালা বাদল মাইতির সঙ্গে। বাদল কনেটার দাদামশায়। কনে আমাকে দেখে হাসতে লাগল। বাদল বললে, 'ও শালী ঐ রকম সদাই হাসে। ওকে কনে সাজানো হয়েছে, তাই মজা পেয়ে হাসছে। ওকে তুই-ই না হয় বিয়ে কর। দশ বিঘে জমি লিখে দিবি খালি ওর নামে। বুড়ী দেঁত্‌ড়ি বউ নিয়ে সারা জীবনটা তোর সুন্দরী মেয়ের পীরিতের ক্ষিদেয় কাল কেটেছে। ছেলের বউ হবে, আরো অনেক মেয়ে আছে। তাছাড়া বেদানা লেখাপড়া জানে না—তোর ছেলে ওকে নাকচ করে দেবে।' শালা মাথা এমন 'ঘুইরে' দিলে, আর মনে হয় পানের মধ্যে বশীকরণের ওষুধ দিয়ে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল। দলিল লিখিয়ে টিপসই করিয়ে একেবারে বিয়ে দিয়ে কনে সমেত ঘরে তুলে দিয়ে গেল। বড বউ আমাকে মারবে বলে গাছ-কোমর বেঁধে তেড়ে এলো, 'তবে রে ওনামুখো মিনসে, তোমার বিয়ের নিকুচি করেছে, বুড়ো বযেসে ভীমরতি ধরেছে'···তেড়ে এসে আমার গলা টিপে ধরলে, আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে শেষবেলা শালা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল! মেয়ে কাঁদতে লাগল, মাথায় জল চাপড়াতে লাগলুম। ওর হার্টের ব্যামো। ছেলেটা ব্যাগ হাতে নিয়ে 'যাচ্ছি বাবা' বলে কলকাতায় চলে গেল। দু-সপ্তা আর বাড়িতে এলো না। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। বেদানার সঙ্গে সব্বাইয়ের ভাব। সংসার আনন্দে মাত করে রেখেছে। আমার ছেলের সঙ্গে ক্যারাম খেলে—লুডো খেলে। তাকে খাওয়ায়—মাথা আঁচড়ে দেয়।'

'হুঁ। তোর চাইতে তোর ছেলের যত্নই বেশি করবে রে শালা! চল মাল খেতে যাই আজ।'

'বেদানার মানা। তাছাড়া টাকা নেই।'

'তোর টাকা নেই কোনো সুমুন্দিও বিশ্বাস করবে না। পঁচিশ বিঘে জমি। ধান খড় পাট আখ বাঁশ উলু পান কলাই—কত জিনিস বিক্রি করিস। ঘি দুধ খাস। ফরসা 'শরীল' টসটস করছে। খালি এখন চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কদিন আর বাঁচবি ভাই সাউ মশায়, আজ মাল না খাওয়ালে—এই···'

'এই—মাইরি—না না—তোর পায়ে ধরি'···লাফ দিয়ে একেবারে পথের নিচে নেমে যায় মহাদেব সাউ। সন্ত্রস্তভাবে হাত দুখানা কাঁপাতে থাকে। কাতুকুতুকে

তার ভীষণ ভয়। সাধুখাঁ সবে তার পাঁজরে একটু কড়ে দিয়েছে—তো দে এক লাফ !

সাধুখাঁ খুব মজা পায়। আঙুল বাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে বলে, 'এই দিলুম, এই দিলুম কুরকুরুনি মানে কাতুকুতু !' হিন্দুস্থানীরা বলে, 'গুদ্‌গুদিয়া'।

'এই শালা ! না মাইরি !'

'এই—'

'এই ভাই না, মরে যাব, মাইরি তোর পায়ে ধরি, তোকে জোড়হাত করি।' —ধানবনের কাদায় জুতো সমেত নেমে যায় মহাদেব। একবার কচুবনের মধ্যে ফেলেছিল সাধুখাঁ ওকে। একেবারে লাফ দিয়ে পড়েছিল জলে। ভাঙা কাঁচে পা কেটে গেল। ঝুঝিয়ে রক্ত বার হতে লাগল উঠে আসতে। সাতটা দিব্যি গালতে তবে জল থেকে ওঠে। পা বেঁধে দিতে চাইলেও মহাদেব নারাজ। ভয় আবার যদি কাতুকুতু দেয়।

মহাদেব কাতরভাবে বলে, 'মা কালীর দিব্যি ! অমন করিসনি। গালাগালি করব।'

ছেলেরা ছুটে এলো মজা দেখতে। হৈ হৈ কাণ্ড !

সাধুখাঁ আরো নেমে গেল। তখন চিৎকার—গালাগালি—মুখখিস্তি।

সাধুখাঁ বলে, 'ওরে শালা, তোর নতুন বৌয়ের সঙ্গে এত পীরিত—তার কথা গুরুবাক্যি ? আমি দু'কুড়ি বছরের ইয়ার—এখন মদ খাওয়াবে না ? এবার নেমে শালাকে ধানবনের মধ্যে ফেলে বুকে চেপে খুব করে কুরকুরুনি দোব তোর বগলে আর পাঁজরে। তোর দম বার করে দোব'—বলে সত্যিই বঙ্কিম সাধুখাঁ ধানবনের কাদায় নেমে যেতে মহাদেব বললে, 'ওরে শালা, ওরে আমার বোনাই, চল তোকে মাল খাইয়ে আনচি।'

'আয় তবে !' হাত ধরে টেনে তুলে আনলে তাকে সাধুখাঁ। হাত-পা ধুয়ে বাসে উঠে চলে গেল মদ-দোকানে। দুজনে সাদা পানি টেনে রঙিন হয়ে এসে টলতে টলতে রিক্সা থেকে নামল রাত ন'টার সময়। নেমেই টলে পড়ে গেল মহাদেব। তাকে তুলতে গিয়ে তার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বঙ্কিম। মোড়ের লোকজন তাদের রগড় দেখতে লাগল। কেউ কেউ ছি-ছি করতে লাগল। ফারুকুল হোসেন, অঞ্চলপ্রধান, কাছে এলে বললে, 'মহাদেববাবু, মান-ইজ্জত ডোবাবেন ?'

'মান-ইজ্জত ! কেন বাবা ? জীবনটাকে উপভোগ করা কি অন্যায় ? আমি তো শালা সাধু না ? গেরস্থ !'

বঙ্কিম বলে, 'হ্যাঁ গেরস্থ! একদম সাধু না!'

'নেশা আপনাদের খুব ভাল করে জমেনি। মাতলামি করছেন ইচ্ছে করে।' ফারুকুল চলে গেল।

টলতে টলতে নাচতে নাচতে হাতে তালি মেরে জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে চলে আসবার সময় তুজনেই আবার পড়ে গেল। সাধুখাঁ কোনোক্রমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে উঠে মহাদেবকে টানাটানি করতে গেলে সে হুড়হুড় করে বমি করতে থাকে।

বঙ্কিম বলে, 'মর শালা! আমি চললুম! নেশার বারোটা বাজিয়ে দিলে—বমি হল তো সব 'ফুইরে' গেল!'

শীত পড়ে গেছে। গাঁয়ের উদোম হাওয়া-ভরা মাঠে শুধু অন্ধকার আর আকাশে তারার দেওয়ালী। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা দূরের মুদিখানার চাতালে এসে শুয়ে পড়ে থাকে বঙ্কিম সাধুখাঁ। আর বকতে থাকে।

মহাদেব তখন পথের পাশে পড়ে আছে। কুকুরে তার মুখ চাটছে। খবর শুনে মহাদেবের ছেলে পরাশর আর ছোট বউ বেদানা এলো অন্ধকারে টর্চ হাতে নিয়ে।

কুকুরটা মুখ চাটতে থাকলে তার গলা জড়িয়ে ধরতে যায় মহাদেব বুড়ো। আর বলে, 'বেদানা—আমার বে-দা-না—! তোমার দানা নেই। বীজ নেই। অপ্সরা!...'

কুকুরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় পরাশর।

বেদানা বসে পড়ে আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখ মোছাতে থাকে। বলে, 'তুমি-না মদ খাবে না বলেছিলে হাঁগো? মদ তুমি খেয়েছ, না, মদ তোমাকে খেয়েছে? চলো, ওঠো, বাড়ি যাবে।'

'কে বটে!' টলতে টলতে সাধুখাঁ এগিয়ে এলো। এসে টর্চের আলোয় ওদের তুজনকে চিনতে পেরে বললে, 'পরাশর, তা বাবা এটি কে? তোমার বউ, না তোমার বাবার বউ?'

পরাশর ফেটে পড়ল, 'তার মানে? দ্বিতীয়বার একথা বললে বঙ্কিম-কাকা তোমার জীবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তুমি বাবাকে মদ খেতে নিয়ে গেছিলে?'

'হাঁ, সহজে কি যায়? কুরকুরুনি দিতে তবে!'

'আর কোনোদিন এ কাজ করবে না।'

'না বাবা, না। কানমলা খাচ্ছি।'

মহাদেবের বমি হয়ে যাবার পর একটু জ্ঞান ফিরে এসেছিল, সে ওদের চিনতে

পারলে। সাধুখাঁর কথাটা তার মনে সন্দেহ ধরিয়ে দিল। বললে, 'পতিত উদ্ধার করতে এসেছ বাবা, না পাঁকে ডুবতে এসেছ ?'

পরাশরের মাথাটা যেন ঘুরে গেল। কর্কশ স্বরে বললে, 'নেহাৎ তুমি আমার বাপ—না হলে···এ ব্যাপার আর মনে আনবে না। সীমা ছাড়িয়ো না বাবা। তোমার বন্ধু কত বড় মানুষ এখন আমি ধিক্কার করে মাকে তোমার কাছে ফেলে রেখে গেলেই বুঝতে পারতে। চলো, বাড়ি চলো এখন।'

চলতে চলতে টলতে টলতে মহাদেব কেবলই বলতে লাগল, 'পরাশর, তুই আমার বাপ, তোর কথা মতন চলব। আর এমন কাজ করব না।'

বেদানা আর পরাশর দুদিকের নডা ধরে মহাদেব সাউকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বাডিতে।

বড়গিন্নী বললে, 'ছেরন! মিনসের মুখে নুড়ো জ্বেলে দে।'

মহাদেব বিকৃত স্বরে বুক ফুলিয়ে পা ফাঁক করে দাডিয়ে বললে, 'মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাকবে, বেশি ফ্যারফ্যার করবে না।'

মহাদেব গিয়ে শুয়ে পডলে পরাশরকে তার মা বললে, 'হ্যাঁরে খোকা, তুই অন্ধকারে তোর বাপকে আনতে গেলি, বাসন্তীকে সঙ্গে নিয়ে গেলি না কেন? বেদানাকে নিয়ে গেলি···'

'মা!' চিৎকার করে উঠল পরাশর। বললে, 'মা, হাতের কালি মুখে মেখো না। যে আগুন তোমরা জ্বালছ নিজেরাই পুড়ে মরবে।'

বেদানা হঠাৎ হি হি হি করে হেসে উঠল। সে হাসল না কাঁদল তা যেন বোঝা গেল না। পরাশর দ্রুত ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিলে।

বেদানা, বাসন্তী, তার মা তরলা ডাকাডাকি করতেও সে আর দোর খুললে না। সকালে সুটকেশ হাতে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

বেদানা চোখ মুছতে লাগল।

মহাদেব হুঁকো টানে আর ভাবে ছেলেটা বোধহয় আর ফিরবে না। ক্ষেতে জন লাগবে, লোকজন ডাকা দরকার, বেরুতে পারে না। কোমর আঁকড়ে ধরেছে, সোজা হয়ে চলতে পারে না। পানের বরোজ পড়ে গেছে।

তরলা বলে, 'লাঠি ধরো না। বাই কতো বুড়োর। এখন ক্ষেতের ধান ইঁদুরে-বাঁদরে চোরে-ছ্যাঁচোড়ে খাবে।'

তারপর মহাদেব সাউ হঠাৎ একদিন মারা গেল। বেদানার ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়েই। কেন তা কে জানে, সকালবেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়েছিল—ঐ পর্যন্ত—বেদানা নাকি কিছু জানে না।

অনেক বেলা পর্যন্ত নাকি বিছানায় পড়েছিল মহাদেব সাউ লেপ মুড়ি দিয়ে। বাসন্তী ডাকতে এসে হঠাৎ চমকে ওঠে। বাবা মারা গেছে। গালের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শুকিয়ে আছে। বড় বড় ডিমের মতন চোখ বেরিয়ে আছে। জিবের খানিকটা বেরিয়ে আছে গালের পাশ দিয়ে।

বেদানার গলা টিপে ধরেছিল তার বড় সতীন, 'খান্‌কী, ছেনাল, তুই গলা টিপে মেরে ফেলেছিস!'

বেদানা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, 'আমি কিচ্ছু জানি না।'

খবর পেয়ে পরাশর বাড়িতে এলো।

বাবাকে দাহ করে এলো নদীর চরে গিয়ে। ফিরে এসে দেখলে তার নিজের মা, আর বোন বাসন্তী খুব কাঁদছে মাথা কুটে কুটে। কিন্তু আশ্চর্য, বেদানা একটুও কাঁদছে না, চুল এলো করে ভৈরবী মূর্তিতে বসে আছে দাওয়ায়, খুঁটি হেলান দিয়ে। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন ক্রূর একটা জিঘাংসা!

পরাশর অনুমান করলে তার সৎমা বেদানাই তার বাবাকে গলা টিপে বোধহয় মেরে ফেলেছে।

তবু সে বেদানার হাত ধরে টেনে তুললে। বললে, 'মা, স্নান করে এসো। খাও-দাও কিছু।'

পরদিন বেদানা তার ঘরে ডাকলে পরাশরকে। গম্ভীর মেজাজে বললে, 'পরাশর!'

'বলো মা।'

'আমার নামে যে দশ বিঘে জায়গা তোমাদের বাপ লিখে দিয়ে গিয়েছিল সেটা তোমাদের নামে ফেরত দিতে চাই।'

'কেন মা?'

'এখানে আমার শান্তি নেই। এখানে থেকে আমি কি করব? তোমাদের জমি তোমাদের ফেরত দিয়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যেতে চাই।'

'মা!'

'হ্যাঁ। আমি আবার বিয়ে করতে চাই।'

পরাশর স্তম্ভিত।

বেদানার দৃষ্টি যেন বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তা যেন জগতের সব কিছু ন্যায়-নীতির ধোপদুরস্ত মসৃণতাকে দীর্ণবিদীর্ণ করতে চায়।

বেদানা কর্কশ স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'এখানে থাকব! কেন, আমার কি সুখ হবে তাতে? তোমার বুড়ো বাপ তোমার বউ দেখতে যেয়ে নিজে বিয়ে করে আনলে আমাকে। কেন তুমি বিয়ে করতে পারলে না? করবে—সাহস আছে, আমাকে বিয়ে করবে?'

'মা, এ কি পাগলের মতন বকছ!'

'পাগলের মত বঁকছি!…শোনো, কাল সকালে আমাকে নিয়ে তুমি 'রেজেস্টারী' আপিসে যাবে। আমি জমি ফেরত দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব। যাও এখন।'

পরাশরকে সঙ্গে নিয়ে সত্যিই সকালে সেজেগুজে বেরিয়ে গেল বেদানা। পাড়ার মেয়েরা সে দৃশ্য দেখে মুখ টিপে টিপে হাসলে। কিন্তু তারা দুপুরের পর ফিরে এলে পরাশরের মুখ থেকে তার ছোট মার সমস্ত জমি ফেরত দেবার কথা শুনে সবাই অবাক হল। পরাশরের মা বেদানাকে যত্ন করতে শুরু করলে। বেদানা একটা রাতও আর তার মৃত স্বামীর অভিশপ্ত ঘরে থাকতে চায় না। বিকেলে বাপের বাড়িতে চলে গেল একাই।

পরাশরের মা বললে, 'না রে, বেদানা মেয়েটা ছিল ভাল। চলে গেল। কাঁচা বয়েস। ওর বাপ হয়তো ওর আবার বিয়ে দেবে—আজকাল তো সেসব হচ্ছেও।'

চাকরি গেল পরাশরের। জমি-জিরাত দেখতে হবে। হঠাৎ যেন সে দেখতে পেলে সেও একটা মহাদেব সাউ অর্থাৎ বাবা হয়ে যাচ্ছে। তাকে বিয়ে করতে হবে। বাসন্তীর বিয়ে দিতে হবে। সংসারে সে জড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু হঠাৎ দুদিন পরেই বেদানা এসে হাজির। নিজের ঘরে ঢুকে সে বসে পড়ল ধপ করে। হাতের কাপড়ের পুঁটলীটা দূর করে ফেলে দিলে একদিকে।

পরাশর সামনে আসতেই বললে, 'বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। জমি ফেরত দেওয়া নাকি মহা অন্যায় হয়েছে।'

'বেশ তো মা, জমি তুমি ফেরত নাও। আর এখানেই থাকো। বিধবা মানুষ, শান্ত সংযত হয়ে থাকো। সমস্ত আগুন মন থেকে নিভিয়ে ফেলো।'

পরাশরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বেদানা। তার চোখ

ফেটে যেন জল গড়াতে লাগল। সে হঠাৎ হি হি হি করে যেন পাগলের মতন হেসে উঠল: 'বিধবা মানুষ! উপদেশ দিচ্ছে!'

তারপর বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে ডুকরে ডুকরে সে কাঁদতে লাগল: বিধবা মানুষ! শান্ত-সংযত হয়ে থাকো! সব আগুন নিভিয়ে ফেলো!···

জন্মের খবর এবং

'খানিকটা রসুন থেঁতো করে গালে গুঁজে দাও না গা জোর করে—'ওকাই' পাক—বমি হোক—কোঁৎ পাড়ুক—বাচ্চা হয়ে যাবেখন।'

'বঁটি, ভাত-লাকড়ি, ন্যাতাকানি পুকুর ঘাটে ডুবিয়ে রেখে এস।'

'ওলাবিবির দারগায় লতুন মালসা 'ওপোড়' করে দিয়ে এস।'

'মাগো, মরে গেলুম, গলায় পা তুলে দাও!'

'হাঁটু গেড়ে বস-না লো, ঝোড়া ধরে ব্যথা খা। আল্লাকে ডাক।'

পাড়ার গিন্নীদের নানাজনের নানান উপদেশ, নানা প্রণালীতে ওঠানো বসানো সত্বেও সহজে সন্তানটা মাটিতে পড়ে না জাহানারা খাতুনের। হেঁতালে ব্যথায় সে পাগলের মতন চিৎকার করে, মাথা কোটে, মাটি আঁচড়ায়, বুক চাপড়ায়।

পাড়ার বুড়ী গিন্নী গরিবুল্লার মা দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া দেয়: 'অ্যা! মাগী যেন 'সকৃশো'! ছেলে হওয়া জানাচ্ছে! মদ্দরা শুনতে পাচ্ছে—গলা ছোট কর—না হলে গলা টিপে ধরব।'

একটি মেয়ে বলে: 'মোর শাউড়ি ইট দিয়ে মুখে ঠুকে ঠুকে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল ব্যথা খাইনি বলে। প্যাটে 'হেঁটো' দিয়ে চেপে চেপে ছেলে বার করে দিয়ে ছ্যালো!'

জাহানারার শাশুড়ী কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁষে না। তার সঙ্গে বউ ঝগড়া করেছিল। এখন আল্লা শোধ নিচ্ছে।

জাহানারার হঠাৎ দাঁতি লেগে গেলে পাঁচ-সাতজন মেয়ে একটা খুপরির মধ্যে লম্ফের স্বল্প আলোয় ভূতের মতন হাউমাউ জুড়ে দেয়।

একজন বলে, 'প্যাট ভেরেছে কেউ মন্তর পড়ে! না হলে শালার এগারো মাস হয়ে গেল, ছেলে হয় না!'

জাহানারার শ্বশুর হুঁকো টানা ভুলে গিয়ে আল্লাকে ডাকতে লাগল। স্বামী রহমান আলী প্রায় কাঁদো কাঁদো।

'হাসপাতালে লিয়ে যা রে রহমান, তোর বউ মরে যাবে—এখেনে বাচ্চা হবে নে। না হয় ডাক্তার ডেকে আন।'

শ্বশুর-বুড়ো অন্ধকারেই ছুটে গেল পাড়ার হাজী মোক্তারউদ্দিনের কাছে। তিনি এসে একটি জামবাটি চাইলেন। তাতে মক্কা নগরের 'আবে-জমজম' কূপ-থেকে-আনা পানি ঢাললেন বোতল থেকে। তারপর সেখানকার একটি পাহাড়ী মরুকুসুম—যা একেবারে শুকনো শিকড়ের মত মুষ্টিবদ্ধ দেখতে—নিয়ে সেই পবিত্র পানিতে ছেড়ে দিলেন। হাজী সাহেব বললেন, 'সবাই দোওয়া-দরুদ পড়ুন, আল্লাকে ডাকুন। হাসপাতাল কিচ্ছু করতে পারবে না, আল্লার এই মহিমা যদি বিফল হয়। দেখো না, আল্লার কি মহিমা, শুকনো মরা ফুল, কি রকম ভুঁইচাঁপার মতন লাল হয়ে ফুটে ওঠে পবিত্র আবে-জমজম কূপের পানিতে।—একটু পানি দিচ্ছি, বউ-মার মাথায় দিয়ে দাও। দেখো, যেন এই পানি কারো পায়ে না পড়ে —তাহলে বাড়িতে আগুন ধরে যাবে। ফুলটা পুরোপুরি ফুটে উঠলেই বাচ্চা হয়ে যাবে।'

দেখা গেল, জামবাটির জলের মধ্যে উষার ধোঁয়াটে দিগন্তে যেমন করে রক্তাভ সূর্য আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয় তেমনি ভাবে মরুভূমির ফুলটা ফুটে উঠতে লাগল। জল পেলেই এ ফুল ফুটে যায়।

কিন্তু সবাই অবাক। আল্লার কি অপার মহিমা!

হাজী মোক্তারউদ্দিন আজব লোক বটে! আচ্ছা উপকারী জিনিস এনেছেন আরব দেশ থেকে!

হাজী সাহেব চোখ বন্ধ করে মধুর সুরেলা গলায় পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাকেন।

জাহানারার প্রসব হয়ে যায়। তবে 'ফুল' পড়ে না। বড় জখম হয়ে গেছে সে। দরদর করে ঘাম ঝরছে সারাটা মুখ থেকে। বলছে, 'মা গো, ছাতি ফেটে গেল—আমাকে পানি দাও—খাবো।'

একটি বউ বললে, 'হাসপাতালের ডাক্তাররা যে বলে হরদম জল খাবে?'

গরিবুল্লার মা দজ্জাল জাঁহাবাজ মেয়ে, ঝাঁ ঝাঁ করে চিল্লে ওঠে: 'অ্যাঁ! পানি খাবে! ফুলে তাহলে কেলাগাছ হবে। এত খুন ভাঙল, খালাস হলি, কাঁচা 'লাড়ী'—রস হবে নে? পানি খেলে ফুলে ঢোল হবি।'

হাজী সাহেব তাঁর পবিত্র মরুকুসুম আর আবে-জমজমের পানি ঢেলে নিয়ে চলে গেলেন। পাঁচটা টাকা নজরানা দিতে গেলে তিনি জিব কাটলেন। বললেন, 'মহা পাপের ভাগী করবে জাহান আলী। আল্লার জিনিস নিয়ে ব্যবসা করব? যদ্দিন আল্লা-তায়ালা 'হায়াত' (আয়ু) রেখেছেন, তোমাদের খেদমত করে যাব। তবে ছেলের 'আকিকা'র দিনে আমাকে না হয় খাইয়ে দিও। পাঁচজন মৌলবীকে খাইয়ো। তোমার নাতি খুব 'এলেমদার' হবে।'

হাজী সাহেবের মতন আর লোক হয় না—সবাই মন্তব্য করলে।

কিন্তু 'ফুল' আর পড়ে না জাহানারা খাতুনের। বাচ্চাটা বড় জখম হয়ে গেছে। গালে মধু দেবার পর কাঁদতে শুরু করেছে।

গরিবুল্লার মা শেষে ফতোয়া দিলে: 'শাউড়ির পা-ধোয়ানো পানি খাওয়াও—'ফুল' পড়ে যাবেখন।'

অগত্যা!

মুখটুক বিকৃত করে শাশুড়ীর হাজা-ধরা পচা দুর্গন্ধ পা-ধোয়ানি জল গলাধঃকরণ করলে জাহানারা খাতুন।

মিনিট পনেরো পরে 'ফুল' পড়ে গেল।

আল্লাদির মা বললে, 'সব সময় তোদের ধানাই-পানাই। সময় হলেই হবে, হাসপাতালে যাও, ডাক্তার ডাকো, হাজী সাহেবকে আনো, শাউড়ির ময়লা পা ধুইয়ে খাওয়াও—যত সব মাগীরা ঝাঁপাই ঝোড়ে! টাইম হলে সব আপনি হয়—দুনিয়ার নিয়ম। কারু একটু দেরিতে হয়, কারু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।'

সারারাত মশার কামড়ে পড়ে রইল জাহানারা। দূষিত নাড়ী নিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে রইল পাড়াব বুড়ী লহরী বিবি।

ভোরবেলা রহমান আলী মাইল তিনেক দূরের ধাই-মাগীকে ডাকতে গেল নাড়ী কাটবার জন্যে। নগেন মান্নার স্ত্রী সংবাদ পেয়ে ধিড়ফিড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে একটা গামছা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

তখনো ভাল করে রোদ ওঠেনি। ধাই-মাগী নগেন নাপিতের বউ যমুনা দাসী ময়লা কাপড়টা গামছা পরে ছেড়ে রেখে বললে, 'কাঁচা বাঁশের চ্যারাটি তুলে আনো।'

রহমান কাটারী নিয়ে বাঁশঝাড়ে গেল। চ্যারাটি তুলে আনলে। চ্যারাটিটা ধোওয়া হল না। তাই দিয়ে বাচ্চাটার নাড়ীচ্ছেদ করা হল।

যমুনা দাসীর হাতে বড় বড় নখ, কালো ময়লা ভরা, হাতের শাঁখা-চুড়ি-

লোহাতে শামুক-কাটার নোংরা পুরোনো ময়লা—যে পুরোনো কাপড়ের পাড়ের সুতো দিয়ে নাড়ী বাঁধা হল তাও অপরিষ্কার।

বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। যমুনা দাসী নোংরা ঘর সাফ করে চান করে এসে তার ময়লা কাপড়টা পরে এক কেজি চাল, দুটো আলু, একটা সুপুরি, একগণ্ডা পান আর তিনটে টাকা নিয়ে কম হয়েছে বলে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

বাচ্চাটাকে এরপর পেঁচোয় পেলে!

সে নীল লাল হতে লাগল!

জাহান আলী হুঁকো টানতে টানতে তার বউকে বলতে শুনলে, 'পেঁচোয় পেয়েছে! রহমান আঁধার না-কাটতেই বাঁশবন থেকে চ্যারাটি তুলে আনবার সময় ওর সঙ্গে ভূত এনেছে। গুয়ে-পেত্নি এনেছে।'

'তুই শালী সবজান্তা! চুপ করে ঠ্যাং ভেঙে যেমন বসে আছিস বসে থাক —তোকে আর 'ফতোয়া' দিতে হবে নে।' স্ত্রীর ওপরে কড়া কথা বলে দেয় জাহান আলী। বলে, 'তোর ঠ্যাংও কি ভূতে ভেঙে দিয়ে গেছে?'

'গরুতে গুঁতিয়ে ফেলে দিলে মোকে—শোয়া খেজুর গাছটায় উঠে গেনু তবু শিং দিয়ে পায়ের গোছ চিরে দিলে—মুই পড়ে গেনু, ঠ্যাং ভেঙে গেল—ভূতে ভেঙে দেবে কেন? 'আরমানে'র (আদরের) মদ্দমানুষ, তুমি কি গরুটাকে জবাই করেছ? তাই নিয়ে হাল-লাঙল বাইচ—একদিন তোমারও ইয়েতে শিং ঢোকাবে—এই বলে রাখনু মুই—যদি এক বাপের জন্ম হই, আমার কথার 'মযোদা' রাখবে আল্লা!'

'ওঃ! আমার আল্লা-ভাতারী!' কল্কেটাকে পট করে সশব্দে উপুড় করে রাখলে জাহান আলী। কালো দীর্ঘ চেহারায় তার পাকা সাদা সাদা লোমের রাশি। মুখের সাদা দাড়িতে মেহেদি পাতার কষ লাগিয়ে লাল করা।

সদ্য-জাত সন্তানটি যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

তার তড়কা খ্যাঁচ আরম্ভ হয়েছে।

তাকে নাকি ভূতে ধরেছে। যেমন ধরে গরিব অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের আর পাঁচটা বাড়িতে। নিম্নশ্রেণীর তপশীলীদের ঘরে নাকি এ উপদেবতা একেবারে পোষা!

পেঁচোয়-পাওয়া রোগীকে নাকি সারানো যায় না!

ছেলে-পোয়াতির চারদিকে খেপলা জাল ঘিরে দেওয়া হয়, তাতে একটু লোহা

বেঁধে দেওয়া হয়—জাঁতি হাতে ধরে থাকে পোয়াতি। কত রকম তুক্ করা হয়। কোমরের ঘুন্‌সিতে বেঁধে দেওয়া হয় গরুর নালীর কাঁঠি, ছাগল-দড়ি, মাদী ছাগলের দাড়ির চুল, মাদুলী-কবচ। দোরগোড়ায় সরা-পড়া লটকে দেওয়া হয় —দোওয়া-তাবিজ বাঁধা হয় গলায়। নিশান পুঁতে বাস্তু বন্ধ করা হয়।

তবু পেঁচোয় পাওয়া যায় না।

শেষে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আসে। সে রোগী দেখে বলে, "টিটেনাস' হয়েছে। বাঁশের চ্যারাটিতে ময়লা বা বিষ ছিল। কিংবা ধাইয়ের নখ, চুড়ি বা হাত থেকে বিষাক্ত জিনিস লাগতে পারে নাড়ী কাটার সময়। পাঁচ টাকা দিতে হবে—ওষুধ দিতে পারি। রোগ ভাল হতে পারে।'

রহমান বলে, 'হোমোপ্যাথি দিয়ে আর কি হবে! তবে বাবাজী য্যাখন ডেকে এনেছে দিয়ে যাও।'

পেঁচোয় পেলে হোমিওপ্যাথির সাধ্য কি তা সারায়! তবু ডাক্তারেরও টাকার দরকার তো। তবে টাকা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারে সনাতন ডাক্তার ততই মঙ্গল।

ওঝা, বদ্যি, কবিরাজ, মৌলভী সবাই নিজের নিজের বিদ্যেবুদ্ধি কায়দা সহকারে জাহির করার পর টাকা নিয়ে চলে যায় কিন্তু পেঁচোমশায় লোল জিহ্বা বার করে কচি বাচ্চাটার রক্ত চুষতে থাকে প্রতি লহমায়।

বাচ্চার রঙ বদল হয়। মা চেয়ে চেয়ে দেখে। এত যন্ত্রণার, এত কষ্টের নাড়ী-ছেঁড়া ধন কত কষ্ট পেয়ে তার চোখের সামনে কেমন করে মরে যাচ্ছে! মা কাঁদতে থাকে। এই একটা ছেলে তো নয়। পরপর চারটে গেল।

ছেলেটা মারা গেল বোধহয়। আর কাঁদে না। নড়ে না চড়ে না। জাহানারা কাঁচা নাড়ীতে কাঁদতে লাগল।

দুদিন পরেই তার জ্বর উঠল। প্রচণ্ড জ্বর। খবর পেয়ে জাহানারার ভাই এল। সে লেখাপড়া-জানা ছেলে। স্কুলের মাস্টার। সবটা শোনার পর একজন এম-বি-বি-এস ডাক্তারকে ডেকে আনল।

ডাক্তার ছোকরা মানুষ। নাম আরিফ হোসেন। তিনি বললেন, 'সিরিয়াস কেস। প্রসবটা হাসপাতালে দিয়ে করানোই ভাল। পাঙ্ক করা হয়নি ফুল পড়ার পর। ভেতরে পচা রক্ত আটকে আছে। ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এ রোগে অনেক প্রসূতি মারা যায়। ছেলেটা মরল কি করে?'

'পেঁচোয় পেয়েছিল।' বললে রহমান আলী।

ডাক্তার বললেন, 'ইডিয়েট ! পেঁচোয় পায় না—তোমরাই পেঁচো—অশিক্ষিত ভূত। বাঁশের চ্যারাটিতে টিটেনাসের বিষ থাকে। তাছাড়া ধাই কি গরম জলে বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছিল ? তার হাতেও তো বিষ থাকতে পারে ? নখে বিষ থাকে। ময়লা কাপড় বা সুতো ব্যবহার করলেও এ রোগ হতে পারে। টিটেনাস হয়ে অশিক্ষিত মুসলমান-বাড়িতে বেশি বাচ্চা মরে। লোকে বলে পেঁচোয় পায়। পরের বারে হাসপাতালে দিও—পেঁচোমশায় সেখানে ঘেঁষতে পারবে না। আর হাসপাতালে পাঠাতে না পারলে নতুন ব্লেড এনে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিজেরা হাত ধুয়ে নাড়ী কেটে দিও—জাত যাবে না।'

ডাক্তার ভিজিট আর ইঞ্জেকশনের টাকা নিয়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন নাকি তাঁকে আসতে হবে।

স্কুল কামাই করে জাহানারাব ভাই কয়েকদিন অবস্থাপন্ন মূর্খ চাষী ভগ্নীপতির বাড়িতে রয়ে গেল। ডাক্তার এসে এসে জাহানারাকে দেখে গেলেন। রোগীর শরীর থেকে অনেক দূষিত জিনিস বেরিয়ে গেল। রোগ সেরে যেতে তাকে নিয়ে গেল বাপের বাড়িতে।

মাস দুই পরে রহমান তাকে আনতে গেলে শ্যালক বললে, 'সন্তান মারা যাবার পর আবার তাড়াতাড়ি সন্তান আসে, বুঝলে ? আগামী বারে প্রসবের সময় আমাদের বাড়ি পাঠাবে। আমরা হাসপাতালে দিয়ে ব্যবস্থা করব।'

রহমান দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে শুধোলে, 'মেয়ে-ডাক্তার দিয়ে খালাস করাবে তো ?'

'হাঁ হাঁ। তোমার স্ত্রীর ইজ্জত দেখার জন্যে হাসপাতালের ডাক্তারদের চোখে ঘুম নেই এমন মতলব যখন মাথায় ঢুকে আছে তখন একবারও ভাব না কেন বাড়িতে প্রসব হবার সময় পাড়ার লোকজন, ওঝা-বদ্যিরা কি করে ? তোমরা একেবারে কুসংস্কারে ডুবে আছ। অন্ধকারের জীব।'

জাহানারা স্বামীর ঘরে এল। এল, আর আশ্চর্য, মাস কয়েক পরেই তার আবার বমি হতে শুরু করল।

সাত মাসের পর সাধ খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে তার মা নিজের কাছে আটকে রাখলে। সময় হতেই জাহানারাকে হাসপাতালে দিয়ে এল তার ভাই। সুন্দর ফুটফুটে একটা পুত্র-সন্তানসহ হাসিমুখভরা জাহানারাকে নিয়ে এল কদিন পরেই।

রহমান এবার বুঝলে পেঁচোয় পাওয়া কি জিনিস ! সে খুশী হয়ে ছেলে-বৌকে বাড়িতে আনলে বুড়ো জাহান আলী বললে, 'পেঁচোর নিকুচি করেছে শালা !

যতসব আমাদেরই ভুল। নোংরামীর নামই পেঁচো।—দাদু আমার খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে! তোমাকে অনেক লেখা-পড়া শেখাবো। মুসলমান সমাজে লেখাপড়া-জানা লোক নেই বলে তাকে এত ভূত পেত্নী জীন 'ওবা' ধরে।'

জাহানারা হেসে খুশী হয়ে শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে 'কদমবুসী' করলে।

শাশুড়ী শুধু প্যাটপ্যাট করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল—সত্যিই তো! বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে তার নাতিটা! হাসপাতালে অত ছেলে হয় সেখানে পেঁচো যায় না আর গ্রামের অন্ধকার বাড়িতেই যত জ্বালায়—পোড়ায়!

হাড়

চমৎকার কাওয়ালী গাইতে পারে ইসরাফিল আলম। ভিড জমে যায় সে যখন গালের পাশে হাত রেখে সুর ধরে:

পরওয়ারে আলম
সরওয়ারে কায়েনাত কো
কাহে ভেজা দুনিয়ামে
আবাদ কে লিয়ে আবাদী মোহম্মদ···

গ্রামের মোড়ের চা-দোকানে ভিড জমে যায়। দোকানদার খোদা বক্স ঢোলক পেড়ে নিয়ে বাজাতে বসে। গাঁজাড়ে তিনজন নিশাচর—সেলিম, বাহার, কদম—মসগুল হয়ে কডা কিন্তু সুডৌল তালি বাজাতে থাকে।

বাড়ির ভেতর থেকে খোদা বক্সর ভর-জোয়ানী বোন ছুটে এসে দোর-গোড়ার পাতলা হেসিয়ান চটের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইসরাফিলের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সেলিম তাকে দেখতে পেয়ে গোপনে চিমটি কাটে ইসরাফিলের পাছায়। সে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হাসিমুখে সাহেলীর দিকে তাকায়। খোদা বক্স মাথা গুঁজে বাজিয়ে চলে। সাহেলী হাসে। চোখ দুটো তার জাদু জানে।

গান-বাজনা শেষ হলে গঞ্জিকা সেবন চলে। ভিড় সরে যায়। সবাই বাহবা দিয়ে তারিফ করে যায় ইসরাফিলের। তাকে দেখতেও বেশ চমৎকার। ফরসা ভরাট দৃঢ় চেহারা। টিকোলো নাক। চোখে সুর্মা টানা। গলায় একটা সরু

সোনার হার। গায়ে টেরিলিনের বুস সার্ট। পরনে সিঙ্গাপুরী চেক লুঙ্গি। মাথার চুলগুলো ঢেউ-খেলানো। বয়স তার বছর পঁয়ত্রিশ হবে। সারাদিন তার কোনো কাজ নেই। আড়বাঁশি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সূর্য যখন অস্তাচলে ঢলে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত রাঙা করে, সে নদীর চরের তালগাছ তিনটের তলায় একটি গাছে হেলান দিয়ে বসে বেহাগ সুরে বাঁশি বাজায়।

কোত্থেকে কেমন করে তার সংসার চলে কেউ জানে না। ঠিক সন্ধ্যার মুখে খোদা বক্‌সর বোন পিতলের ডাবর কাঁখে নিয়ে নদীর ঘাটে স্নান করতে যায়। নদীর নোনা জলে কি করে সাহেলী, যে-জল সে কলসী ভরে আনে বাড়িতে ?

একদিন সেলিম দেখেছে, ইসরাফিল আর সাহেলী মুখ-আঁধারী সন্ধ্যায় নদীর চরে তালগাছের নিচে ছায়ামূর্তির মত দুজনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। সে কাশতেই সাহেলী ডাবর কাঁখে তুলে নিয়ে চলে এল। মুখ ঝামটা মেরে যেন শাসিয়ে গেল সেলিমকে।

খোদা বক্‌স কোনো কিছুর দরকারে দোকান থেকে বাড়িতে চলে যেতেই সেলিম বললে, 'কাল রাতে মাইবি যা কামিয়েছি, তোকে আর কি বলব ইসরাফিল।'

ইসরাফিল কৌতূহল দেখিয়ে শুধোলে, 'কি রকম, বলে ফেল ?'

'ময়নাগাছির আসাদ দাওয়ানের ঘরে তিনজন সিঁদ কাটতে গেলাম। মাঠ পার হয়ে মাঝরাতে চলেছি। হু-হু বাতাস। কাক-জ্যোছনা রাত। এসে ঘরের পিছনে ঘুম-পাড়ানী মন্তর আওড়ালুম। সিঁদকাঠি দিয়ে গোল করে দাগ কেটে ঝুরঝুর করে মাটি ঝরিয়ে ফেলে ঘরের 'পোস্ত' (বনিয়াদ) খুলে ফেলনু। বড় হাঁ-করা একটা গর্ত হয়ে গেল। পা গলিয়ে ভেতরটা আস্তে আস্তে নেড়েচেড়ে দেখলুম। যায় তো শালা পা যাক। হাত বা মাথা গলাচ্ছি না আমরা। ভেতরে ঢুকে দেখি আসাদ তক্তাপোশে মশারীর মধ্যে ঘুমোচ্ছে। মেঝেয় তার বউ—তার পাশে একটা ছেলে। মাইরি বউটা ভারী সুন্দরী। আস্তে আস্তে তাব বুকের হার খুলে নিলুম। কানের মাকড়ি। এক সেলের টর্চ মেরে কাজ হচ্ছে। বাক্স তোরঙ্গ সব বার করে আনলু। সাতশো টাকা মাত্তর পেলুম। তোরঙ্গ-গুলো ছাড়িয়ে মাঠে ফেলে দিয়ে এনু।'

ইসরাফিল বললে, 'দশটা টাকা দে। নইলে জানিয়ে দোব।'

'শালা !' সেলিম ভ্রূকুটি হানলে।—'খোদা বক্‌সকে তাহলে বলে দোব তার বুনের সঙ্গে তুই আছিস।'

সেলিমের সঙ্গী দুজন হাসতে লাগল।

সেলিম বললে, 'তুই শালা তো ইতরেরও অধম কাজ করিস। জগতের কোনো মানুষই তা পারবে না?'

'আমি কি জগতের বাইরে?' শুধোলো ইসরাফিল।

'হ্যাঁ। তুই শালা নরকের হাওলদার!'

খোদা বক্স আসতেই ওরা যে-যার চলে গেল।

ইসবাফিল পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগল : ওবা জানলে কি করে? খোদা বক্স তাহলে বলেছে। ওব বোন সাহেলীটাকে নিয়ে পালালে মন্দ হয় না। ওরও মবণটা ঘটলে হয একবাব।...

হঠাৎ সাহেলী ডাকলে বাঁশ-করোমচা গাছের আকাশ আচ্ছাদন করা পথের বাঁকটাব পাশ থেকে।

'এই!'

'কে বে, ও তুই? কি বল।'

কাছে এল সাহেলী : 'চললে কোথা?'

'মরতে।'

'বালাই!'

'আজ আসবে?'

'কোথা?'

'নদীব চরে?'

'ভয় লাগে। আচ্ছা একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'তুমি নাকি খুব খারাপ কাজ কর?'

'হা।'

'ছি। ওয়াক। থু! আব কোনোদিন তোমাকে ছোঁব না!'

'কে তোকে বললে?'

'দাদা।'

'সে আমার শালা। আর তুমি আমার পীরিতের হুর-পরী!'

সাহেলী খুশী হয়ে হাসলে। চট করে তাকে ধরে চুমু খেয়ে গালটা টিপে দিয়ে চলে এল ইসরাফিল এম-বি বি-এস ডাক্তার ইনসান গাজির ডাক্তারখানায়।

ডাক্তার বললেন, 'আয় ইসরাফিল। তোর নাম ইসরাফিল না দিয়ে আজরাইল রাখলেই ভাল হতো রে!'

'কেন ডাক্তার-দা ?'

'আজরাইল মানে যম। তুই তো যমেরও বাবার কাজ করিস। ভয় বলে তোর প্রাণে কোনো কিছু নেই। তা এ-সপ্তার মাল কই ?'

'কাল নাগাদ হয়ে যাবে। আল্লাকে ডাকছি। হে আল্লা মিলিয়ে দাও। তুমি দয়াময়—কোনো মুসলমানের মরণ দাও। কাল না পেলে পরশু একটা লোককে মাল খাওয়াবেই এ বান্দা !'

ডাক্তার হাসলেন : 'কাকে ?'

'শালা সাহেলীর দাদাকে।—খোদা বক্স।'

'না, প্রেমিকার কোনো ক্ষতি করতে নেই। সে বিশ্বাস হারালেও না। ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে।'

দুজনে হা-হা করে হাসে।

'দশটা টাকা দিন ডাক্তার। বউ বলেছে মাছ নেই—আর একটা আনারস এনো।'

'তাহলে পোয়াতি ?'

'কি জানি !'

'মাছ অনেক দাম। দু নম্বর মাংস কিনে নিয়ে যা।'

'না, বউ মাংস ছোঁয় না। নাম বললেই বমি করবে।'

'কেন ?' ডাক্তার আশ্চর্য হলেন।

'ঐ যে মাংস ছাড়াই। কসাই আমি। হা-হা-হা ! শালা, আমাকে ছুঁতেও নাকি ঘেন্না করে। বউ মাইরি দাদা ভারী অখুশী। মোটে আমল দেয় না। শেষে মার দিতে হয়। রাত্রে আমি ঘুমোলে বাইরে এসে বসে বসে কাঁদে।'

ডাক্তার চুপ করে কি যেন ভাবেন। বলেন, 'তোর বউয়ের আবার হিস্টিরিয়া না ধরে। যাকে বাংলায় বলে 'ভূত-ধরা'।'

'রাত্রে তো ও একা থাকতে পারে না। ভীষণ ভয় করে নাকি। বলে, খনখনা কথা বলে যেন মানুষের কঙ্কাল সারা উঠোনে ঠকঠক করে চলতে চলতে ! আমি রাত্তিরে চলে গেলেই পাশের বাড়িতে পালায় আমার চাচীর কাছে।'

টাকা নিয়ে চলে আসে ইসরাফিল। আবগারী দোকান থেকে দু-পাট চোলাই নেয়। চিংড়িমাছ আর আনারস কেনে। তারপর বাড়িতে এসে দেখে তার স্ত্রী রিজিয়া মিনি-কাঁথা সেলাই করছে পা ছড়িয়ে বসে।

রিজিয়াকে জড়িয়ে ধরলে সে বলে, 'ছাড়ো।'

'কেন গো? কি মোটা হয়েছ তুমি মাইরি! লও, আনারস খাও।'

'কলে-কারখানায় কি কোনো কাজ নেই? না থাকে নৌকোয় দাঁড় বাইতেও তো যেতে পার। কিংবা পালকি বইতে গেলেও আমার দুঃখ থাকত না।'

'কিসের শালার দুঃখ! মেয়েমানুষের দুঃখের আবার কোনো দাম আছে? টাকা রোজগার করে পুরুষ। সে শ্যেনপাখি—কোথেকে কিভাবে কার কি ছোঁ মেরে আনল সে-বিচারে তোমার কাজ কি?'

রিজিয়া আর কিছু বলে না।

ইসরাফিল সন্ধ্যার পর টর্চ আর একটা ঝোলা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গোটা দুই গ্রাম পার হয়ে আসে। মাঠের কোলে হঠাৎ ফোঁ করে ডালা তুলে এক-কোমর ঝেড়ে ওঠে একটা খরিশ কেউটে। টর্চের আলো মারে তার মুখে। সাপটা খানিকটা দোল খাবার পর ফণা নামিয়ে চনচন করে পালিয়ে যায়।

রাত নিষুতি হলে ইসরাফিল একটা কবরস্থানে আসে। সে ঠিক খবর পেয়েছে মায়াপুর গাঁয়ে গতকাল রাত্রে গোলাম মণ্ডলের বউ মারা গেছে। টর্চ মেরে নতুন কবরটা দেখলে। গোলামদের বাড়িতে কে যেন তখনো ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। শিয়াল ডাকছে একটু দূরে। শালারা মড়ার মাংস খাবার মতলবে এসেছিল বোধহয়—মানুষের সাড়া পেয়ে সরে গেছে।

একটু অপেক্ষা করলে ইসরাফিল।

রাত বারোটার পর সে কবরটার মাটি সরাতে শুরু করলে। মেঘে ঢেকে গেছে আকাশটা। কোকাফ অন্ধকার। বাঁশ বনটার মধ্যে পাগলা ভূতুড়ে হাওয়া আড়মোড়া খেয়ে চলে গেল। জোনাকীরা আলোর মালা গাঁথছে। রাজ্যের উইচিংড়ি ডাকছে ক্রু-ক্রু শব্দে। চন্দ্রবোড়া সাপ ডাকছে ভাঙা পুরোনো কবরের মধ্যে কোথায়!

জামা-কাপড় খুলে ফেললে ইসরাফিল। কালো একটা আণ্ডারঅয়ার পরে কালো রঙের গেঞ্জি গায়ে গলালে। কবরের সমস্ত মাটি সরিয়ে ফেলে এড়ো বাঁশ, তালপাতা, পাড়ন-বাঁশ তুলে সরিয়ে ফেলে নিচে টর্চ মারলে। কাফনে মোড়া দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। নেমে গেল সে নিচে। টর্চ জ্বেলে শুইয়ে রেখে কাফন খুলে ফেললে। একটি যুবতী নারীদেহ! কোনো অসুখের লক্ষণ নেই তো! আশ্চর্য! তবে কি গোলাম মেরে ফেলেছে? ঘরের আড়কাঠায় টাঙিয়ে দিয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বলে! চোখ দুটো কী ভয়ঙ্কর! দাঁত বার

করে আছে। পেট ফুলে দমসম। হঠাৎ দীর্ঘ লয়ে কান্নার মতন শব্দ। ভয় করল তার। গা যেন ঝাঁকুরে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সারা কবরস্থানটার দিকে একবার তাকালে। না, কোথাও কেউ নেই। বাঁশের গায়ে বাঁশ-দুলে-পড়া-ঘর্ষণে করুণ কান্নার স্বর উঠছে।

লাশটাকে টেনে ওপরে তুললে ইসরাফিল। কাফনের কাপড়গুলোও নিলে। লাশটাকে পাঁজাকোলা করে বয়ে আনলে একটা গাছের তলায়। শক্ত ডাং হয়ে গেছে। গাছটার নিচে চারদিক থেকে ডালপালার আড়াল।

লাশটা টাঙিয়ে দিলে শক্ত বকুল গাছের নিচু ডালে বেঁধে। একবার ভাবলে, গাছটার গায়ে দাঁড় করিয়ে দিলেও হতো। তারপর সে টর্চ মেরে সব দেখে নিয়ে ধারালো ছুরি চালাতে লাগল। স্তন দুটো কেটে নিলে। এই মাংসর কত দাম ছিল বেঁচে থাকতে! হাসলে ইসরাফিল, বললে, 'শালী, তুমি নাকি বড্ড স্বৈরিণী ছিলে? কি পাছা ছিল! সব ঝরাচ্ছি আমি।'

মাংস ঝরিয়ে ফেলে দিতে লাগল সে। ঘাম ঝরে পড়তে লাগল তার। ঘণ্টাকয়েক পরিশ্রম করার পর কাজ শেষ হল। একটা কাফনের কাপড়ে মাংসগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে কবরের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর বাঁশের পাড়ন বিছিয়ে তালপাতা দিয়ে এড়ো বাঁশ পেতে মাটি তুলে দিলে। ঠিক যেমনটা ছিল আগে। ব্যাস, কাজ প্রায় শেষ।

কঙ্কালটাকে নামিয়ে হাত-পা মুড়ে ছোট করে বাকি কাফনে জড়িয়ে বস্তার মধ্যে ঢোকালে সে। ছুরিছোরা ব্যাগের মধ্যে পুরে বস্তার মধ্যে রেখে একটা ডোবা থেকে চান করে গেঞ্জি-প্যান্ট ছেড়ে কাপড়-জামা পরে বস্তার মুখ বেঁধে মাথায় তুলে নিয়ে মাঠ ভেঙে চলে এল সোজা নিজের বাড়িতে।

ভোর হয়ে এসেছে তখন। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পুব আকাশে। বউকে ডাকতে সে চাচীর কাছ থেকে চলে এল। নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ঝনঝন শব্দে দোরের তালা খুলে দিলে গজগজ করতে করতে: 'মরণ! ওয়াক থু! ভূত এনেছে মাথায় করে! গলাটা টিপেও দেয় না!'

'চোপ শালী! আমি মরলে তুই কি বাবু দেখে ভাতার ধরবি?'

'ওই যা গলার রব আছে! কাজ আর খুঁজে পায় না!'

বাড়ির মধ্যে একটা চালাঘরের মেঝের পাটাতন খুলে তার নিচে লাশটা আরক মাখিয়ে রেখে দিয়ে সাবান নিয়ে আবার চান করে এসে শুয়ে পড়ল ইসরাফিল। আর একটু পরেই সে নাক ডাকাতে লাগল। ভীষণ উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে

তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ক্লান্ত। কিন্তু রিজিয়া আলো জ্বেলে বসে থাকে চুপ করে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওকে এত সুন্দর দেখতে, বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না ভেতরে ভেতরে ও এতবড় পাষণ্ড! কি সুন্দর বাঁশি বজায়, কাওয়ালী গায়! রিজিয়া একদিন প্রেমে পড়েছিল ওর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

ঘুম আসে না রিজিয়ার চোখে। কোথা থেকে মড়ার কঙ্কাল এনে বাড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছে! শুনলে কার চোখেই বা ঘুম আসে! হঠাৎ সে দেখে একটা কঙ্কাল যেন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে ঠক ঠক করে উঠোনের অন্ধকারে! হঠাৎ ক্যা—করে কিসের শব্দ! তারপর কে যেন বলেঃ 'আঁমাকে এঁখানে আঁনলি কেঁন? তোঁর বঁউকেও মেঁরে ফেঁলব!…'

'ও মা গো!' হঠাৎ ইসরাফিলের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিজিয়া। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। ইসরাফিলের ঘুম ভেঙে যায়।

'কি হয়েছে? আরে, ভয় কি? ওসব বাজে ভয়! মানুষ মরে গেলেই সে নির্জীব হয়ে যায়। তার কোনো ক্ষমতা থাকলে তাকে কি কেউ কবরে ঢোকাতে পারে? তাকে শিয়ালে খেতে পারে?'

কিন্তু রিজিয়ার 'দাঁতি' লেগে যায়। অজ্ঞান হয়ে যায় সে।

ইসরাফিল জল চাপড়ায় তার মাথায়। বিরক্ত হয়ে বলে, 'ভাল শালা এক ঝঞ্ঝাট! দুর্বল মেয়েমানুষকে নিয়ে সংসারে মেলা ফ্যাচাং শাঁলা!'

জ্ঞান হতে স্বামীর কোলে মুখ রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকে রিজিয়া। পরে আস্তে আস্তে বলে, 'এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও। দোহাই তোমার! নইলে আমি একদিন মরে যাব!' তারপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

'আচ্ছা, ছেড়ে দোব রিজিয়া।'

বিশ্বাস করে না রিজিয়া। মাথা নাড়ে। বলে, 'না, তুমি টাকার লোভে ছাড়তে পারবে না। হয়তো আমি মরে গেলেও…'

মুখটা মুখ দিয়ে চেপে ধরে ইসরাফিল। সকালের আলো ফুটে ওঠে। কোকিল ডাকে কুহুকুহু স্বরে।

দিনের আলো দেখলে ভয় পালায় রিজিয়ার। রাত যেন তাকে গিলতে আসে শুধু।

এক দুপুর পড়ে ঘুমোবার পর উঠে ওষুধপত্তর দিয়ে কঙ্কালটা পরিষ্কার করে ফেলে ইসরাফিল। তারপর তা তুলো-ভরা বাক্সর মধ্যে ভরে নিয়ে চাবি এঁটে রেখে দেয়।

বিকেলে যায় ডাক্তারের কাছে।

সন্ধ্যায় ডাক্তার নিজের মোটর নিয়ে আসেন ইসরাফিলের দোরগোড়ায়। সপ্তায় একদিন তাঁকে এমনি গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে পাড়ার লোকজন। ডাক্তারের সঙ্গে ইসরাফিলের হৃদ্যতার কথা জানে সবাই।

বাক্সটা ঝট করে এক ফাঁকে তুলে গাড়িতে উঠে আসে ইসরাফিল। ডাক্তার সাঁ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। খোদা বক্স দোকানে বসে বসে হাসে।

শহরের কোনো এক হাসপাতালের ফরাস সরদারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে নাকি ডাক্তারের। তিনশো টাকা দিয়ে কঙ্কালটা বেচে দেন ডাক্তার। নিজে নেন দেড়শো, ইসরাফিলের দেড়শো।

বাড়িতে ফিরে পরদিন চা-দোকানের মোড়ে ইসরাফিল শুনলে অবাক কাণ্ড! যে মেয়েটার কঙ্কাল সে বেচে এসেছে, তার বাপ নাকি পুলিস তুলে এনেছিল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। তার মেয়েকে নাকি মেরে ফেলে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিস অবশ্য সাক্ষ্য পেয়েছিল মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে বলে। সাক্ষী নাকি সবই তৈরি করা। টাকা খেয়ে ছোট দারোগা কবর দেবার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন খোল কবর? মর্গে ময়না তদন্তে যাবে এখন লাশটা। কিন্তু কবর খুঁড়ে দেখা গেল লাশ নেই। পুলিস তো তাজ্জব! সবায়ের গাল হাঁ! এমন কাণ্ড কি কোথাও হয়েছে! কে আর কবর খুঁড়ে দেখে!

লাশটা গেল কোথায়? শিয়ালে খেলেও কঙ্কালটাই বা যাবে কোথায়? এক-মানুষ নিচে থেকে লাশ টেনে তোলে শিয়ালের সাধ্য কি?

ইসরাফিল আশ্চর্য হয়। বলে, 'তাহলে হয়তো আস্‌মানের 'ফেরেশতারা' (স্বর্গীয় দূতরা) এসে তুলে নিয়ে গেছে! জিব্রাইল, মেকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল যে কেউ একজন হবে!'

তাই বটে!

কি আর করবে। পুলিসের রিপোর্ট গেল উপরে। কবরে লাশ নেই। তার মানে, খুব সম্ভবত, বড় দারোগার ধারণা, কঙ্কাল চুরি হচ্ছে!

কে বা কারা করছে পুলিস এবার খোঁজ রাখবে।

দিনকতক ইসরাফিল কবর থেকে কঙ্কাল তোলা বন্ধ রাখলে। তাছাড়া মানুষ এবার কবর চৌকি দেয়। কোনোক্রমে ধরতে পারলে খুঁটিয়ে মেরে ফেলবে। জেল হবে।

কিন্তু সংসার চলে কি করে ইসরাফিলের? বাঁশি বাজালে, কাওয়ালী গাইলে,

সাহেলীর সঙ্গে প্রেম করলে তো আর পেট ভরবে না? তাছাড়া রিজিয়ার অসুখ। সত্যিই তাকে ভূতে-পাওয়া রোগে ধরল। মাঝে মাঝে প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার আসেন। ওষুধ দেন। একদিন হঠাৎ ডাক্তারকে আঁচড়ে-কামড়ে ধরে চেঁচিয়ে পাগলের মতন বলতে লাগল রিজিয়া: 'তুই শয়তান, তুই পাজীর পা-ঝাড়া, খানকীর বাচ্চা! ওকে তুই মড়া তোলার কু-মতলব দিয়েছিলি। বেরো আমার বাড়ি থেকে। পশু! ঝাঁটা মারব মুখে।'

ডাক্তার চুপ করে চলে গেলেন। আর ইসরাফিলের বাড়িতে আসা যায় না। রোগীর মুখ থেকে সব ব্যক্ত হলে তাঁকেও পুলিস জড়াতে পারে।

সেলিমরা যেদিন তাদের সঙ্গে চুরি করতে যাবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালে সেইদিন রাত্রেই তারা ধরা পড়ল। বেদম মার খেয়ে জেলের ঘানি টানতে চলে গেল।...

খোদা বক্সর চা-দোকানে অনেক দেনা। সে বলে, 'বাকিতে চা-পান-বিড়ি আর দিতে পারব না ভাই। আমার তো তালুক নেই। আইবুড়ো সোমত্ত বুনটার 'বে' দিতে পাত্তিচিনি বলে বউ উঠতে বসতে 'খোঁটা' দিচ্ছে।'

সারাদিন পর মন-মেজাজ খারাপ করে ইসরাফিল বাড়িতে ফিরে দেখলে রিজিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোশের ফাঁকে মাথা গলিয়ে পড়ে মরে আছে!

হায়রে নিয়তি! ইসরাফিল কপালে চাপড় মারলে!

ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাফন কিনে এনে কবর দিলে স্ত্রীকে, পাড়ার লোকজনদের সাহায্য নিয়ে।

রাত্রে একা সে ঘরে টিকতে পারে না। রিজিয়া যেন কাঁদছে। একটু তন্দ্রা ধরলেই স্বপ্ন দেখে। রিজিয়া বলে: 'আমার কঙ্কালটা নেবে না? তিনশো টাকা দাম। নিয়ে যাও না গো!...'

'দেখে যাও না গো, আমার পেটে কি বাচ্চা আছে! কঙ্কাল বেচে টাকা না আনলে খাবে কি তুমি? এসো—নিয়ে যাও কবর থেকে।...'

ইসরাফিল উঠে বসল। হাঁ, তাই যাবে। এই তার শেষ কঙ্কাল-সংগ্রহ!

স্ত্রীর হাড় সত্যিই সে নিয়ে আসতে গেল। চোখে তার জল। কবর খুঁড়ে আলো ফেলে দেখল, তাজ্জব কাণ্ড!

লাশ কই? লাশ নেই কেন?

আশ্চর্য! তার মতন আবার কে আছে? ডাক্তার তাহলে নতুন কারবারি আমদানি করেছেন? বটে! আচ্ছা!...

কবরটা ঠিকঠাক করে দিয়ে তখনই গা-হাত ধুয়ে গেল সে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারখানাতেই তিনি বরাবর থাকেন। একা মানুষ। ইসরাফিলের সাড়া পেয়ে উঠলেন। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ইসরাফিল ব্যাপারটা বলার পর ডাক্তার হাসলেন। বললেন, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! বলিস কি তুই ইসরাফিল!'

'এ কাজ আপনার দ্বারাই হয়েছে, কে সে যাকে আপনি নতুন 'আজরাইল' নিয়োগ করেছেন?'

'আমি কিছুই জানি না ভাই। কসম খাচ্ছি।'

'পাজী, নচ্ছার!' ধাঁ করে ছুরি বার করে ডাক্তারের ভুঁড়িতে চালিয়ে দিয়ে গলাটা টিপে ধরে ইসরাফিল। তারপর নাড়ী ধরে কেটে দিলে। বিছানায় শুইয়ে চাদর চাপা দিয়ে সমস্ত টাকাকড়ি বার করে নিয়ে এসে পরিষ্কার হয়ে ফেললে সে। মনে হল তার সে যেন এতদিন পরে একটা মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারল। মনটা এখন পরিষ্কার।

তারপর সে সাহেলীকে জানলা দিয়ে একটা বাড়ির খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলে তাকে চট করে একবার বাইরে আসতে বললে। সাহেলী এলে সে বললে, 'চলো, চলে যাই কোনো দূরদেশে।'

সাহেলী নারাজ। তখন সব ব্যাপার খুলে বলে তার দুটো হাত চেপে ধরে অনুনয় করলে ইসরাফিল। শেষে কেঁদে ফেললে। বললে, 'যদি না যাও তবে তোমাকে এখনি মেরে দরিয়ায় টেনে ফেলে দোব আর আমি নিজেও কোলজেয় ছুরি ঢুকিয়ে মরব।'

তখন সাহেলী বললে, 'চলো তবে।'

তারা সেই রাতের ভোরবেলায় ফেরি নৌকো ভাড়া করে পরপারে গিয়ে দূর-পাল্লার ট্রেন ধরলে।

ইসরাফিলের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সাহেলী।

ট্রেন চলছে হুহু শব্দে।

শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে।

ভূতের বাসা পড়ে রইল ইসরাফিলের।

সকালে আজিমপুরের লোকরা শুনল: ডাক্তার ইনসান গাজিকে ডাকাতরা কেটে ফেলে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে গত রাত্রে। আর একটি ঘটনা অবশ্য প্রেমঘটিত। ইসরাফিল পালিয়ে গেছে খোদা বক্সর বোন সাহেলীকে নিয়ে!

দুটো ঘটনার মধ্যে কেউ যোগসূত্র খুঁজে পেলে না। একমাত্র খোদা বক্স তা বুঝল। আর বুঝল ঈশ্বর!

নিষাদ

পরনে ছাপা শাড়ি। গায়ে একটা গেঞ্জি। মাথায় উলুল-ঝুলুল চুল। এক হাতে একটা শাঁখা, অন্য হাতে একটা লাল মোটা প্লাসটিকের চুড়ি। পাগলী হাসতে হাসতে হাত দোলাতে দোলাতে বাজারের দোকানগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকজন তার উদ্ধত যৌবনভরা লাস্য দেখে। লেবুতে হাত দিলে বুড়ো ফলঅলা তেরিয়া হাঁক মেরে চেঁচিয়ে ওঠে: 'ওরে আমার বউয়ের বুনরে, ভাগ শালী, নেবু রাখ।'

পাগলী লেবুটায় আস্ত কামড় বসায়। দু'পাশের কষ বেয়ে ঝর-ঝর করে রস গড়ায়। সাদা সাদা চোখ দুটো তার আনন্দে হাসতে থাকে। ফলঅলা বলে, 'হাড়-পাজি মাগী! দূর হ!'

পাগলী অদ্ভুত জড়ানো-স্বরে 'আঁই-আঁই' করে। তারপর পাতাল-চোখ করে বলে, 'হাড়…হি-হি—হাড়…'

পাগলীর নাম দুলালী। নামটা বার করেছেন 'সত্যনারায়ণ বস্ত্রালয়'-এর হরিবাবু। ছাপা একটা শাড়ি আর গেঞ্জি দিয়েছেন তিনি বড়পূজোর সময়ে। অত বড় ডাগর মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ থাকে আর দোকানভরা জোয়ান ছেলেদের লোলুপ চোখের সামনে এসে ঘোরাফেরা করে, দেখতেও খারাপ লাগে। হরিবাবু সব-চুল-পাকা বুড়োমানুষ। যুবতী মেয়েমানুষকে খালি-খামখাই শাড়ি দিলেও তাঁর বয়সে অভিযোগ বা সন্দেহের কিছু থাকে না। তিনি কাপড় দিয়ে বলেছেন, 'যা বেটি দুলালী, এটা পরে ঘুরে ঘুরে মায়ের পূজো দেখে বেড়া।'

কোত্থেকে এলো পাগলীটা দরিয়াপুর বাজারে?

কেউ বলে কলকাতা থেকে একদিন বাসে করে এখানে এসে নামল। তখন একটু ছোট ছিল। বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। এখন ষোল-সতেরো।

পাগলীর শরীর ভরাট। খেতে পায় সে। এর কলা, ওর মুলো, ফল, হোটেলের ভাত-মাংস সে সারাদিন খেয়েই বেড়ায়। দুলালীর খিদে লাগলে

গফুব মিযা হোটেলঅলাব হোটেলেব কাছে গিযে বসে। হাসতে থাকে ফ্যাক-ফ্যাক কবে। গা চুলকোয ঘষোব ঘষোব কবে।

গফুব মিযা ভুঁড়িতে মোটা চামডাব বেল্ট এঁটে, গাযে ফতুযা আব মাথায জালি কিস্তির টুপি পবে কাউণ্টাবেব গদিতে বসে খদ্দেবদের টাকা-পযসা নেয। হোটেলেব চাবদিকেব দেওযালে সিনেমাব হিবোইনদের আধ-ন্যাংটো ছবি টাঙানো। নিচে বেঞ্চি-টেবিলে চটকল, তেলকল শ্রমিকব. নান্ রুটি আব শিক-কাবাব খায। খায মাংস-ভাত। বড বড দেগ-হাঁড়িতে ভাত-তবকাবী নিযে বসে আছে একটি ঝোলা-গোঁফ চেঙ্গিস-খাঁ চেহাব্রাব লোক। দুটি ছোকবা খিদমতগাবী কবছে। আব একটা লোক চা,• তন্দুব রুটি, মাংস ইত্যাদি বান্নার গনগনে চুল্লীব কাছে বসে আছে , কাজে ব্যস্ত সে।

পাশেই কযেকটি কসাইখানা। মাংসের ছাঁট মালগুলো ধামা ভবে এসে হাজিব হয। বাজারেব পচা কম দামেব আলু পিঁযাজ আসে। মাছ আসে ববফেব। দুপুবে বাজাব কবতে দেয গফুব মিযা কাঁচা আনাজপত্রের। ঝালঝাডা কম দামেব জিনিস সব। ঝোল ঘন কবার জন্যে মাংসেব তবকারীতে দেয সবষেব খইল। লঙ্কাব ঝাল লাল টকটক্ কবে। লোকগুলো যখন খায জুলপি বেযে, গালপাটি বেযে ঘাম গডায। হডমাঅলা শক্ত মাংস ছিঁডতে গিযে আণ্ডা আণ্ডা চোখ বেবিযে পডে। চিবুতে চিবুতে একসময কোঁৎ করে গিলে নেয। যাদেব লাগামে ঘা, জিভে জাডকাঁটা, তাদেব ঝাল লাগে বলে খেতে খেতে সোঁক সোঁক কবে শব্দ করে আব ঘন ঘন জল খায।

গফুর মিযা কাবুলীঅলাটাব সঙ্গে তর্কাতর্কি করে, 'খাঁ সাব, আপলোক যোলা বোট্টি খাযা হ্যয—পনদেবো নেহি, আউব দশ পযসা নিকলাইযে।' লুঙ্গিপবা বিবাট পেট বিবাট দেহঅলা গেঞ্জি গাযে খালি মাথা কাবুলী দাঁতে 'খেলোল' দিযে খুঁচিযে মাংসের কুঁচো বাব কবে ফেলে দিতে দিতে বলে, 'বেইমানী মৎ কবো গফুর মিযা। হাম পনদেরো রোট্টি খাযা। ঝুট বাৎ মত্ বলো।'

গফুব মিযা আর কিছু বলে না। বিরক্ত হযে মুখ গোঁজ কবে পযসা গুনতে থাকে। দুলালীকে দেখতে পেযে বলে, 'এই পাগলী, ভেতরে এসে বস সেই কোণটাতে।—এই ছোকরা, ওকে দুটি ভাত দে।'

পাগলী এসে 'থাটুমালা' হযে বসে হোটেলের এক কোণে। গফুর মিযা চাট-গাঁযের লোক। জোয়ান বযেসে দেশ ছেডে চলে এসে চব্বিশ পরগণার এক চাষীর বাড়ির দলিজে ওঠে। দিল্লীর কোন মাদ্রাসার এলেম তখন নাকি তার

পেটে একেবারে ঠাসা ছিল। গ্যালের কাছে হাত রেখে কায়দা করে শিরিন জবানে আরবী পড়ে চাষী বুড়োর দীল্ গলিয়ে দেয়। তার তামুক সেজে দেয় যত্ন করে। হুঁকো-মালসা বয়ে নিয়ে যায় মাঠে। তারপর দলিজে পাঁচ-দশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আরবী অর্থাৎ দ্বীনী এলেম শেখাবার ওস্তাদজী বনে গেল। বাঁকা খণ্ড-তয়ের মতন একগোছা দাড়ি রেখে চাষীর মেয়েকে সাদী পর্যন্ত করে বসল। করিৎকর্মা লোক গফুর মিয়া। একটা মোষ কিনে তার দুধ বেচে বেচে দুটো-তিনটে মোষ করে ফেললে। মোষগুলো লোকের ফসলের ওপরে অত্যাচার করলেও বলবার কিছু ছিল না, কেননা গফুর মিয়ার চোখ দুটো কেমন যেন করঞ্জর মতন সদাই লাল হয়ে থাকত, তারপর চাটগাঁর লোক, দেশে নাকি একটা খুন করে প্রাণ নিয়ে এখানে পালিয়ে আসে, খুনটা নাকি না করে উপায় ছিল না—ওস্তাদজী মানুষ, দায়-বিপদে দরকার হয় তাকে, জানাজা পড়াবে কে মানুষ মারা গেলে? কিন্তু আশ্চর্য, গফুর মিয়ার সঙ্গে হঠাৎ একদিন তার বুড়ো শ্বশুরের ঝগড়া হতে সে মোষগুলো সব বেচে ফেললে। হোটেল খুলে ঘর ভাড়া করে বউ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এসে উঠল দরিয়াপুর বাজারে।

বছর পনেরো হল তার হোটেল চলেছে। ভাল খদ্দের আছে।

এখন মাথার চুল পেকে গেছে গফুর মিয়ার। ভুঁড়ি বেড়েছে। সাত-আটটা ছেলেমেয়ে হয়েছে। দোয়া-তাবিজ, পানি-পড়া খেয়েও তাদের রোগ সারে না। হয়েছে আর মরেছে। একটা ন্যাংড়া ছেলে এখন সম্বল। বউটাও নাকি আবার রাতকানা। রোগা হাড্ডিসার চেহারা। পেটের ব্যামো। যৌনরোগী। তবু সেই দুর্বল কুৎসিত-দর্শনা বউ—যার দিকে ফিরেও তাকায় না কেউ—তাকে আপাদমস্তক বোরখা মুড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে কলকাতা শহরের হাসপাতালে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে গফুর মিয়া। মরে তো মরুক বউটা—আর একটা নিকে-সাদী করবে। তার কি এখন টাকার অভাব? দশ হাজার টাকা তো হবে যা জমা আছে আর হোটেলে খাটছে। তাড়াছা পাঁচজন কাবুলীকে সুদ খাটাবার জন্যে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা। শতকরা মাত্র চার ভাগ সুদ দেবে তারা। সেভিং ব্যাঙ্কে রাখলেও তাই তো পেত সে।

দুলালীর বোধহয় জিভে ঘা হয়েছে। গাল মেলে সোঁ সোঁ করে শব্দ করছে। দুপুরের ভিড় কমে গেছে। কলের লোকগুলো খেয়েদেয়ে চলে গেছে সব। গফুর মিয়া গায়ে ছাঁচি তেল চাপড়ে নিয়ে 'গোসল' (স্নান) করবে বলে ওঠে। পাগলীর

কাছে এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসে। বলে, 'দেখি তোর গাল দেখি—হাঁ কর, জিভে ঘা হয়েছে?'

পাগলীর মুখটা ধরলে সে লম্বা জিব বার করে। হি-হি করে হাসে। গফুর মিয়ার শরীরের তাজা রক্তকণিকাগুলো ওর উদ্ধত যৌবন দেখে একটা প্রচণ্ড লোভে যেন আগুনের হুঙ্কার লকলকে সর্পিল জিভগুলোর মতন কিলবিল করে। বলে, 'রাত্তিরে কাল কোথা ছিলি? আজ আসিস, ওষুধ দোবখন। পানি খা—ওরে, ওকে ঝাল-তরকারী দিসনি। মাছ দে। না, মাছ থাক। কাঁটা ছাড়াতে পারে না। গলায় লেগে যাবে।' স্নেহের অবতার হয়ে কথা বলে যেন গফুর মিয়া।

রাত্রে শীতের গুঁতোয় আর টিকতে পারে না দুলালী গ্যাস-পোস্টের চাতালটার ওপরে। একটা ফকির তাকে নিয়ে শুধু কেমন করে। পান-দোকানীটা তাড়া দেয়, তারপর তাকে সে ডাকে। দুলালী জিব বার করে ভেংচি কাটে। শেষ পর্যন্ত সে গফুর মিয়ার আদরটার নির্বোধ একটা সূত্র ধরে এসে পৌঁছয় হোটেল-খানার সামনে। তখন রাত এগারোটা। ঝাঁপ পড়ে গেছে সব দোকানের। রাস্তা দিয়ে তখনো কলকাতার বাস-লরী চলে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে, মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর কাঁপিয়ে দিয়ে। হোটেলের মধ্যে আলো জ্বলছে তখনো। গফুর মিয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে টাকা-পয়সা গুনছে। খাতা লিখছে। ঝাঁপে ঘা পড়তে শুধোলো, 'কে?'

'আঁই আঁই!'

'দুলী?'

'আঁই আঁই!'

গফুর মিয়ার লোকজন সবাই চলে গেছে দশটার সময়। ঝাঁপটা খুলে দিতেই টুক্ করে ভেতরে সেঁধিয়ে এল দুলালী। গফুর মিয়া তাকে পাঁজা করে ধরে নিজের কম্বলের মধ্যে পুরে নিলে। সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দিলে। বললে, 'তোর গা যে একেবারে হিম রে দুলী!'

'আই…আঁই…হি-হি…আঁই!'

দুলালীর শরীরটা বেশ নরম। নিজের বিছানার মধ্যে আনলে তাকে গফুর মিয়া। শরীরের নরম ত্বকে স্পর্শ পেলে পাগলীর বোধহয় ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে। সে হি-হি করে হেসে ওঠে। কামড়ায় ভীষণ উত্তেজনায়। গফুর মিয়া তার হাসিতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে।

সারারাত আর ঘুম হয় না গফুর মিয়ার। পাগলীর সঙ্গে পাগলা হয়ে যায়। তার বয়েস, এলেম, ইমান, গোনার কথা বেবাক ভুলে যায় তখন।

ভোর না হতেই সে বার করে দেয় দুলালীকে। গোসল করে এসে দু' চোখে যত্ন করে কাবুলীদের দেওয়া আসলী কোহতুর-পাহাড়-পোড়া সুর্মা টেনে দেয়। মাথায় ঠাণ্ডা সুগন্ধী তিলের তেল ঘষে। দই খায় ভাঁড়খানেক। খায় সন্দেশ আর দুটো আপেল, দুটো মর্তমান কলা।

পাগলীটা তার নোংরা কাপড় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভদ্দরলোকের মেয়েরা থুথু ফেলে তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে। যাত্রা অশুভ হবার দুশ্চিন্তা করে বিরক্ত হয়।

কিন্তু মাসকয়েক পরে দেখা গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড! মা হতে চলেছে সে বেওয়ারিশ সন্তানের। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন : কোন্ জানোয়ার এমন কাজ করলে?

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর যে দিতে পারত সে পাগল।

যে সামাজিক প্রাণীটি এই ঘটনার জন্য দায়ী সে কোনো জবাবদিহি করবে না —তারা চিরকাল থাকে আড়ালে। অন্ধকার জগতের তারা ভয়ঙ্কর এক সামাজিক নিষাদ!...

তিন-ভানারী

'কই লো বউ, চোখের নিদ্ ভাঙল? বউ—ও বউ!...'

'তসলা'-আঁটা কপাটে করাঘাত হতে থাকে বারংবার।

'আহা, ছাড়ো না, গালাগালি করবেখন!' অনুনয় করে মরজিনা-বউ গলা-জড়িয়ে-দুষ্টুমী-করে-আঁকড়ে-থাকা তার বর জাহেদ আলীকে।

জাহেদ বলে, 'কলের যখন ভোঁ হবে আড়াইটের, তখন যাবি, এখন শুয়ে থাক —চেঁচাক যত পারে। রাত বারোটার সময় উঠে চিঁড়ে কোটো যেয়ে!'

'না ছাড়ো লক্ষ্মী! ক্ষেপে গেলে ঝোঁড়াখানেক 'বচন' শোনাবে-অখন। আমার মায়ের খারাবী করবে-অখন। তোমার আর কী! সকালে উঠে বাবু ইস্টিশনের বাজারের দোকানে চলে যাবে-অখন।'

'ও বউ—আভাগীর বেটির নিদ বলিহারী!' আবার দোরে আঘাত হানে শাউড়ি গোলাপী বিবি।

'যাই মা!' সাড়া দিয়ে এবার গায়ের কাঁথা খুলে ফেলে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পালাতে গেল মরজিনা। ঘরের দেওয়ালের একটা 'কুলুঙ্গি'তে রেড়ির-তেল-দেওয়া পেতলের পিদিম জ্বলছে মিটমিট করে। কাঁথার সঙ্গে কোমর-থেকে-খোলা শাড়িটা জড়িয়ে গিয়েছিল, টেনে নিতে না নিতেই জাহেদ একেবারে সবটাই উদোম করে খুলে নিলে। লজ্জায় জাহেদের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাড়িটা নেবার জন্যে তাকে কামড়াতে-আঁচড়াতে লাগল। কাতুকুতু দিয়ে শাড়িটা কেড়ে নিয়ে ঘরের এক কোণে পালিয়ে গিয়ে পরে নিলে। তস্‌লাটা খুব ধীরে ধীরে খুলে আস্তে বললে, 'চললাম গো বর! চিঁড়ে কুটতে। রাগ করো না। ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটলে উরু সুগোল হয়। পাছা সুডোল হয়। হি-হি-হি…'

বউ বেরিয়ে এসেই দেখলে শ্বশুর নারকোল-পাতা জ্বেলে আগুন করে হুঁকোয় তামুক সাজছে হোগলার ছই-ঘেরা 'ওসরা'র (দাওয়ার) এক পাশটাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে।

আইবুড়ো সোমত্ত ননদিনী গোলেনার ঢেঁকিশালের এক-পাখা উনুনটার কাছে কাঠ-পাতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আসমান থেকে ঝড-ঝড শব্দ করে হিমেল শিশির ভেঙে পড়ছে গাছপালার পাতার ওপরে। ধোঁয়াটে আকাশে তারাগুলো মিটমিট করছে। শাউড়ি গোলাবী বিবি ভাপিয়ে-রাখা ভিজানো ধানগুলো বালতিতে করে ম্যাচ্‌লা থেকে ছেঁকে এনে উনুনের কাছে রাখতে-রাখতে গজ-গজ করে, 'কপাল-গুণে বউ একটা মুই পেয়েছিনু বাবা! নিদ আর ভাঙে না! কখন থেকে ডাকতিচি মুই। ভোরের পাখ-পাখালী ডেকে উঠল! রাত তিন 'পহর' গড়িয়ে যেতে প্যাঁচা, পাত্‌কোয়া, ডাকপাখি 'ঝাল' (একসঙ্গে অনেক পাখি ডাকা) দিলে। 'আজান স্যুয্যি'র তারাটা 'পচ্চিমাগাশে' একদম হেলে পড়ল। লে-লে তুই চুলো ধরা লো গোলো—আধমণ ধানের চিঁড়ে কুটতে তিন-ভানারীর 'বাই-জন্মে' যাবেখন।'

মরজিনা পুকুরের ঘাট থেকে হাত-মুখ ইত্যাদি ধুয়ে এসে আঁচলে মুখ মুছে উনুনের আগুনের কাছে দাঁড়াতেই গোলাবী বিবি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'লে-লে—অত আর হাত-পা সেঁকে নে—জাড়ে সব শ্যাল-কুকুর মরে গেল! ওঠ, ঢেঁকিতে ওঠ।'

গোলেনার ভাবীর দিকে তাকাতে লাগল দুষ্টুমী-ভরা চোখে—সার্চ লাইট ফেলে জাহাজের কাপ্তেন যেমন করে নদীর তীরের দু-পাশের সাইনবোর্ডগুলো দেখে নেয়। মরজিনার চেহারার গড়নটা ভাল। তিন বছর ঘর করছে তবু ছেলেমেয়ে হবার নাম নেই। তাবিজ-কবচ এনে বাজুতে বেঁধে দিলেই তার দাদাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে।

বউ মুখ টিপে হাসল।

তারা দুজনে উঠল এবার ঢেঁকির 'পেতেনে'। মাটির উঁচু বেদির মতন করা একটা জায়গা। পৈঠার মতন। বুকের কাছে উঁচুতে একটা বাঁশের ভারা বাঁধা—তাতে হাতের ঠেস বা বুকের ভর রাখতে হয়।

দু-চার দিনের জন্যে বউ বাপের বাড়ি গেলে পাড়ার রাহিলার মা এসে চিঁড়ে ভেনে দিয়ে যায়।

দুম্-দুম—দুম-দুম !···

একটানা ক্রমাগত ঢেঁকি পড়ার শব্দ; দুটো-তিনটে গ্রামের ওপার পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়। আরো দুটো বাড়ির ঢেঁকির শব্দ ওঠে, তারপর আরো কয়েকটি।

চিঁড়ে কোটার পাড়া এটা। নাম ভানারী পাড়া।

ধানভানা ঢেঁকির চাইতে চিঁড়ে কোটার ঢেঁকির শব্দ বেশি। বাড়ির বা আশ-পাশের লোকের কান-মাথা ধরিয়ে দেয়। ধানভানা ঢেঁকির 'মুস্থলি'তে লোহার 'সাঁপি' পরানো থাকে। চিঁড়ে কোটার ঢেঁকির মুস্থলির মুখ খোলা। শুধু কাঠ। পাকা হাড়ের মতন শক্ত কালো নিঝ্‌ঝুম বাবলা কাঠের মুস্থলি—লক্ষ ঘায়েও ফাটে না। সোঁদরবনের পাথরকাটা চেহারার বাউলীরা যে বাবলা কাঠের গদার মতন 'সোঁটা' মেরে বড়-বড় জাঁদরেল বাঘের 'চাবালি' গুঁড়ো করে দেয়। ঢেঁকির গড়ের নিচে পাথর বসানো থাকে। তার ওপরে, গড়ের মধ্যে, ডান-হাতে-'কুঁচি'-ধরে-'উঁচোনো' (গরম-করা) ধান ঢেলে দিতে হয়। ঢেঁকির মুস্থলির ঘা পড়ে ধানের ওপরে দুমদুম শব্দে। ধান চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। গোলাবী বিবি, ঠিক তালে-তালে ভানারীদের পায়ের চাপে ঢেঁকি ওপরে উঠে যাওয়ার মাঝখানের সময়ের ফাঁকটাতে টুক করে বাঁ-হাত বাড়িয়ে গড়ের গহ্বরের মধ্যের ধানগুলো নেড়ে-চেড়ে দেবে—আবার ঢেঁকি পড়ার আগেই হাত টেনে নেবে—আবার ঢেঁকি উঠলেই হাত চালিয়ে দেবে গড়ের ভেতরে। একটু অন্যমনস্ক হলে, দেরি হয়ে গেলেই, হাতের ওপরে ঢেঁকির মুস্থলি পড়ে আঙুলগুলো থেঁতো হয়ে

যাবে। নতুন ভানারী হলে সাবধানে থাকতে হয়। সে সদাই পা বদল করবে। পা কনকন করে। ভীষণ কষ্টের কাজ। কোদাল দিয়ে মাটি কোপোতে গেলে যেমন খানিকটা পরেই হাঁপিয়ে যেতে হয়, দরদর করে ঘাম ঝরে, ঢেঁকিতে ধান ভানার সময়ও তেমনি। নতুন লোক হলে পরদিন জ্বরে আর পায়ের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করে ঢেঁকি তোলা-পাড়ার সময় কর্কশ আওয়াজ উঠছিল তালগাছের গোড়ার 'পো'-কাঠের মুখের ওপরের 'আঁক্‌সলি' থেকে। ('ঢেঁকির আঁকসলি' মানে যে দু-দিকেই আছে, লাগায়-ভাঙায়, নারদ ঋষির মতন।) বিছছিরি শব্দটায় বিরক্ত হয়ে সাবুর আলী বলে, 'আঁকসলিতে এট্টু পানি ঢেলে দে না মা গোলো, শালাট্টা যে কান-মাথা খচখচিয়ে ফেললে।'

গোলেনার নেমে পড়ে একটু জল ঢেলে দিতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এসে আবার তার ভাজের সঙ্গে পাড় দিতে শুরু করলে।

গোলাবী বিবির বাঁ-হাতে গড়ের ধান উজলে দেবার কাজ যেমন চলতে থাকে তেমনি একই সঙ্গে ডান হাতে 'কুঁচি' (গুছি বাঁধা কতকগুলো ঝাঁটাকাঠি—যা দিয়ে মুড়ি বা চালভাজারও কাজ হয়) নাড়া চলতে থাকবে জ্বলন্ত উনুনের মাটির হাঁড়ির কানাকাটা খোলার ওপরে। ভয়ানক সতর্কতার কাজ। গড়ের মধ্যে দেরি হলে হাত ভাঙতে পারে, ডান হাত নাড়তে দেরি হলে ধান পুড়ে যাবে। এর মধ্যে আবার উনুনে কাঠ ঠেলে দিতেও হবে—ধান তুলে নিতে হবে বালতি থেকে চাট্টি চাট্টি করে। চিঁড়ে হয়ে গেলে 'সেঁকে' দিতে দিতে 'নেয়ো' মেরে মেরে সেগুলো গড়ের ওপরে তুলে দিতে হবে। কুলোয় তুলে 'পাছড়ে' রাখতে হবে ধামায়। 'বাত্‌' (গরম) ঠিক না হলে চিঁড়ে কেটে যাবে। গুঁড়ো হয়ে গেলে দোরাস লোকসান। বেশি 'খরে' গেলে একদম গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কনকচূড়া ধানের চিঁড়ে। সুগন্ধে চারদিকটা মাত হয়ে যায়। এক 'ছে' (ছাঁট) হয়ে যেতেই ঢেঁকি থামিয়ে নেমে এসে গোলেনার গোটা কতক চিঁড়ে বুকের কোঁচড়ে করে তুলে নিয়ে গেল। গাল চালিয়ে-চালিয়ে চিবুতে লাগল। তার মা গোলাবী বিবি বললে, 'কাঁচা চাল চিবোনো তো 'অব্যেস' আছে, কাঁচা চিঁড়ে ঝাড়া-পাছড়ানো হয় নে ভাল করে—ধানের কোণ রয়েছে—গাল-গাল করে খাচ্ছিস—চাল খাওয়া, পোড়ামাটি খাওয়ার ব্যামো আছে পোয়াতি মাগীদের পানা—প্যাটে যখন বড় বড় কিড়মি হবে বুঝবি!'

বউ মরজিনা একগাল খেতে চাইতেই বললে, 'বাসি গায়ে তুই চিঁড়ে খাবি?'

মরজিনা চিমটি কাটলে, বললে, 'তোকে বলেছে. বাসি-গা না হাতি ! দে বুবু একগাল !'

বুকের কাপড়ের ভেতরে হাত গলিয়ে বউটা কি দুষ্টুমী করলে তা সেই জানে, গোলেনার 'এই'—বলে দিলে এক কনুইয়ের গুঁতো। পা-টা বেতাল হল বউয়ের। ঢেঁকি ঠিক্‌রে উঠে পড়ে গেল ভুল তালে—অসময়ে।

গোলাবী বিবি অমনি গর্জন করে উঠল, 'আভাগীর বেটিরা কার ছ্যালো কি রে —অ্যাঁ !' বড়-বড় চোখ বার করে গোলাবী। তার ভোঁতা নাকের ফাঁদি নথটার গোলাকার ফাঁকটা গালের মতনই হাঁ হাঁ করে।

'হাতটা মোর থেঁতো হয়ে যেত! ঢেঁকির 'পাড়ে' উঠলে কি 'উল্লস' ওঠে ? ঝ্যাটার বাড়ি মেরে 'উল্লস' ছেড়িয়ে দোব তোদের !'

গোলেনার সাফাই গায়, 'তবে ও কেন আমার বুকে হাত দেবে ?'

'কখন লা ? আমি তো চিঁড়ে লিতে গেনু।'

'হু !' আমড়া-আমড়া চোখ বার করে শাসনের ভঙ্গি করে গোলেনার।

গোলাবী বিবি বলে, 'জাঁহাবাজ মাগীরা শুধু ঐ লিয়েই আছে। 'যৈবন' তোদেরই উথলে পডতেছে, মোদের আর ছ্যালোনি ! যত্তো সব ! হাতে ঢেঁকি পড়লেই বেটার চিঁড়ে-দোকান বন্ধ হবে—মনে রেখো।'

লম্ফের আলোয় সাত হাত ছায়াটা বারো হাত হয়ে আড়কাঠার 'মট্‌কা' পর্যন্ত উঠে যায় যখন ঢেঁকির মাথা উপর দিকে ওঠে—আবার পড়ে গেলেই সমান্তরাল। ছায়াটাও ধান ভেনে চলেছে সমানে। শুধু ওর মূলধন নেই।

বুড়ো সাবুর আলী হুঁকো টেনে চলে একটানা আর কাশতে থাকে মাঝে মাঝে। চারটের ভোঁ হলেই সে চলে যাবে ইস্টিশনের বাজারে মটরশুঁটি, বেগুন, পাকা কলার বাজরা মাথায় নিয়ে। এক হাট থেকে মাল কিনে আর এক হাটে বিক্রি করে আসে সে।

জাহেদ আলী দাওয়া থেকে নেমে যাওয়ার সময় বউয়ের মুখের দিকে একবার তাকালে। একটা চোখ টিপে দেখালে। মরজিনা বউ হাসলে মুখ আড়াল করে। পাঁজরে গুঁতো দিলে তার গোলেনার। সে ঠিক টের পেয়েছে।

গোলাবী বিবি নিজের খেয়ালেই বক-বক করতে লাগল : 'তখন আমি বারো বচ্ছরের মেয়ে। ঘোমটায় চাপা পড়ে যাই। শাউড়ি রাত-দুপুরে 'বিছেন' থেকে টেনে তুলে এনে ঢেঁকিতে চড়িয়ে দিত। তখন 'কেরাস' (কেরোসিন) তেল 'পয়দা' হয়নি। করোমচা ফলের তেল জলত হাতের-আঁজলার-মতন মাটির বড়

বড় চেরাগে। হু-হু করে কালি উড়ত। গন্ধয় টেকা যেতনি। কালো মাটির পোড়ানো চুড়ি ছ্যালো দু'হাত বোঝাই। রেশমি চুড়ি হল তো এই সিদ্‌নে। ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে পনের বচ্ছর বেলাতেই মোর ছেলে হয়ে গেল!'

হি-হি করে হেসে উঠল মরজিনা আর গোলেনার, মায়ের কথা শুনে।

'আর এখন আঠারো বচ্ছরের সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো হয়ে মোর ঘরে বসে আছে। বুড়োকে বললে, বলে, হবে হবে—ছেলে দেখতিছি মুই। ছেলে দেখলে ছেলে ছেড়ে ছেলের বাপকে সুদ্দু অ্যাদ্দিন গলায় গামছা দিয়ে ধরে আনা যেত—আঁটকুড়ো মিন্‌সের চোখ্‌ আছে? যখন একটা মদ্দমানুষকে লিয়ে বেরিরে যাবে তখন মুখে 'ফুলচন্নন' পড়বে! রেস্‌মুড়ে ছোঁড়াটাকেই না হয় গচিয়ে দে।'

গোলেনার বলে, 'অমন করলে আমি ঢেঁকি থেকে নেবে চলে যাব মা!'

'যাবিই তো! যাবার জন্যেই তো তোর মন 'উচাটন' হয়ে রয়েছে। হাঁ লা 'কম্‌ব্যক্তি', আমি জানিনি আবার? কাল দুপুরবেলা তুই বাঁশ-বাগানের পাশের জলায় যেয়ে কার সাথে কথা বলতে ছেলি লা হেসে হেসে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে? হাসেম কি তোর বাপের বোনাইয়ের ছেলে হয় যে সে তোর ভাতার হবে? চারটে ছেলেমেয়ে আছে তার—বউ রয়েছে ঘরে। ফের 'যেতি' দেখি কুনোদিন, ঝ্যাঁটার বাড়ি মেরে বিষ ঝেড়ে দোব মুই! মুই যেতি গরীবুল্লোর 'জরমে'র মেয়ে হই তো তোকে টিট করে তবে ছাড়ব।'

গোলেনার বৌদির দিকে একবার ক্রোধভরা সন্দেহের চোখে তাকায়—সেই বোধহয় লাগিয়েছে। বলে, 'গোবর কুড়িয়ে আনতে গেনু আমি জলায়—ন্যাতা দোব বলে। হাসেম বলে, তোকে কি সোন্দর দেখতে রে গোলেনার, তোর গালে একটা তিল আছে! হি হি হি!...'

'তিল আছে তো তার বাবার কি?' চিল্লে উঠল গোলাবী বিবি। 'গ্যাঁজার কল্কি পুড়িয়ে তার বউয়ের গালেও তিল করুক না যেয়ে!...'

ঘণ্টাখানেক পরে ঢেঁকি থামল। ঘেমে নেয়ে গেছে ওরা দুজনে। বসে পড়ে বুকের আঁচল খুলে হাওয়া টানতে থাকে হাঁ করে গাল মেলে হাঁপাতে হাঁপাতে।

সাবুর আলীর মাথায় আনাজের বাজরা তুলে দিতে সে চলে গেল।

বউ গেল জাহেদ আলীকে খাবার দিতে।

গোলাবী বিবি চিঁড়ে পাছড়াতে লাগল। উনুন তত্তক্ষণ নিভিয়ে দিলে।

গোলেনার বাইরে গেল।

সকালের আলো ফুটে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

কিছুক্ষণ পরে রিক্সার হর্ণ শুনতে পেলে জাহেদ আলী। ঘর থেকে এক বস্তা চিঁড়ে বার করে নিয়ে সে রিক্সায় করে চলে গেল তার দোকানের উদ্দেশে। চিঁড়ে মুড়কি, খইচুর, বাতাসা, তিলেখাজার ছোট একটা দোকান আছে তার ইস্টিশনের বাজারে।

ধানজমি তাদের একেবারেই নেই। সাবুর আলী চাষের জন খেটে খেটে জাহেদকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়িয়েছিল। ছেলেটা পাস করতে পারলে না। এখন ব্যবসা চালাচ্ছে। ধান আর গুড় কিনে চিঁড়ে-মুড়কি করে নেয় ঘর থেকে। ধানের দাম ক্রমে উঠতে থাকলে কেনা ধানের চিঁড়ে দিয়ে যাদের ঘরোয়া ধানের চিঁড়ে, তাদের দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। লোকসান না গেলেও লাভ থাকে না।

বোনটার বিয়ে দেওয়া দরকার। একটা ছেলেকে জাহেদ আলীর পছন্দ, তার দোকানে আড্ডা দিতে আসে, সে রোজই কলকাতা শহরে যায়, রেসের টিকিট বেচে, পকেট মারে, মাল খায়, কিন্তু দিলদার খুব। পোড়ো পাকা-বাড়ির বনেদী ঘরের ছেলে দেখতেও ভাল। মা ছাড়া কেউ নেই আর তার। কিন্তু বাঁধা-ধরা একটা রোজগার না থাকলে কি করে হুট করে বোনটাকে ওর গলায় ঝুলিয়েই বা দেওয়া যায়? ভেবেছে জাহেদ আলী। দু-একদিন তাকে বাড়িতে নিয়েও এসেছে। গোলেনারকে দেখেছে সে। পছন্দও নাকি। গোলাবী বিবির কিন্তু ছোঁড়াটার ঘরদোর দেখে পছন্দ নয়। জল পড়ে। ভাঙাচোরা ইটের পাঁজা। তার চাইতে তাদের মাটির বাড়ি ঢের ভাল। তার ওপর আবার সাইকেল, ঘড়ি, আংটি বোতামের 'ফরমান' আছে ছেলেটার মায়ের পক্ষ থেকে।

ছেলেটা বলে, 'দুস্ শালা, 'বে' করব একটা মেয়েমানুষকে, ওসব আবার কি হবে? দিলেই সাতদিনে ফুঁকে দোব রেস খেলে, মাইরি! গোলেনারকেই না বাজি ধরে বসি!'

তাই বটে! জাহেদ আলী ভাবছে।

দুপুরে খেতে এসে জাহেদ শুনলে গোলাম নবী—রেস খেলা পকেটমার ছেলেটা—নাকি বেলা দশটার সময় এসেছিল। বাড়িতে নয়। গোয়াল ঘরের মধ্যে গোলেনারের সঙ্গে কথা বলছিল। বউ দেখতে পেয়ে শাউড়িকে বলে দেয়। গোলাবী বিবি হঠাৎ গোয়ালে ঢুকে পড়ে দেখে, তাজ্জব কীর্তি! মেয়েকে ঝাঁটা দিয়ে বেশ করে ঘা-কতক দিয়ে দিয়েছে। গোলাম নবী নাকি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েই সট্‌কান দিয়েছে।

জাহেদ আলী মাকে বলতে শোনে, 'ঐ হবে! একদিন বার করে নিয়ে চলে যাবে। বন্ধু জুটিয়েছে ছেলে আমার।'

সন্ধ্যার পর এসে শুনলে বউ আর ননদের মধ্যে খুব ঝগড়া—চুল ছেঁড়াছিঁড়ি হয়ে গেছে। গোলেনার বলেছে, 'তুই মাকে বলে দিলি কেন?' বলে নাকি তার গলা টিপে ধরে।

বউ বলে, 'ও গোপনে 'আস্‌নাই' করবে আর আমি বললে দোষ, পরে ভুগবে কে? মেয়েমানুষের জীবন ফাঁদের মতন—আটকে গেলে—বিষ গিলে হজম করতে না পারলে তখন কি করবে? কিছুতেই আমার চুল ছাড়বে না। আমিও দিইচি তেমনি কিল-ঘুষি। তারপর তোমার মা এসে আমাকে মারলে। আচ্ছা, আমিও বাপের বেটি হই তো দেখে তবে ছাড়ব।' কালনাগিণীর মতন ফুঁসতে লাগল মরজিনা।

জাহেদ আলী তাকে কোলে বসিয়ে আদর করে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। চুপ করো। এসব কথা যেন বাইরে আর না যায়।...'

'তুমি ওর বিয়ে দিয়ে দাও। ও আর থাকতে পারবে না। বাঘিনী মানুষের কাঁচা রক্তের স্বাদ পেয়েছে।'

'ঐ ছেলেটার সাথেই?'

'হাঁ।'

জাহেদ আলী ভাবতে লাগল।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ভেবে চলল। চোখে ঘুম এলো না। একটা রেস্কাডে—একটা পকেটমার ছোঁড়ার সঙ্গে তার বোনের বিয়ে দেবে! তারপর জেলে গেলে...

'কই লো বউ! নিদ ভাঙলো চোখের? ভোর হয়ে গেল যে! উঠে পড় জাহেদ আলী, বউকে তুলে দে।'

মরজিনার ঘুম ভাঙল। সে উঠে বসে হাই ভাঙলে। সাপের মতন বেণীটা হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে খোঁপা বাঁধলে। জাহেদ আলী জেগে থাকা সত্ত্বেও আজ আর তাকে আদর করে কাছে টানলে না।

ঢেঁকিতে উঠে ননদ-ভাজে আর কথা নেই। পাড় দিয়েই চলে একটানা। বিষের ঝাড় ননদটাকে মনে হয় ও একদিন বহু কষ্টে সঞ্চিত যা-কিছু সব নিয়ে চলে যাবে। কত টাকার 'দান-দেহাজ' দিতে হবে।

কালমুড়ো বুড়ী শাউড়ি মাগীটা তাকে মারলে!

সেও যদি এক বাপের বেটি হয় তো…হঠাৎ পা সরিয়ে নিয়ে হাঁটুর ধাক্কা দিয়ে ননদের পা-টাকে সরিয়ে দিতেই গোলাবী বিবির হাতে ঢেঁকি পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল সে: 'ও মাগো! বাবা রে। আমাকে মেরে ফেলেছে রে! হাত কেটে 'লউ'য়ে (রক্তে) 'লদী' হয়ে গেল।'

গোলেনার আর মরজিনা, খরিশ আর গোখরো কেউটে সাপের মতন চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে যেন ফণা বিস্তার করে। কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ তারা দুজনেই ঠোঁট মুচকে হেসে উঠল। ফণা নামিয়ে নিয়ে পরস্পরের দোষারোপ করতে লাগল। সেটা তাদের কৃত্রিম কলহ। আসলে তাদের আপস হয়ে গেছে মায়ের ওপরে না-বলা না-বোঝা একটা নির্বোধ প্রতিশোধ নিয়ে।

আগুনভরা ড্যাবডেবে কান্নাকাতর বোবা চোখ মেলে মা শুধু তাকিয়ে রইল তার দিকে। হাত থেকে তার রক্ত ঝরতে লাগল—মায়ের রক্তে ধান চিঁড়ে মাটি ভিজে গেল।

শেষ